স্বামী বিবেকানন্দ
ও
যুবসমাজ

জীবন মুখোপাধ্যায়

★ প্রাপ্তিস্থান ★

ওরিয়েন্ট বুক এম্পোরিয়াম
১০৩সি, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা—৭০০ ০০৯

নবভারতী প্রকাশনী
৬, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা—৭০০ ০০৯

প্রকাশক :
কে. বি. প্রকাশনী
শ্রীজহরলাল গোস্বামী
১০৩ সি, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ :
শুভ ১লা বৈশাখ, ১৩৭২

প্রচ্ছদ শিল্পী :
শ্রীবিভূতি সেনগুপ্ত

ব্লক প্রস্তুতকারক
H. D. Process

মুদ্রণে :
সারদা আর্ট প্রেস
শ্রীমতী অঞ্জলী মুখার্জ্জী
১৩/১, বলাই সিংহ লেন
কলিকাতা-৯

॥ যুবকদের প্রতি ॥

"আমি এই যুবকদলকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছি। ······ভারতের নগরে নগরে আরও শত শত যুবক আমার সহিত যোগ দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে। ইহারা দুর্দমনীয় তরঙ্গাকারে ভারতভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হইবে, এবং যাহারা সর্বাপেক্ষা দীন হীন ও পদদলিত—তাহাদের দ্বারে দ্বারে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, নীতি, ধর্ম ও শিক্ষা বহন করিয়া লইয়া যাইবে—ইহাই আমার আকাঙ্ক্ষা ও ব্রত, ইহা আমি সাধন করিব কিংবা মৃত্যুকে বরণ করিব।"

"হে বঙ্গীয় যুবকগণ, তোমাদের প্রতি আমার হৃদয় আকৃষ্ট। তোমাদের টাকাকড়ি নাই; তোমাদেরই উপর ইহা নির্ভর করিতেছে; যেহেতু তোমরা দরিদ্র, সেইজন্যই তোমরা কাজ করিবে। যেহেতু তোমাদের কিছুই নাই, সেহেতু তোমরা অকপট হইবে।······ইহাই তোমাদের জীবনব্রত, ইহাই আমার জীবনব্রত।"

"তোমরা কি মানুষকে ভালবাসো? তোমরা কি দেশকে ভালবাসো? তাহলে এস, আমরা ভাল হবার জন্য—উন্নত হবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করি। পেছনে চেও না—অতি প্রিয় আত্মীয়স্বজন কাঁদুক; পেছনে চেও না, সামনে এগিয়ে যাও। ভারতমাতা অন্ততঃ সহস্র বযুবক লি চায়। মনে রেখো—মানুষ চাই—পশু নয়।"

"—হে বীরহৃদয় যুবকগণ, তোমরা বিশ্বাস কর যে, তোমরা বড় বড় কাজ করবার জন্য জন্মেছ। কুকুরের ঘেউ ঘেউ ডাকে ভয় পেও না—এমন কি আকাশ থেকে প্রবল বজ্রাঘাত হলেও ভয় পেও না—···খাড়া হয়ে ওঠ, ওঠ, কাজ কর।"

হাজার হাজার পুরুষ চাই, নারী চাই—যারা আগুনের মতো হিমাচল থেকে কন্যাকুমারী—উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণমেরু—দুনিয়াময়

ছড়িয়ে পড়বে। ছেলেখেলার কাজ নয়—ছেলেখেলার সময় নেই। ...সঙ্ঘ চাই—কুড়েমি দূর করে দাও; ছড়াও ছড়াও—আগুনের মতো যাও সব জায়গায়।

"যদি প্রয়োজন হয়, সমাজব্যবস্থার উন্নতি করো, বিধবাদের বিয়ে দাও, জাতিপ্রথার মাথায় বাড়ি মারো, কিন্তু ধর্মকে ত্যাগ করো না। সামাজিক ব্যাপারে প্রগতিশীল হও কিন্তু ধর্মব্যাপারে রক্ষণশীলতা রাখো।"

"দৃঢ়ভাবে কাজ করিয়া যাও, অবিচল অধ্যবসায়শীল হও এবং প্রভুর উপর বিশ্বাস রাখো। কাজে লাগো।... এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও। মৃত্যু পর্যন্ত গরীব, পদদলিতদের উপর সহানুভূতি করিতে হইবে—ইহাই আমাদের মূলমন্ত্র। এগিয়ে যাও, বীরহৃদয় যুবকবৃন্দ।"

"শিক্ষা পেলে মেয়েদের সমস্যাগুলো মেয়েরা নিজেরাই মীমাংসা করবে। আমাদের মেয়েরা বরাবরই প্যানপেনে ভাবই শিক্ষা করে আসছে। একটা কিছু হ'লে কেবলই কাঁদতেই মজবুত। বীরত্বের ভাবটাও শেখা দরকার"

"আমাদের দেশের মেয়েরা বিদ্যাবুদ্ধি অর্জন করুক—ইহা আমি খুবই চাই; কিন্তু পবিত্রতা বিসর্জন দিয়া যদি তাহা করিতে হয়, তবে নহে।...ভারতে নারীর আদর্শ মাতৃত্ব—সেই অপূর্ব, স্বার্থশূন্য, সর্বংসহা, নিত্যক্ষমাশীলা জননী।"

"মেয়েরা প্রত্যেকেই এমন কিছু শিখুক, যাতে প্রয়োজন হলে তাদের জীবিকা তারাই অর্জন করিতে পারে।"

আমার পরম পূজনীয় শিক্ষক

নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আবাসিক মহাবিদ্যালয়ের

ইতিহাস বিভাগের প্রধান অধ্যাপক

ডঃ প্রফুল্লকুমার দাশ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

★ সূচীপত্র ★

যুবকরাই স্বামীজীর সৈনিক

স্বামী লোকেশ্বরানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দ একজন তরুণ সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী হয়েও তিনি জগৎ থেকে দূরে সরে যান নি। ঈশ্বরের সন্ধানে পাহাড়-পর্বত বা বন-জঙ্গলে তিনি ঘুরে বেড়ান নি। মানুষের মধ্যেই তিনি ঈশ্বরকে দেখেছিলেন। দুঃখ দারিদ্র্য ও বেদনাক্লিষ্ট মানুষই ছিল তাঁর ঈশ্বর, যে দেশের মানুষই তারা হোক না কেন। তিনি দুর্বল অক্ষম নিপীড়িত মানুষের কথা চিন্তা করে বেদনায় অধীর হয়ে পড়তেন। মানুষের অপমান সইতে পারতেন না। নিগ্রো মনে করে তাকে আমেরিকার এক হোটেলে ঢুকতে দেওয়া হয় নি। এজন্য তিনি বলেন নি যে তিনি নিগ্রো নন। যে নিপীড়িত, সে-ই তাঁর সমগোত্রীয়। তাই আমেরিকার নিগ্রো তাঁর ভাই, মিশরের পতিতা তাঁর বোন।

ভারতের প্রতি স্বামীজীর ভালবাসা ছিল খুব বেশী। ভারতের মানুষের প্রতি তাঁর সমবেদনাও প্রচুর। ভারত তাঁর বাল্যের শিশুশয্যা, যৌবনের উপবন, বার্ধক্যের বারাণসী। ভারত তাঁর কাছে পুণ্যভূমি দেবভূমি। ভারতের প্রত্যেকটি ধূলিকণা তাঁর কাছে পবিত্র। ভারতের মুচি, মেথর তাঁর ভাই, তাঁর রক্ত। তিনি দেখেছিলেন যে, দারিদ্র্যের তাড়নায় ভারত পশুর স্তরে নেমে গেছে। মানুষের অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, আত্মমর্যাদা নেই, নিজের প্রতি বিশ্বাসও নেই। অশিক্ষা কুশিক্ষা রোগ-মহামারীতে দেশ স্থবির হয়ে পড়েছে। স্বামীজী বলতেন, ভারতের জাতীয় পাপ হল তার জনসাধারণকে অবজ্ঞা করা। এই পাপের ফলেই দেশ দুর্বল; বার বার বিদেশী শক্তির দ্বারা পদানত হয়েছে। জনসাধারণের বৃহত্তম অংশ হল 'শূদ্র' অর্থাৎ খেটে-খাওয়া মানুষ। তারা মাঠে চাষ করে, কলকারখানায় হাতুড়ী পেটে। তারাই ধন উৎপাদন করে, কিন্তু সে ধন থেকে তারা বঞ্চিত। সে ধনে তাদের কোন অধিকার নেই। অস্পৃশ্যজ্ঞানে ঘৃণা করে তাদের দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে। স্বামীজী এ জিনিষ সমর্থন করেন নি। দরিদ্রের রক্তশোষণ, তাদের প্রতি অবহেলা চিরদিন চলতে পারে না তিনি বুঝেছিলেন, এর পরিবর্তন ঘটবেই। এই পাপ অপসারিত হলেই ভারত জাগবে, ভারত বাঁচবে। তাঁর মতে, ভারত সত্যের সাধনায় মেতে আছে।

ভারত শিখিয়েছে—সত্যের জন্য সব কিছু ত্যাগ করা যায়, কিন্তু কোন কিছুর জন্যই সত্যকে ত্যাগ করা চলে না। ভারতের মৃত্যু হলে সত্যের মৃত্যু হবে ; যত উচ্চ চিন্তা আছে তার মৃত্যু হবে। তাই ভারতকে বাঁচতেই হবে, ভারতকে আবার সর্বাঙ্গ-সুন্দর মহৎ হতে হবে। জগৎসভায় আবার ভারতকে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করতে হবে।

স্বামীজী যুবক। তারুণ্যের প্রতিমূর্তি। তিনি নিজেও তরুণ। তাঁর প্রত্যাশাও তরুণদের কাছে, যুবসমাজের কাছে। তাঁর গুরুদেব এই তরুণদেরই পছন্দ করতেন, তিনিও তাই। তরুণরা নিষ্পাপ, পবিত্র, অনাঘ্রাত ফুলের মত। জগতের কোন মলিনতা তাদের স্পর্শ করে নি, যে-কোন উচ্চ আদর্শের জন্য তারা প্রাণ দিতেও প্রস্তুত। স্বামীজী তাদের বলছেন—'জন্ম থেকেই তুমি মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত।' অগণিত আর্ত নর-নারীই হল সেই মা। এ খুব কঠিন কাজ, কঠিন আদর্শ। তরুণরাই এ আদর্শ মেনে নিতে পারে। সে জন্য তাঁর আহ্বান ছিল তরুণদের প্রতিই।

দেশের এই কাজ করতে গেলে নিজেকে উপযুক্ত হতে হবে। তাই স্বামীজী চেয়েছিলেন যে, যুবকরা 'মানুষ' হোক। তিনি মানুষই চেয়েছিলেন, পশু নয়। বীর্যবান, সম্পূর্ণ অকপট, তেজস্বী ও বিশ্বাসী হবে তারা। তাদের পেশী হবে লোহার মত দৃঢ়, স্নায়ু হবে ইস্পাত নির্মিত, আর তার মধ্যে থাকবে একটি মন, যা বজ্রের উপাদানে গঠিত। তারা হবে হৃদয়বান, চরিত্রবান, শ্রদ্ধাবান ও বিবেকবান। বুদ্ধি, হৃদয়, নিষ্ঠা, কর্মশক্তি এবং নিঃস্বার্থ সেবার মনোভাব নিয়ে দুর্বার শক্তিতে তারা দেশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। দরিদ্রের কুটিরে কুটিরে গিয়ে তারা মানুষকে উদ্দীপিত করবে। সেবা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা দিয়ে তাদের জাগাতে হবে, তাদের লুপ্ত ব্যক্তিত্ব ফিরিয়ে দিতে হবে। তাদের বলতে হবে—তুমিও মানুষ, তোমার মধ্যেও শক্তি আছে। এসব করতে হবে সেবার মনোভাব নিয়ে। তিনি সেবা চান, দয়া নয়। 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'। 'দরিদ্রদেবো ভব, মূর্খদেবো ভব'। মানুষের মধ্যেই ঈশ্বর আছেন। দরিদ্র নারায়ণ। তাই ঈশ্বরজ্ঞানে শ্রদ্ধা ও প্রীতির সঙ্গে মানুষের সেবা করতে হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন—'খালি পেটে ধর্ম হয় না।' স্বামীজী বলেছিলেন—'আগে অন্ন, পরে ধর্ম।' পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার সাহায্য নিয়ে স্বামীজী দেশের বৈষয়িক উন্নতি ঘটাতে চেয়েছিলেন। তাঁর ইচ্ছা যুবকরা কারিগরী বিদ্যা শিখে দেশে কলকারখানা গড়ে তুলুক। তাতে কর্মসংস্থান হবে। তিনি চান—মানুষের ভোগের উপকরণ বৃদ্ধি পাক, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য

সকলের জীবন ভরে উঠুক, জীবনের মান উন্নত হোক। কিন্তু এটাই সব নয়। কেবলমাত্র বাইরের সম্পদ অর্জন করলে হবে না, চাই অন্তরের সম্পদ। সত্যানুরাগ, প্রেম, প্রীতি, ক্ষমা, নিঃস্বার্থপরতা, উদারতা—এগুলি হল অন্তরের সম্পদ। এই-ই হল ধর্ম। ধর্ম মানুষকে সৎ, সুন্দর, উদার, প্রেমপরায়ণ, নিঃস্বার্থ, সাহসী ও চরিত্রবান করে। স্বামীজী তাই চান বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের সমন্বয়, প্রাচীন ভারতীয় জীবনাদর্শের সঙ্গে আধুনিকতার সমন্বয়।

যুবকরাই যুগে যুগে, দেশে দেশে নতুন ইতিহাস রচনা করে। স্বামীজীও তাই যুবকদের ওপরেই ভরসা করেছিলেন। তাঁর কাজের জন্য যুবকদেরই আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাঁর আহ্বানে সেদিন অসংখ্য তরুণ দেশসেবার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। অনেকে প্রাণও দিয়েছে। স্বামীজী ছিলেন সমস্ত জাতীয় চেতনার উৎস। সে যুগে ছোটবড় সর্বস্তরের নেতাই তাঁর দ্বারা দেশসেবায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ, মহাত্মা গান্ধী, নেতাজী—এঁরা প্রত্যেকেই স্বামীজীর কাছে তাঁদের ঋণের কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। স্বামীজীর প্রভাব আজও কাজ করে চলেছে। আজকের হতাশা ও নীতিহীনতার দিনে স্বামীজীর বাণীই আমাদের ভরসা। যুবকরা এর মধ্যেই জীবনের পথ খুঁজে পাবে। "ওঠ, জাগো, আর ঘুমিও না। সকল অভাব, সকল দুঃখ ঘুচাবার শক্তি তোমাদের নিজেদের ভেতরই রয়েছে। এ কথা বিশ্বাস করো, তাহলেই ঐ শক্তি জেগে উঠবে।"

নিবেদন

আন্তর্জাতিক যুববর্ষ উপলক্ষে ভারত সরকার স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন ১২ই জানুয়ারীকে 'জাতীয় যুবদিবস' এবং পরবর্তী সাতদিনকে 'যুব-সপ্তাহ' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। স্থির হয়েছে যে, এখন থেকে প্রতি বৎসর এই 'জাতীয় যুব দিবস' এবং 'যুব-সপ্তাহ' পালিত হবে। স্বামীজীর জন্মদিনকে 'জাতীয় যুবদিবস' হিসেবে চিহ্নিত করা যে বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই শুভ সিদ্ধান্তের জন্য সরকারকে সাধুবাদ জানাই।

স্বামী বিবেকানন্দকে যাঁরা নিছক একজন সন্ন্যাসী, ধর্মনেতা বা আধ্যাত্মিক ভাবসম্পন্ন মানুষ বলে মনে করেন, আমি তাঁদের সংগে একমত নই। তাঁর ব্যক্তিত্বের ঐ বিশেষ দিকটি একেবারে বাদ দিয়েও অত্যন্ত দৃঢ়তার সংগে বলতে পারি, ভারত ইতিহাসে এ ধরনের প্রতিভাবান মানুষ ইতিপূর্বে আর কখনো জন্মগ্রহণ করেন নি। নিছক ভক্তির প্রাবল্যে এ কথা বলছি না—স্বামীজীর জীবন কর্ম ও রচনাবলীর সংগে পরিচিত যে-কোন নিরপেক্ষ মানুষকেই এ কথা স্বীকার করতে হবে। তাঁর বহুমুখী প্রতিভা, মানবপ্রেম, দেশপ্রেম ও মননশীলতা যে-কোন মানুষকে বিস্মিত করে। আমৃত্যু তিনি ছিলেন যুবক। তাঁর কর্মপ্রয়াস দেশের সমগ্র মানুষের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করলেও যুবকরাই তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল সবচেয়ে বেশী। তাঁর আহ্বান ছিল মূলতঃ যুবকদের কাছেই এবং তিনি সর্বদা যুবকদের সংগেই মিশতে চাইতেন। তাঁকে কেন্দ্র করে ভারতের নানা অঞ্চলে যুবসমাজ সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছিল—অনুপ্রাণিত হয়েছিল তাঁর দেশপ্রেম, মানবহিতৈষণা ও সেবাদর্শে। বস্তুতঃ তিনি ছিলেন ভারতের প্রথম এবং প্রথম সফল যুবনেতা। যুবসমাজ যুগে যুগে তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছে। অরবিন্দ ঘোষ, বাঘা যতীন, গান্ধীজী, সুভাষচন্দ্র—ছোট-বড় সব নেতার জীবনেই তাঁর প্রভাব সুস্পষ্ট। স্বামীজী অমর। তাঁর জীবন ও বাণী যুগ যুগ ধরে যুবসমাজকে পথ দেখাবে। এই উদ্দেশ্যে যুববর্ষ উপলক্ষে যুবক ভারতের জন্য এই গ্রন্থ রচিত হয়েছে।

গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে যুবক নরেন্দ্রনাথ ও তাঁর বহুমুখী প্রতিভার কথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে যুবা-সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের অসাধারণ প্রতিভা, যুবকদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা, তাঁর বিশ্বজয় এবং তার গুরুত্বের কথা আলোচিত হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ের বিষয়বস্তু হল বিশ্বজয়ী বীরের ভারত-

প্রত্যাবর্তন, ভারতে জনজাগরণ এবং যুবমানসে তার প্রতিক্রিয়া। চতুর্থ অধ্যায়ে স্বামীজী-কাঙ্ক্ষিত আদর্শ যুবকের গুণাবলী, তাদের জন্য স্বামীজী প্রদত্ত কার্যক্রম এবং তা বাস্তবায়িত করার পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ের বিষয়বস্তু হল—যুবমানস তথা জাতীয় আন্দোলনে স্বামীজীর প্রভাব।

স্বামীজী সম্পর্কে প্রকাশিত ইংরেজী ও বাংলা সব গ্রন্থ থেকেই তথ্য সংগ্রহ করেছি, কিন্তু স্বামী গম্ভীরানন্দজী রচিত 'যুগনায়ক বিবেকানন্দ' ও অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসুর 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ' থেকে সংগৃহীত তথ্যাদি পৃথকভাবে চিহ্নিত করিনি। কারণ স্বামীজী সম্পর্কিত নানা মূল্যবান গ্রন্থের মধ্যেও এগুলি অপরিহার্য।

ইচ্ছে ছিল পরম পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী মহারাজ গ্রন্থের ভূমিকা লিখবেন। অনিবার্য কারণে তা সম্ভব না হওয়ায় পূজনীয় মহারাজের একটি রচনা গ্রন্থের শুরুতে প্রকাশিত হল।

গ্রন্থটির পরিকল্পনা থেকে প্রকাশ পর্যন্ত যে মানুষটির সাহায্য সহযোগিতা ও পরামর্শ সর্বদাই পেয়েছি, তিনি হলেন আমার সতীর্থ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের সন্ন্যাসী স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ (রামকৃষ্ণ মিশন ইন্‌স্টিটিউট্ অব কালচার, গোলপার্ক)।

গ্রন্থের প্রকাশক শ্রী জহরলাল গোস্বামীর ঐকান্তিকতা, সদিচ্ছা এবং উৎসাহ-ই আমাকে এত অল্প সময়ের মধ্যে এ-গ্রন্থ রচনার কাজ শেষ করতে বাধ্য করেছে। সর্বশেষে উল্লেখ করি শ্রীগোবিন্দনারায়ণ রায়মৌলিকের কথা। তাঁর প্রচেষ্টা ছাড়া এত দ্রুত এত সুন্দর ভাবে বইটি প্রকাশ করা সম্ভব হতো না।

স্বামীজীর কোন বিকল্প নেই। গ্রন্থটি পাঠ করে বাংলার একজন যুবকও যদি স্বামীজীর পরিকল্পনা ও আদর্শকে অতি ক্ষীণভাবেও বাস্তবায়িত করতে উদ্যোগী হন, তাহলেই এই গ্রন্থের সার্থকতা। ইতি

জীবন মুখোপাধ্যায়

১

প্রতিভাবান যুবক নরেন্দ্রনাথ

"হে বন্ধুগণ,……ভারতে আমি কতকগুলি শিক্ষালয় স্থাপন করিব—তাহাতে আমাদের যুবকগণ…… শিক্ষালাভ করিবে। মানুষ চাই, মানুষ চাই; আর সব হইয়া যাইবে। বীর্যবান্, সম্পূর্ণ অকপট, তেজস্বী, বিশ্বাসী যুবক আবশ্যক। এইরূপ একশত যুবক হইলে সমগ্র জগতের ভাবস্রোত ফিরাইয়া দেওয়া যায়।……আমাদের এখন আবশ্যক—শক্তিসঞ্চার। আমরা দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি। সেইজন্যই আমাদের মধ্যে এই-সকল গুপ্তবিদ্যা, রহস্যবিদ্যা, ভুতুড়েকান্ড সব আসিয়াছে। ঐগুলির মধ্যে কিছু মহৎ তত্ত্ব থাকিতে পারে, কিন্তু ঐগুলি আমাদিগকে প্রায় নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। তোমাদের স্নায়ু সতেজ কর। আমাদের আবশ্যক—লৌহের মত পেশী ও বজ্রদৃঢ় স্নায়ু। আমরা অনেকদিন ধরিয়া কাঁদিয়াছি; এখন আর কাঁদিবার প্রয়োজন নাই, এখন নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া মানুষ হও। আমাদের এখন এমন ধর্ম চাই, যাহা আমাদিগকে মানুষ করিতে পারে। আমাদের এমন সব মতবাদ আবশ্যক, যেগুলি আমাদিগকে মানুষ করিয়া গড়িয়া তোলে। যাহাতে মানুষ গঠিত হয়, এমন সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ শিক্ষার প্রয়োজন।" (বাণী ও রচনা, ৫ম, পৃঃ ১১৩-১৫)।

"তোমরা কি মানুষকে ভালবাসো? তোমরা কি দেশকে ভালবাসো? তাহলে এস, আমরা ভাল হবার জন্য—উন্নত হবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করি। পেছনে চেও না—অতি প্রিয় আত্মীয়স্বজন কাঁদুক; পেছনে চেও না, সামনে এগিয়ে যাও। ভারতমাতা অন্ততঃ সহস্র যুবক বলি চান। মনে রেখো—মানুষ চাই—পশু নয়।" (ঐ, ৬ষ্ঠ, পৃঃ ৩৫৯)।

বলা বাহুল্য, এ কথাগুলি বর্তমান শতাব্দীর কোন বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতার কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হয়নি। আজ থেকে প্রায়-শতবর্ষ পূর্বে নবভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রূপকার, গৈরিকধারী সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের যুবসমাজকে দেশমাতৃকার মুক্তিযজ্ঞে অংশ গ্রহণের জন্য এভাবেই আহ্বান জানিয়েছিলেন। গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের মতই স্বামীজীর আহ্বান ছিল যুবকদের প্রতি—বৃদ্ধদের প্রতি নয়। যুবকরা অকপট সত্যনিষ্ঠ আদর্শবাদী—

বিষয়ী লোকদের কূটনীতি বা মিথ্যাচার থেকে তারা মুক্ত। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন—"ছোকরারা খাঁটি দুধ, একটু ফুটিয়ে নিলেই হয়।" তিনি বলতেন—"ছোকরারা যেন নূতন হাঁড়ি, দুধ নিশ্চিন্ত হয়ে রাখা যায়।" প্রাণপ্রিয় এই যুবকদের কাছে নিজ আদর্শের কথা ব্যক্ত করে তাদের মধ্যে নিজ শক্তি সঞ্চারিত করার জন্য একদা ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব। অনাগত এই যুবকদের আগমন-প্রতীক্ষায় অস্থির হয়ে উঠেছিলেন তিনি। দক্ষিণেশ্বরে ছাদের ওপর উঠে কাঁদতে কাঁদতে চীৎকার করে তাদের উদ্দেশ্যে বলতেন—"তোরা সব কে কোথায় আছিস, আয় রে—তোদের না দেখে আর থাকতে পারছি না।" শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দও ঠিক তাই—যুবকরা ছিল তাঁর মনের মানুষ, তাঁর প্রাণের মানুষ, তাঁর আদর্শকে বাস্তবায়িত করার প্রধান হাতিয়ার—এই যুবকদের মধ্যেই তিনি তাঁর আদর্শ ও শক্তিকে সঞ্চারিত করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। তাঁর আহ্বান ছিল যুবকদের কাছে, যুবকদের জন্য তাঁর দ্বার ছিল অবারিত এবং তিনি নিজেও যুবকদের সঙ্গে মিশতে চাইতেন কারণ তিনি জানতেন যে, যুবকরাই দেশ জাতি ও মানব সমাজের ভবিষ্যৎ—যে কোন উচ্চ আদর্শের জন্য তারা অকপটে প্রাণ বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত। যুবকদের প্রতি তাঁর আহ্বান :—"বঙ্গীয় যুবকগণ, তোমাদের দ্বারাই ভারতের উদ্ধার সাধিত হইবে। তোমরা বিশ্বাস কর, বা না কর, উহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিও।····· আমি যেমন আমার দেহ ও আমার আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী, সেইরূপ দৃঢ়ভাবে ইহাও বিশ্বাস করিয়া থাকি। সেই জন্য হে বঙ্গীয় যুবকগণ, তোমাদের প্রতি আমার হৃদয় আকৃষ্ট। তোমাদের টাকাকড়ি নাই; তোমাদেরই উপর ইহা নির্ভর করিতেছে; যেহেতু তোমরা দরিদ্র, সেই জন্যই তোমরা কাজ করিবে। যেহেতু তোমাদের কিছুই নাই, সেহেতু তোমরা অকপট হইবে। অকপট বলিয়াই তোমরা সর্বত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইবে।···ইহাই তোমাদের জীবনব্রত, ইহাই আমার জীবনব্রত। তোমরা যে-দার্শনিক মতই অবলম্বন কর না কেন, তাহাতে কিছু আসে যায় না।" (ঐ, ৫ম, পৃঃ ৩৫৪-৫৫)

স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বান শুধু কথার কথা নয়, ফাঁকা বুলি নয়, মিথ্যা চমক সৃষ্টি নয়—এর মধ্যে আছে মৃত্যুকে বরণ করার সংকল্প, অসম্ভবকে সম্ভব করে দৃঢ়তা এবং অজেয়কে জয় করার শপথ। ভারত সেদিন পরাধীন, জগদ্দল পাথরের মত সেদিন ভারতের বুকে বসে আছে স্বৈরাচারী ইংরাজ শাসনব্যবস্থা।

সাম্রাজ্যবাদী শাসনাধীনে স্বর্ণপ্রসূ ভারত নেমে এসেছে দুর্দশার সর্বনিম্ন স্তরে। ভারতীয় সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি, অর্থনীতি, বিদ্যাচর্চা—সর্বস্তরেই সেদিন এক সীমাহীন দুর্দশা ও প্রবঞ্চনার চিত্র পরিস্ফুট। শিক্ষা-সংস্কৃতি-কৃষ্টি-সভ্যতা অবলুপ্ত—বিদেশীর অন্ধ অনুকরণে ব্যস্ত ভারতবাসী। সীমাহীন বেকারত্ব, সরকারী পীড়ন, শোষণ, অপশাসন, দুঃসহ করভার, অনাহার, অর্ধাহার, দুর্ভিক্ষ এবং রোগ-মহামারীতে দেশ সেদিন স্থবির—সোনার দেশ শ্মশানে পরিণত হয়েছে। নিজ বাসভূমে ভারতবাসী সেদিন পরবাসী। ঋষি বঙ্কিমের মতে, "আমরা দিন দিন নিরুপায় হইতেছি। অতিথিশালায় আজীবনবাসী অতিথির ন্যায় আমরা প্রভুর আশ্রমে বাস করিতেছি। এই ভারতভূমি একটি বিস্তীর্ণ অতিথিশালা মাত্র।" (আনন্দমঠ ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ, জীবন মুখোপাধ্যায়, (পৃঃ ৬২-তে উদ্ধৃত)।

এর সঙ্গে আছে যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত ভারতের পাপরাশি—নানা অন্ধ কুসংস্কার—জাতিভেদ, বাল্যবিবাহ, ধনীর দম্ভ, উচ্চবর্ণের অত্যাচার, পুরোহিতের শোষণ, নারীর প্রতি অনাচার এবং কোটি কোটি দরিদ্র স্বজাতি স্বদেশবাসী—সাধারণ মানুষের প্রতি তীব্র বঞ্চনা, অবজ্ঞা এবং নির্যাতন।

যুবসমাজের দায়িত্ব হল দেশকে এই পর্বত-প্রমাণ আচার ও অন্ধকারের বন্ধন থেকে মুক্ত করে দেশবাসীকে স্বাধীনতার স্বর্গরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করা। কাজ খুবই কঠিন—'ক্ষুরস্য ধারা' দুর্গম এ পথ—অপমান লাঞ্ছনা মৃত্যু প্রতি পদে পদে—এ কাজের উপযুক্ত একমাত্র যুবকেরাই। দেশে দেশে কালে কালে যুগে যুগে এই যুবকরাই অসম্ভবকে সম্ভব করে, দুঃসহ দুর্নীতির বিরুদ্ধে তারাই একমাত্র সদর্পে মাথা তুলে প্রতিবাদ করতে পারে, তারাই নবযুগের বার্তাবাহক —পুরনোর বিরুদ্ধে তারাই বিদ্রোহ করতে সাহসী হয়। তারা ইতিহাসের শিকার নয়—ইতিহাসের স্রষ্টা—তারাই ইতিহাস রচনা করে। ভারতীয় যুব-সমাজের প্রতি স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বান: "এগিয়ে যাও, বৎসগণ। সমগ্র জগৎ জ্ঞানালোক চাইছে—উৎসুক নয়নে তার জন্য আমাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।......হে বীরহৃদয় যুবকগণ, তোমরা বিশ্বাস কর যে, তোমরা বড় বড় কাজ করবার জন্য জন্মেছ। কুকুরের ঘেউ ঘেউ ডাকে ভয় পেও না—এমন কি আকাশ থেকে প্রবল বজ্রাঘাত হলেও ভয় পেও না—খাড়া হয়ে ওঠ, ওঠ, কাজ কর।" (বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ, পৃঃ ৪৭৬-৭৭)।

দেশের মুক্তির চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠেছিলেন স্বামীজী। সন্ন্যাসীর বহু-কাঙ্ক্ষিত মোক্ষ নয়—দেশবাসীর মুক্তিই ছিল তাঁর একমাত্র কাম্য। একমাত্র এই কারণেই সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী হয়েও মানুষের কর্মকোলাহল বিবর্জিত বিজন অরণ্য বা নির্জন গুহায় তিনি তাঁর সাধনপীঠ স্থাপন না করে পাপ-কলুষিত সমস্যা-কণ্টকিত জগৎকে বুকে জড়িয়ে ধরেছেন, দুর্দশাগ্রস্ত মানুষ এবং লাঞ্ছিত মানবাত্মার মধ্যে সন্ধান করেছেন মুক্তিদাতা দেবতার। দেশমাতাই ছিলেন তাঁর একমাত্র আরাধ্যা দেবী। অশিক্ষা, অন্ধ কুসংস্কার, বঞ্চনা, লাঞ্ছনা, দারিদ্র্য ও শোষণের হাত থেকে দেশবাসীকে মুক্ত করাই হল তাঁর কাছে দেশমাতৃকার উপাসনা। তিনি জানতেন যে, একমাত্র যুবকরাই শত শত বছরের এই অনাচার থেকে ভারতকে রক্ষা করতে পারে এবং একমাত্র এ জন্যই তিনি যুবসমাজকে সংগঠিত করতে চেয়েছিলেন। এ সম্পর্কে জুনাগড়ের দেওয়ান হরিদাস বিহারীদাস দেশাইকে তিনি লেখেন: "আমি এই যুবকদলকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছি।......ভারতের নগরে নগরে আরও শত শত যুবক আমার সহিত যোগ দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে। ইহারা দুর্দমনীয় তরঙ্গাকারে ভারতভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হইবে, এবং যাহারা সর্বাপেক্ষা দীন হীন ও পদদলিত—তাহাদের দ্বারে দ্বারে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, নীতি, ধর্ম ও শিক্ষা বহন করিয়া লইয়া যাইবে—ইহাই আমার আকাঙ্ক্ষা ও ব্রত, ইহা আমি সাধন করিব কিংবা মৃত্যুকে বরণ করিব।" (ঐ, ৬ষ্ঠ, পৃঃ ৩৯৪)।

স্বামীজী একজন যুব-সংগঠক, যুবনেতা এবং যুবকদের নেতা—ভারতের প্রথম, সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সফল যুবনেতা। ইতিপূর্বে ভারতবর্ষে যুবসমাজকে সংগঠিত করার বিশেষ কোন প্রয়াস দেখা যায় না। হিন্দু কলেজের তরুণ অধ্যাপক হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯-৩১) তাঁর ছাত্রদের যুক্তিবাদী স্বাধীন চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করতে সচেষ্ট হন। তাঁকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে নব্যবঙ্গ-গোষ্ঠী। নব্যবঙ্গ-গোষ্ঠীর দেশপ্রেম ও চিন্তার স্বকীয়তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার বিষয়, কিন্তু কালাপাহাড়ের মত তাঁরা যেন কেবল ভাঙতেই এসেছিলেন। একদিকে হিন্দুধর্ম ও ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে কালাপাহাড়ী মনোভাব এবং অপরদিকে অন্ধ পাশ্চাত্য ও অনুকরণ খ্রীষ্ট-প্রীতির জন্য বাংলার বুকে তারা কোন স্থায়ী প্রভাব ফেলতে পারেনি। এছাড়া, এই গোষ্ঠী মূলতঃ কলকাতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ছাত্রদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা ও দেশপ্রেম সঞ্চারের উদ্দেশ্যে আনন্দমোহন বসুর উদ্যোগে কলকাতায় 'ছাত্র সভা' বা 'স্টুডেন্টস্ অ্যাসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সমিতির কিছু সদস্য পরবর্তীকালে কৃতী দেশনেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলেও এর কার্যকলাপও ছিল কলকাতা-কেন্দ্রিক এবং সমিতির অধিবেশনে বসে নেতাদের তপ্ত বক্তৃতা শ্রবণ করা ব্যতীত ছাত্রদের অন্য কোন কাজ ছিল না।

এমতাবস্থায় স্বামীজীর আহ্বান ছিল সমগ্র ভারতের যুবকদের প্রতি। তিনি তাদের সংগঠিত করেছিলেন, তাদের অন্তরে নিজ আদর্শ সঞ্চারিত করেছিলেন এবং কার্যকরী পরিকল্পনা দিয়ে তিনি তাদের কাজেও নামিয়েছিলেন। স্বামীজীর জীবদ্দশায় হাজার হাজার যুবক ছুটে এসেছিল তাঁর ডাকে। তাদের চোখে স্বামীজী শুধু নেতা নয়—গুরু, বিশ্বজয়ী মহাবীর, যুগাবতার। তাঁর মহাপ্রয়াণের পর অরবিন্দ ঘোষ, মহাত্মা গান্ধী, চিত্তরঞ্জন দাশ, যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, সুভাষচন্দ্র বসু এবং মানবেন্দ্রনাথ রায়ের মতো লাখো লাখো যুবক স্বামীজীর পতাকাকে তুলে ধরেছেন। বাংলার বিপ্লবী সমাজ ও সমাজতন্ত্রীদের নিত্যসঙ্গী ছিল তাঁর রচনাবলী। আজ স্বামীজী প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের পরিধি বহু দূর-বিস্তৃত—কোটি কোটি যুবক আজ স্বামীজীর অনুগামী—তাঁর ভাবশিষ্য। এ কারণেই তিনি যুবকদের নেতা—যুবনেতা।

যুবকদের যুবকরাই নেতা হন—বৃদ্ধরা নন। স্বামীজী আমৃত্যু যুবক। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারী থেকে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই—মাত্র উনচল্লিশ বছর তিনি জীবন ধারণ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর প্রকৃত কার্যকাল হল মাত্র দশ বছর (১৮৯৩-১৯০২ খ্রীঃ)। এই সামান্য সময়ের মধ্যে বিশ্বে তিনি মহাপ্রলয়ের সৃষ্টি করেছিলেন—পাশ্চাত্য দুনিয়া তাকে 'সাইক্লোনিক মঙ্ক' অভিধায় ভূষিত করেছিল। ভারতেও তিনি এক অভূতপূর্ব 'সাইক্লোন'—ঝঞ্ঝা। ভারতে তিনি রেখে গেলেন এক বলিষ্ঠ যুবসমাজ—গঠন করলেন আত্মবিশ্বাসে ভরপুর প্রাণবন্ত এক জাতি; যারা ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে ঘোষণা করল—"আমরা চাই ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণ-মুক্ত পূর্ণ স্বাধীনতা।"

স্বামীজী ধর্মনেতা, বিশ্বজয়ী মহাবীর, রামকৃষ্ণ মিশনের প্রাণপুরুষ, দেশ-বিদেশের রাজন্যবর্গ এবং শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ তাঁর গুণগ্রাহী—এমন কি কৃপাপ্রার্থীও বটেন। খ্যাতির তুঙ্গে উঠেও স্বামীজী যুবক, তাঁর আচরণ ও কার্যকলাপ সম্পূর্ণ যুবজনোচিত এবং নেতৃসুলভ। স্বামীজী আজীবন নেতা—বাল্যকাল থেকে মৃত্যু পর্যন্ত। বিবেকানন্দ-ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ লিখেছেন—"বাল্যকালেই বেশ দেখা যাইত যে সর্দারগিরির জন্যই যেন এই বালকটি জন্মিয়াছে। বীরেশ্বর বা বিলে হুকুম করিবে আর সকল ছেলে শুনিবে। ঝগড়া হইলে বীরেশ্বর মিটাইয়া দিবে, অপর কেহ হইলে ঝগড়া বাড়িয়া যাইত।" স্কুলে তিনি ছিলেন "সর্দার-পোড়ো"। পাড়ায় সমবয়স্ক বালকদের সঙ্গে খেলার সময় তিনি 'রাজা' হয়ে সিঁড়ির সর্বোচ্চ ধাপে বসতেন। মহেন্দ্রনাথ লিখছেন যে, "রাজা হয়ে তিনি 'মহাগম্ভীর ও স্বতন্ত্ররূপ' ধারণ করতেন—তাঁর চাল-চলন, কণ্ঠস্বর, চোখের দৃষ্টি সব পাল্টে যেত। বাল্যবন্ধু প্রিয়নাথ সিংহের স্মৃতিকথা থেকে জানা যায় যে, কলেজ জীবনেও তিনি ছিলেন দলনেতা। গুরু-ভ্রাতাদের কাছেও তাই। লাটু মহারাজের (স্বামী অদ্ভুতানন্দ) স্বীকৃতি—"লোরেন-ভাই আমাদের লিডর।" বলতে বাধা নেই—নরেন্দ্রনাথ জন্ম থেকেই লীডার—সবার লীডার—তাঁর লীডারশিপেই ভারত নামে ঘুমন্ত দেশটা জেগে উঠেছে, জেগেছে ভারতীয় নামে মৃতপ্রায় অবসাদক্লিষ্ট জাতিটা। যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবই তাঁকে এই লীডারশিপ দিয়ে গেছেন। নির্বিকল্প সমাধি-লাভেচ্ছু নরেন্দ্রনাথের প্রতি ভর্ৎসনা করে যুগাবতার তাঁকে বলেছিলেন—"ছি ছি, তুই এত বড় আধার, তোর মুখে এই কথা! আমি ভেবেছিলাম, কোথায় তুই একটা বিশাল বটগাছের মত হবি, তোর ছায়ায় হাজার হাজার লোক আশ্রয় পাবে, তা না হয়ে তুই কিনা শুধু নিজের মুক্তি চাস! এ তো অতি তুচ্ছ হীন কথা। নারে, এত ছোট করিস নি।" অবশেষে একদিন তাঁর ব্রহ্মানুভূতি হল। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বললেন—"চাবি কিন্তু আমার হাতে রইল। এখন তোকে কাজ করতে হবে। যখন আমার কাজ শেষ হবে তখন আবার চাবি খুলব।" মহাসমাধির পূর্বে তিনি তাঁর ত্যাগী সন্তানদের দেখাশোনার সব দায়িত্ব নরেন্দ্রনাথকেই দিয়ে যান। স্বামী অভেদানন্দ বলছেন—"প্রকৃতপক্ষে নরেন্দ্রনাথই ছিল আমাদের সকল সময়ের

আশা-ভরসা, সুখ-সান্ত্বনার স্থল" (আমার জীবনকথা, স্বামী অভেদানন্দ, পৃঃ ১৬৭)।

'নেতৃত্বের সহজাত গুণগুলি নিয়েই জন্মেছিলেন ডানপিটে নরেন্দ্রনাথ। এই ডানপিটে স্বভাবই তাকে বিশ্বজয়ী নেতায় রূপান্তরিত করেছিল। বাল্যে এই দুরন্ত বালককে বশে রাখা মায়ের সাধ্যাতীত ছিল। সমবয়স্কদের সঙ্গে ছুটোছুটি, লাফালাফি, ঘুষোঘুষি, মার্বেল, লাট্টু, ঘুড়ি ওড়ানো, চোর-পুলিশ, সাঁতারকাটা, ঘোড়ায় চড়া, কুস্তি, লাঠিখেলা, জিমন্যাস্টিক—সর্ব বিদ্যাতেই তিনি বিশারদ ছিলেন, শুধু বিশারদ নয়—নেতা। তিনি ক্রিকেটও খেলতেন। শোনা যায় যে, কলকাতার টাউন ক্লাবে তিনি ক্রিকেট খেলতেন। তাঁর ডান চোখের ওপর কাটা দাগ—বাল্যের ক্রীড়া-অলঙ্কার—রাজটিকা। স্কুলে কোনদিনই বেঞ্চে বসতেন না—সর্বদাই আধ-বসা, আধ-দাঁড়ানো একটা ভঙ্গী। সকাল-সন্ধ্যে সামান্য কিছুক্ষণ পড়েই খেলায় মাততেন। ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ বলছেন—পড়ার সামান্য সময়টুকু বাদে তিনি "বাকি সব সময় খেলা ও দুরন্তপনা" করে বেড়াতেন। বাড়ীতে, স্কুলে, টিফিনের সময়—সর্বদাই একই চিত্র। বন্ধুদের সঙ্গে সর্বদাই চলত গল্প, গান বা দুষ্টুমি—ক্লাসে শিক্ষকের পড়ানর সময়েও তে বাদ যেত না। লেখাপড়ায় অল্প সময় দিতেন, সারা বছর বিশেষ মন দিয়ে পড়তেন না, কিন্তু পরীক্ষার আগে মাস খানেক মনোযোগের সঙ্গে লেখাপড়া করে পরীক্ষায় বেশ ভাল ফল করতেন। পরবর্তীকালে তিনি নিজেই বলেছেন, "ছেলেবেলায় আমি বড় ডানপিটে ছিলুম, তা না হলে কি আর একটা কানাকড়ি সঙ্গে না নিয়ে দুনিয়াটা ঘুরে আসতে পারতুম?"'

তাঁর বাল্যকালের এমন কিছু ঘটনা আমাদের জানা আছে যা থেকে অনায়াসেই তাঁর অসমসাহসিকতা, বুদ্ধিমত্তা ও নেতৃত্বসুলভ গুণের পরিচয় পাওয়া যায়।

নরেন্দ্রনাথ তখন ছ'বছরের বালক। এক সমবয়সীকে নিয়ে তিনি চড়ক দেখতে গেছেন। সেখানে একটি মাটির শিবমূর্তি কিনে বন্ধুর সঙ্গে বাড়ী ফিরছেন। প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছে এবং বন্ধুটিও একটু পিছিয়ে পড়েছে। এমন সময় একটি ঘোড়ার গাড়ী দ্রুতবেগে পেছনে আসছে বুঝতে পেরে পেছনে তাকিয়ে দেখেন যে, বন্ধুটি এক্ষুণি ঘোড়ার পায়ের তলায় পড়বে। রাস্তার লোক সবাই 'গেল গেল!' করে চীৎকার করছে, কিন্তু কেউই সাহস করে এগিয়ে আসছে

না। এই অবস্থা দেখে বালক নরেন্দ্রনাথ শিবমূর্তিটি বগলে পুরে প্রচণ্ডবেগে দৌড়ে গিয়ে বন্ধুটিকে টেনে এনে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করলেন।

আরেকবার সাত-আট বছর বয়সে কয়েকজন সহপাঠীকে নিয়ে নরেন্দ্রনাথ নৌকোয় করে চাঁদপাল ঘাট থেকে মেটিয়াবুরুজে নবাব ওয়াজিদ আলির পশুশালা দেখতে যান। ফেরার সময় একটি বালক অসুস্থ হয়ে নৌকোয় বমি করে। মাঝিরা তাদের বমি পরিষ্কার করে দিতে বলে। ছেলেরা রাজী নয় এবং এজন্য তারা দ্বিগুণ ভাড়া দেবার প্রস্তাবও করে। মাঝিরা এতেও রাজী নয়, তারা নানা গালিগালাজ শুরু করল—এমনকি পাড়ের কাছে নৌকো এলে তারা বলল যে, তাদের কথা না শুনলে নৌকো ভেড়ান হবে না। ঘাটের অন্যান্য মাঝিও তাদের সঙ্গে যোগ দিল। বলা বাহুল্য, বালকেরা সকলেই তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ়। নরেন্দ্রনাথ বয়সে সবার ছোট। এরই মধ্যে এক ফাঁকে লাফ দিয়ে তিনি পাড়ে ওঠেন এবং বন্ধুদের উদ্ধারের উপায় ঠিক করতে থাকেন। ঐ সময় দুজন গোরা সৈন্য সে পথ দিয়ে যাচ্ছিল। বালক তাদের কাছে সব ঘটনা ব্যক্ত করে বন্ধুদের উদ্ধারের আবেদন জানায়। সাহেবদের দেখে মাঝিরা বালকদের ছেড়ে দেয়।

আরেকটি ঘটনা। তাঁর বয়স তখন দশ বছর। কলকাতা বন্দরে তখন একটি বিরাট যুদ্ধজাহাজ এসেছে। ঠিক হল বন্ধুদের সংগে তিনি যুদ্ধজাহাজটি দেখতে যাবেন। জাহাজ দেখতে হলে চৌরঙ্গীতে এক সাহেবের অফিস থেকে অনুমতি নিতে হবে। নরেন্দ্রনাথ ও তাঁর বন্ধুদের বালক দেখে অফিসের দারোয়ান তাদের সাহেবের কাছে যেতে দিতে রাজী নয়। বালক নরেন্দ্রনাথ দেখলেন যে, সকলে সিঁড়ি দিয়ে দোতলার বিশেষ একটি ঘরে যাচ্ছে এবং সেখান থেকে অনুমতিপত্রসহ ফিরে আসছে। তিনি আরও লক্ষ্য করলেন যে, দোতলায় ওঠার জন্য বাড়ীর পেছনে একটি সরু ঘোরানো সিঁড়ি আছে। দারোয়ানের অলক্ষ্যে পেছনের সিঁড়ি দিয়ে নরেন্দ্রনাথ দোতলায় সাহেবের কাছ থেকে অনুমতিপত্র নিয়ে সামনের সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলেন। দারোয়ান জিজ্ঞাসা করল—"তুম ক্যায়সা উপর গয়া থা?" নরেন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন—"হাম জাদু জানতা।"

একই ধরনের খেলা নিয়ে তিনি বেশী দিন থাকতে পারতেন না। নিত্য-নতুন পরিকল্পনা বের করতেন তিনি। বাড়ীতে গড়ে তুললেন এক সখের থিয়েটার দল। কাকার আপত্তিতে তা টিঁকল না—সুতরাং ব্যায়ামের আখড়া তৈরী হল

বাড়ীতে। বন্ধুদের সংগে নিয়মিত ব্যায়ামচর্চা করতেন তিনি সেখানে। ব্যায়াম করতে গিয়ে সেখানে এক খুড়তুতো ভাইয়ের হাত ভাঙলে কাকা ব্যায়ামের সব যন্ত্রপাতি নষ্ট করে দেন। সুতরাং নরেন্দ্রনাথ এরপর 'হিন্দু মেলা'-র প্রবর্তক 'ন্যাশনাল' নবগোপাল মিত্রের ব্যায়ামের আখড়ায় যোগ দেন। সেখানে তিনি উত্তমরূপে লাঠিখেলা, অসিচালনা, নৌকাচালনা, সাঁতার এবং কুস্তি শিক্ষা করেন। এছাড়াও, তিনি অম্বু গুহ এবং যোগেন পালের আখড়ায় কুস্তি শেখেন। একবার ব্যায়াম-প্রদর্শনীতে মুষ্টিযুদ্ধে প্রথম হয়ে তিনি পুরস্কার পান। আখড়া এবং আখড়ার বাইরে কয়েকজন মুসলিম ওস্তাদের কাছেও তিনি লাঠি খেলার তালিম নেন।

নরেন্দ্রনাথের বয়স তখন দশ বছর। মেলা উপলক্ষে এক জায়গায় লাঠিখেলা চলছে। নরেন্দ্রনাথ হঠাৎ খেলোয়াড়দের উদ্দেশ্যে বলে উঠলেন যে, যে-কোন খেলোয়াড়ের সংগে তিনি প্রতিযোগিতায় নামতে প্রস্তুত। খেলোয়াড়দের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দক্ষ এবং বয়সে নরেন্দ্রনাথের চেয়ে অনেক বড় জনৈক খেলোয়াড় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হলেন। নানা কলা-কৌশল সহযোগে অনেকক্ষণ খেলা চলল এবং অবশেষে প্রতিপক্ষের লাঠি দু-টুকরো হয়ে মাটিতে ছিটকে পড়ল।

নরেন্দ্রনাথ ছিলেন এমনই খেলোয়াড়। শরীরচর্চা তিনি কখনই অবহেলা করেননি—আজীবন তিনি ব্যায়াম করেছেন—স্বদেশ ও বিদেশে—বিদেশে উত্তাল সাগরের বুকে সাঁতারও কেটেছেন।

শুধু কি ব্যায়াম? রন্ধনবিদ্যা, ছবি আঁকা, গান গাওয়া, অভিনয় করা, বক্তৃতা দেওয়া, গল্প বলা, তর্ক করা, আড্ডা দেওয়া—ক'জন তাঁর সমকক্ষ আছেন? স্কুলের ছাত্র অবস্থাতেই তিনি এসবে দক্ষ হয়ে উঠেছিলেন।

বিখ্যাত ওস্তাদ বেণী গুপ্তের কাছে তিনি চার-পাঁচ বছর গান-বাজনা ও সংগীতবিজ্ঞান এবং কাশীনাথ ঘোষালের কাছে তবলা ও পাখোয়াজ শিক্ষা করেন।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করার পর ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত জেনারেল এ্যাসেমব্লিজ ইন্স্টিটিউশনে (বর্তমান স্কটিশ চার্চ কলেজ) তাঁকে চলে যেতে হয় এবং সেখান থেকেই ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এফ. এ. এবং ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে বি. এ. পাশ করেন। এরপর

মেট্রোপোলিটন ইন্স্টিটিউশনের (বর্তমান বিদ্যাসাগর কলেজ) আইন বিভাগে তিনি বি. এল. পড়তে শুরু করেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা দেওয়া হয়নি।[৮]

কলেজ জীবনেও নরেন্দ্রনাথ ছিলেন সহপাঠীদের নেতা। এ সময় তাঁর প্রতিভার সর্বতোমুখী বিকাশ পরিলক্ষিত হয়। গান-বাজনা, গল্প-গুজব, তর্ক-বিতর্ক, মননশীল আলোচনা ও অধ্যয়ন, দুষ্টুমি—সব দিকেই তিনি সেরা। বাল্যবন্ধু প্রিয়নাথ সিংহ লিখছেন, "তাঁহার অসংখ্য গুণে সহপাঠীরা অনেকে বড়ই বশীভূত। তাহারা তাঁহার গান শুনিতে এতই ভালবাসিতেন যে, অবকাশ পাইলেই নরেনের বাটী যাইয়া উপস্থিত হইতেন। তথায় বসিয়া একবার তাঁহার তর্ক যুক্তি বা গান বাজনা আরম্ভ হইলে সময় যে কোথা দিয়া চলিয়া যাইত তাহা বুঝিতে পারিতেন না।" বন্ধুদের মজলিশে নরেন ছাড়া সব অন্ধকার—কোন কিছুই ঠিক জমত না। কলেজে পড়ার সময় নরেন্দ্রনাথ রামতনু বসু লেনে তাঁর মাতামহীর বার-বাড়ীর দোতলার একটি ঘরে থাকতেন—খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা ছিল পিত্রালয়ে। ঘরে অন্যান্য সরঞ্জামের সংগে একটি তানপুরা, একটি সেতার, একটি বাঁয়া এবং তামাক ও হুঁকো ছিল। প্রিয়নাথ সিংহ লিখছেন, একদিন বেলা এগারটা নাগাদ নরেন্দ্রনাথ মন দিয়ে পড়াশুনা করছেন। এমন সময় এক বন্ধুর আগমন হল। বন্ধুর অনুরোধ, গান গাইতে হবে। নরেন্দ্রনাথ বই মুড়ে সেতার টেনে গান শুরু করলেন—স্কুলে টেবিল-বাজান বন্ধু বাঁয়ায় ঠেকা দিয়ে চললেন। গানের পর গান চলল—টপ্পা, টপ-খেয়াল, ধ্রুপদ, বাঙ্গলা, হিন্দী, সংস্কৃত। ইতিমধ্যে সন্ধ্যে হয়েছে—চাকর প্রদীপ জেবলে দিয়ে গেছে, দুই বন্ধু এর মধ্যে বার কয়েক হুঁকো টেনেছেন মাত্র—কারো হুঁশ নেই। রাত দশটায় গান শেষ হল।

আবার কোন কোন দিন এমনও হয়েছে যে, স্নান করে বেরোবেন, তেল মাখছেন—এমন সময় বন্ধুর অনুরোধে গান শুরু হল। অন্য কাজ আর হল না—গানই চলল। আবার এমনও হয়েছে যে, ক্লাসে অধ্যাপক আসার পূর্ব-মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর গান চলছে।

ছাত্রদের মধ্যে তাঁর মত রসিক আর কেউ ছিলেন না—সব ঘটনার কৌতুককর দিকটা তাঁর নজরেই আগে পড়ত। অনেক সময় একটা গাড়ী ভাড়া করে সব বন্ধুরা মিলে তাতে গাদাগাদি করে উঠে কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় গান গেয়ে বেড়াতেন। রবিবার বা অন্য কোন ছুটির দিনে বন্ধুরা একত্রে গঙ্গাস্নানে যেতেন।

কোন পুজো বা উৎসব হলে বন্ধুদের সংগে তিনি কলকাতার রাজপথে দলবদ্ধ ভ্রমণে বের হতেন।

দুষ্টুমিতেও তাঁর জুড়ি মেলা ভার। তখন বি. এ. পরীক্ষার ফিজ্ (fees) জমা দেবার সময় হয়েছে। বন্ধু হরিদাসের অবস্থা ভাল নয়। সে ফিজের টাকা জোগাড় করেছে, কিন্তু তার এক বছরের বেতন বাকী। তার খুবই বিপদ। এই সব বেতন ও ফিজ্ মকুবের দায়িত্ব রাজকুমার নামে অফিসের এক বৃদ্ধ কেরানীর ওপর। নরেন্দ্রনাথ বন্ধুকে ভরসা দিয়েছেন যে, তিনি সব ব্যবস্থা করে দেবেন। দিন দুই পরের কথা। রাজকুমারবাবুর টেবিলে খুব ভীড়। ছেলেরা টাকা জমা দিচ্ছে। নরেন্দ্রনাথ ভীড় ঠেলে তাঁর টেবিলের কাছে গিয়ে বললেন—"মশাই, হরিদাস দেখছি মাইনেটা দিতে পারবে না; আপনি একটু অনুগ্রহ করে তাকে মাপ করে দিন। তাকে পাঠালে সে ভাল রকম পাস করবে; আর না পাঠালে সব মাটি হয়।" রাজকুমারবাবু তাঁকে ধমক দিয়ে বললেন—"তোকে জ্যাঠামি করে সুপারিশ করতে হবে না; তুই যা, নিজের চরকায় তেল দিগে যা! আমি ওকে মাইনে না দিলে পাঠাব না।" বলা বাহুল্য, এতে সবাই হতাশ হল। নরেন্দ্রনাথ কিন্তু তখনও বন্ধুদের বলছেন যে, ব্যবস্থা হবেই।

সেদিন বাড়ী না গিয়ে হেদোর ধারে এক গলিতে অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে হেদোর দিকে নজর রাখছেন নরেন্দ্রনাথ। তাঁর লক্ষ্য রাজকুমারবাবুর দিকে। এখানে এক গুলির আড্ডা আছে এবং প্রতি সন্ধ্যায় রাজকুমারবাবু এখানে নিয়মিত হাজিরা দেন। অন্ধকার বেশ ঘনিয়ে এসেছে, রাজকুমারবাবু চুপি চুপি গলির দিকে এগোচ্ছেন। হঠাৎ নরেন্দ্রনাথ যমদূতের মত পথ আগলে তাঁর সামনে দাঁড়ালেন। বৃদ্ধ একটু ঘাবড়ে গেলেও সহজভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, "কিরে দত্ত, এখানে কেন?"

নরেন্দ্র গম্ভীরভাবে বললেন—"কেন আর কি, আপনার জন্য দাঁড়িয়ে আছি। দেখুন মশাই, আমি বেশ জানি—হরিদাসের অবস্থা বড়ই খারাপ, সে টাকা দিতে পারবে না। তাকে কিন্তু পাঠাতেই হবে, নইলে ছাড়বো না। যদি আমার কথা না রাখেন ত আমিও ইস্কুলে আপনার কথা রটাবো; ইস্কুলে টেঁকা দায় করে তুলবো। এত ছেলের টাকা মাপ করলেন আর ও বেচারার কেন করবেন না?"

রাজকুমারবাবুর বেগতিক অবস্থা। তিনি আদরের ভঙ্গীতে নরেনের গলা জড়িয়ে ধরে বললেন, "বাবা, রাগ করিস কেন? তুই যা বলছিস তাই হবে। তুই যখন বলছিস, আমি কি তা না করতে পারি?" যা হোক, বন্ধু শেষ পর্যন্ত জানালেন যে, বেতন মকুব, তবে ফিজ্ দিতেই হবে—কিছু করার নেই।

পরের দিন ভোরে নরেন্দ্র হরিদাসের বাড়ীতে হাজির। দরজায় ঘা মেরে তিনি গান ধরেছেন:

অনুপম-মহিম পূর্ণব্রহ্ম কর ধ্যান,
নিরমল পবিত্র উষাকালে।
ভানু নব তাঁর সেই প্রেমমুখ-ছায়া,
দেখ ঐ উদয়গিরি শুভ্রভালে।
মধু-সমীরণ বহিছে শুভদিনে,
তাঁর গুণগান করি অমৃত ঢালে।
মিলিয়ে সবে যাই চল, ভগবত-নিকেতনে,
প্রেম-উপহার লয়ে হৃদয়-থালে।

এরপর বন্ধুর উদ্দেশ্যে বললেন, "ওরে খুব ফূর্তি কর, তোর কাজ ফতে হয়েছে, তোর মাইনের টাকাটা আর দিতে হবে না।—নরেন্দ্রনাথ ছিলেন এমনই এক যুবক।

স্বাভাবিকভাবেই মনে প্রশ্ন জাগে যে, ছাত্র হিসেবে তিনি কেমন ছিলেন? যে-ছাত্র এত হৈ-হট্টগোল ও বন্ধু-সংসর্গে আনন্দে মত্ত তাঁর পক্ষে পড়াশুনায় বেশী সময় দেওয়া যে সম্ভব নয়, তা সহজেই অনুমেয়। এ সত্ত্বেও পরীক্ষায় তিনি কোনদিনই খারাপ ফল করেননি। প্রবেশিকা পরীক্ষার আগে অসুস্থতার জন্য প্রায় দেড় বছর তিনি ক্লাস করতে পারেননি। বিশেষ অনুমতি নিয়ে তিনি স্কুলের উচ্চতর শ্রেণীতে ভর্তি হন এবং প্রবেশিকা পরীক্ষায় স্কুল থেকে তিনি একাই প্রথম শ্রেণীতে পাশ করেন। এ সময় রাত জেগে তিনি পরীক্ষার পড়া তৈরী করতেন। তাঁর নিজের কথায়—"প্রবেশিকা পরীক্ষার মাত্র দুই-তিন দিন আগে দেখি, জ্যামিতির কিছুই শিখা হয় নাই। তখন সারা রাত জেগে পড়তে লাগলাম এবং চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে জ্যামিতির চারখণ্ড বই শিখে ফেললাম।"

বি. এ. পরীক্ষার আগে বন্ধুদের হাত থেকে বাঁচবার জন্য তিনি মাতামহীর বার-বাড়ীতে তাঁর ঘরের কাছে এক চোর-কুঠরীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং তাঁর অপঠিত গ্রীণের লেখা ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসের মত বিরাট বই দু-দিনে আয়ত্ত করেন। বি. এ. পরীক্ষার প্রথম দিন তিনি এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসেন। অন্ধকার থাকতে উঠে চোরবাগানে সতীর্থ হরিদাস এবং দাশরথির (পরবর্তীকালে হাইকোর্টের বিখ্যাত উকীল দাশরথি সান্ন্যাল) বাড়ীতে হাজির হয়ে চীৎকার করে গান ধরলেন :

মহাসিংহাসনে বসি শুনিছ কি বিশ্বপতিঃ,
তোমারি রচিত ছন্দ মহান্ বিশ্বের গীত।
মর্ত্যের মৃত্তিকা হয়ে, ক্ষুদ্র এই কণ্ঠ লয়ে,
আমিও দুয়ারে তব হয়েছি হে উপনীত।
কিছু নাহি চাহি দেব, কেবল দর্শন মাগি,
তোমারে শুনাব গীত, এসেছি তাহারি লাগি ;
গাহে যথা রবিশশী, সেই সভামাঝে বসি,
একান্তে গাহিতে চাহে এই ভকতের চিত।

বন্ধুরা তাঁকে দেখে বিস্মিত। তাদের প্রশ্ন—"নরেন, এগজামিনের দিন ; কোথায় একটু আধটু খুঁতখাঁত যা আছে সেইটুকু সেরে নেবে, না তোমার দেখছি সবই বিপরীত, বেড়ে ফুর্তি করছ !"

নরেন বললেন, "হ্যাঁ তাই তো করছি, মাথাটা সাফ রাখছি। মগজটাকে একটু জিরেন দেওয়া চাই, নইলে এই দুঘণ্টা যা মাথায় ঢোকবে, ঢুকে আগেকার গুলোকে গুলিয়ে দেবে বই তো নয় ? এতদিন পড়ে পড়ে যা হোল না, তা কি আর দু'ঘণ্টায় হয় ? হয় না। এক্জামিনের দিন সকালবেলায় কেবল ফুর্তি, কেবল ফুর্তি করে শরীর-মনকে একটু শান্তি দিতে হয় ; ঘোড়াটা ছুটে এলে তাকে দলাই-মলাই করে তাজা করে নিতে হয়। মগজটাকেও তাই করতে হয়।"

সমকালীন যুবকদের মত ব্রাহ্ম সমাজের উচ্চ আদর্শের আকর্ষণে ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে নরেন্দ্রনাথ সেখানেও আসা-যাওয়া শুরু করেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর মধ্যে যোগীর লক্ষণ দেখে তাঁকে ধ্যানাভ্যাসের কথা বলেন। ব্রাহ্ম সমাজের অনুষ্ঠানে তিনি গান গাইতেন। কেশবচন্দ্র সেনের 'ব্যাণ্ড অব হোপ' বা 'আশার দল'-এর তিনি সদস্যও হয়েছিলেন এবং ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্রের

'নববিধান ব্রাহ্মসমাজে' ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালের লেখা 'নববৃন্দাবন' নাটকে কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে তিনি অভিনয়ও করেন।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আত্মজীবনী থেকে জানা যায় যে, আনন্দমোহন বসুর উদ্যোগে ছাত্রসমাজের মধ্যে জাগরণ আনার উদ্দেশ্যে কলকাতায় 'স্টুডেন্টস্ এ্যাসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠিত হলে নরেন্দ্রনাথ এই সমিতির সভ্য হন এবং সমিতির অধিবেশনে তিনি নিয়মিত উপস্থিত থাকতেন। (A Nation in Making, S. N. Banerjea, 1925, P. 35)।

ছাত্র নরেন্দ্রনাথের প্রতিভা বিস্মিত করেছিল কলেজের অধ্যক্ষ উইলিয়ম হেষ্টিকে। তিনি বলেন, "নরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রকৃতই একজন প্রতিভাসম্পন্ন বালক। আমি অনেক স্থানে ভ্রমণ করেছি, কিন্তু এমন একটি ছাত্র আর দেখিনি, এমনকি জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের ছাত্রদের মধ্যেও নয়। এ বালক নিশ্চয়ই জগতে একটা দাগ রেখে যাবে।"

নরেন্দ্রনাথের মেট্রোপোলিটন স্কুলের সহপাঠী সত্যহরি চট্টোপাধ্যায় বলেন যে, নরেন্দ্রনাথ "তর্কবিতর্ক খুব ভালবাসত। খুব সুকণ্ঠ, সুদর্শন, বলিষ্ঠ, লোকপ্রিয়" ছিল। (স্বামীজীর স্মৃতি সঞ্চয়ন, স্বামী নির্লেপানন্দ, ১৩৩৫, পৃঃ ১৪৪)।

নরেন্দ্রনাথের প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রথম বর্ষের সহপাঠী জ্যোতিপ্রসাদ সর্বাধিকারী বলেন—"গোলদীঘিতে খুব আড্ডা দেওয়া যেত, গান হত।" (ঐ, পৃঃ ১৪৪)।

'ডন সোসাইটি'-র প্রতিষ্ঠাতা মনীষী সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বলছেন যে, "কলেজ পাড়ায় তিনজনে মিলে (শশিভূষণ বসু, সতীশচন্দ্র, নরেন্দ্রনাথ) গোলদীঘিতে রাত্রি নয়টা দশটা পর্যন্ত গল্পগান চলত।" (ঐ, পৃঃ ১৩৫)।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব রেজিস্ট্রার জনৈক জ্ঞানবাবু বলেন—"শুধু পায়ে, কেবল একখানা চাদর গায়ে, চুরুট টানতে টানতে রাস্তায় নরেন্দ্রনাথকে যেতে দেখেছি। তাঁর সহপাঠী ৺ব্রজেন্দ্রমোহন গুপ্ত তাঁর বিশেষ বন্ধু, আমারও বন্ধু। অনেক কথা তার মুখে শুনেছি। পঠদ্দশাতেই Intellectual giant—বিদ্যার দিগ্‌গজ শুনেছি।" (ঐ, পৃঃ ১৩৯)।

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পৌত্র জেলা-জজ নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথা থেকে যুবক নরেন্দ্রনাথের কথা জানা যায়। তিনি

বলেন—"সতীশবাবু আমাদের ন'কাকা। নরেনবাবু তাঁর সহপাঠী। দুজনে গলাগলি-ভাব। বাবা ও কাকাবাবুদের দুটো বৈঠকখানাকে বলা হত অক্সফোর্ড আর কেমব্রিজ। বাবার (শ্রীশচন্দ্র) অসামান্য মেধা প্রতিভার জন্য কলকাতার বাছাবাছা এলেমদার ছাত্রদের জমায়েত এই জোড়া-ঘরে। আমরা তখন স্কুলের পড়ুয়া। নরেনবাবু এইসব গুণীদের মজলিশে সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান আলোচনায় উল্লেখযোগ্য মহড়া নিতেন। তিনি জ্ঞানগুণসাগর। তখন থেকেই সব ছোকরারা ওঁকে, সমবয়সী হলেও, চিহ্নিত সর্দারের মত সমীহ ও শ্রদ্ধা করত। সেটা তাঁর অপূর্ব তীক্ষ্ম ধীশক্তি আর বাগ্‌বিভূতির দরুণ। গলার গম্ভীর ভারি আওয়াজ। সে সময় দেখতে একহারা। চোখ দুটো চমৎকার। মুখ যেন মনস্বিতা দিয়ে মাজা। আরও বৈশিষ্ট্য, তাঁর মুখে হাসি দেখলে সবাই আমোদ-আহ্লাদ করার অধিকার পেতেন, কিন্তু মুখে গাম্ভীর্য-মেঘ দেখলে কার বাবার সাধ্য আছে এগোয়!

"কৈলেস খাবারওয়ালা নানা রকমারী খাবার, ঝুড়ি ভরে রোজ বাড়ীতে আনত। সব ছেলেরা মিলে পরমানন্দে জলপান করা হতো। নরেনবাবু ন'কাকার বন্ধু বিধায় ঠিক বাড়ীরই একজন ছেলের মত গণ্য হতেন। আমাদের সব কারুর দু'পয়সা বরাদ্দ, কারুর চার পয়সা, কারুর বা দু'আনা। যার যা স্কেল বাঁধা, মাথা খুঁড়লেও তার একরতি বেশী পাবার উপায় নেই। নরেনবাবু সিনিয়র গ্রেড, ন-কাকার 'র‍্যাংকের' বড়দের দল, যেদিন আসতেন, তাঁরও ওঁদের মত হার বাঁধা। জিভে-গজা ওঁর বড়ই প্রিয়। একদিনের কথা, ওঁর বখরায় যা পেলেন, তাতে সন্তুষ্ট নন। একখানা গজা হঠাৎ তুলে নিয়ে সখারের সামনে নিজের জিভে ঠেকালেন এবং অম্লানবদনে হাঁড়ির মধ্যে টপ্ করে ফেলে দিয়ে, হো হো করে হেসে বললেন—"ওরে তোরা কেউ গজা খাসনি—এই-য্যা—স-ব এঁটো হয়ে গেল।" হাঁড়িশুদ্ধ একাই মেরে দিলেন। কী আমোদই করতেন।

"আমাদের সঙ্গে ছোটদের দলেও ঘুড়ি ওড়াতেন। ছুটোছুটি, লুটোপুটি, গলদঘর্ম। আবার এক একদিন ঘুড়িটুড়ি সব টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দিতেন। কেউ কেউ কেঁদে ফেলত তাই দেখে।……নরেনবাবুকে আমরা ভয়ও করতাম। আবার যখন তিনি রগড় করতেন, হেসে হেসে পেটের নাড়ী ছেঁড়বার উপক্রম হতো। কাকা বলতেন, 'কলেজে অধ্যাপক লেকচার দিচ্ছেন,

নরেন তা-না শুনে, ভ্রুক্ষেপ না করে, এক একদিন গীতা উপনিষদ পাঠ করতেন।" (ঐ, পৃঃ ১১৭-১৯)।

' বিখ্যাত দার্শনিক আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল তখন জেনারেল এসেম্বলিজ কলেজের ছাত্র এবং নরেন্দ্রনাথের চেয়ে এক ক্লাস ওপরে পড়েন। তিনি লিখছেন —"বিবেকানন্দ নিঃসন্দেহে প্রতিভাবান্ যুবক, মুক্তস্বভাব, বেপরোয়া, মিশুক, সামাজিক সম্মেলনের প্রাণস্বরূপ এবং মধুকণ্ঠ গায়ক, অসাধারণ বাক্-নিপুণ, যদিও কথাগুলি অনেক সময়ই ব্যঙ্গপূর্ণ ও তিক্ত; পৃথিবীর ভণ্ডামি ও জুয়াচুরিকে তীক্ষ্ণধার সহাস্য বাক্যে অবিরত বিদ্ধ করেন, মনে হয় অবজ্ঞার উচ্চাসনে আসীন তিনি, কিন্তু সেটা ছদ্মবেশ, তার দ্বারা আবৃত করে রাখেন কোমলতর হৃদয়কে—সব জড়িয়ে একজন প্রেরণা-উদ্বুদ্ধ বোহেমিয়ান, অথচ বোহেমিয়ানরা যাতে বঞ্চিত সেই লৌহকঠিন প্রতিজ্ঞায় সমৃদ্ধ; ভঙ্গীতে অটল ও অভ্রান্ত, অধিকারের দার্ঢ্য নিয়ে কথা বলেন, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আছে চোখে এক অদ্ভুত শক্তি যা সম্মোহিত করে রাখে শ্রোতাদের।

"এ সমস্তই সকলের প্রত্যক্ষগোচর। কিন্তু খুব অল্পসংখ্যকই জানত তাঁর ভিতরের মানুষটিকে, তাঁর সংগ্রামকে—অস্থির ও বেপরোয়া অন্বেষার মধ্যে যে সত্তার ঝড়ঝঞ্ঝা অন্য রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করত।"

কি সেই সংগ্রাম—কিসেরই বা এত অন্বেষা? এ সংগ্রাম চিন্তাজগতের—এ সংগ্রাম বৌদ্ধিক সংগ্রাম। এ হল মানসিক অন্বেষা। চিন্তাশীল যে-কোন যুবক এ বয়সে এই সংকট ও অন্বেষার মুখোমুখী হন। নরেন্দ্রনাথ ছিলেন ন্যায় দর্শন ও ইতিহাসের নিষ্ঠাবান পাঠক। হোয়েটলি, জেভন্স, ডেকার্ট, মিল, হিউম, স্পেন্সার, ডারউইন, কান্ট, সোপেনহাওয়ার, কোঁৎ প্রভৃতি যুক্তিবাদী দার্শনিকদের চিন্তাধারা ও তাঁর চিরাচরিত সংস্কারের মধ্যে এক দ্বন্দ্ব বাধল। পাশ্চাত্য দার্শনিকদের চিন্তাধারা, তাঁর জন্মগত সংস্কার ও ধর্মবিশ্বাস এবং জগতের বিভিন্ন সমস্যা ও বৈষম্যগুলি তাঁর অন্তরে প্রবল ঝড় তুলল। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের রচনায় যুবক নরেন্দ্রনাথের এই মানসিক দ্বন্দ্বের চিত্র পাওয়া যায়। এই দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য নানা স্থানে ঘুরে শেষ পর্যন্ত তিনি দক্ষিণেশ্বরে যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পদপ্রান্তে হাজির হন।'

নরেন্দ্রনাথের সমবয়স্ক সাহিত্যিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথায় এই তরুণ যুবা নরেন্দ্রনাথের এক অনবদ্য চিত্র পাওয়া যায়। যুবক নরেন্দ্রনাথ

দক্ষিণেশ্বরে সহপাঠী বন্ধু হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীতে এসেছেন—সেখান থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ দর্শনে যাবেন। হরিদাসবাবু তাঁর বন্ধু কেদারনাথকে ডাকতে গেছেন কারণ কেদারনাথ "যেমন আমাদের দলের প্রধান বক্তা ও রহস্যপটু আনন্দদাতা, তিনিও (নরেন্দ্র) কলেজে আমাদের গল্পে ও কথায় রসমগ্ন করে রাখেন। তাঁর সঙ্গ সকলেই খোঁজেন। তাঁর মতো রসমধুর বক্তা বিরল।"

কেদারনাথ ও নরেন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয় বেশ রসাল কথা দিয়েই শুরু—কেউ কারো চেয়ে কম যান না। কেদারনাথ লিখছেন—"তিনি যেমন সুপুরুষ, তেমনি সুবক্তা। তাঁকে দেখলে ও তাঁর কথা শুনলে মুগ্ধ না হয়ে কেউ পারতেন না। পাছে কেউ ভুল বোঝেন তাই বলে রাখছি, তাঁর রহস্যমাখা ভাষা ছিল শোনবার জিনিস, কিন্তু বস্তু থাকত 'ভাবে'। এমন কথা কইতেন না, যাতে পাবার কিছু থাকত না। সবই সদর্থপূর্ণ ও দরকারি। শ্রোতা যদি নিকৃষ্ট সমঝদার হন, শুনে অবাক হয়ে ভাবতেন, বয়সের অনুপাতে এতটা জ্ঞান হয় কি করে? এ যে শাস্ত্রজ্ঞ বড় বড় পণ্ডিতদেরও চমকপ্রদ! তাঁর কাছে সে-সব কিন্তু হাসি রহস্যচ্ছলেই প্রকাশ পেত। এমন অদ্ভুত যুবা দেখিনি।"

নরেন্দ্রনাথ তখন যুক্তিবাদী ও সংশয়ী যুবক। তাঁর ইচ্ছেমত বিকেলে কেদারনাথসহ তিনি চললেন শ্রীরামকৃষ্ণ দর্শনে। কেদারনাথ লিখছেন—"নরেন্দ্রনাথ বললেন, 'না হয় ঠকাই যাবে। শুনেছি (পরমহংস) নিরক্ষর ব্রাহ্মণ, যিনি ইতিপূর্বে মা-কালীর পূজারী ছিলেন, এখন সহসা সিদ্ধপুরুষ; আমাদের দেশে যা সহজেই হওয়া যায়! তাঁকে দেখা হবে। আমাদের দেশে লোক পয়সা দিয়েও ভেলকি দেখে। শুনেছি এখানে পয়সাও লাগে না। নিরক্ষরের কাছে আমার শোনবার কিছু নেই—দেখবার থাকে তো দেখা যাবে হে!"

'সংশয়বাদী যুবক নরেন্দ্রনাথ ও সিদ্ধপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ হল। নরেন গান গাইলেন—ঠাকুর সমাধিস্থ হলেন। পরে বিদায়কালে "ঠাকুর তাঁকে বললেন, 'মাঝে-মাঝে এসো।' শুনে নরেন্দ্রনাথ বললেন, 'আমি পড়ছি, আমার কলেজ আছে।' তিনি বললেন, 'এও থাক না। ভাল কথা শুনতে ক্ষতি কি?' তাতে নরেন্দ্র বললেন, 'আপনি তো নিরক্ষর লোক। আপনি যা বলবেন, সে-সব আমার জানা আছে।'

"নরেন্দ্রনাথের কথা শুনে আমি শিউরে উঠেছিলুম, পালাই-পালাই করছিলুম। ঠাকুর হাসতে-হাসতেই বললেন, 'এতো খুব আনন্দের কথা। আমায় বেশী বকতে হবে না।'

কেদারনাথ লিখছেন—"ঠাকুরের কথা মনে রইল না, নরেন্দ্রনাথের কথাই ভাবতে-ভাবতে ফিরলুম। সমবয়সী হলেও এরূপ ছেলে পূর্বে দেখিনি—যেমন নির্ভীক, কথাবার্তাতেও তেমনি বহুদর্শী জ্ঞানীর মতো। এ ছেলে কারো মুখ চেয়ে কথা বলার নয়, লিডার হবার জন্যই জন্মেছে—কোনো মহাপুরুষের ধার ধারে না, ধারবে না। এ ধারণা সেই প্রথমদিনেই কে যেন আমাকে দিয়েছিল। দেখলুম, ঠাকুরও এঁকে চান। এ ছেলে কম্যাণ্ডার-ইন-চিফ্ হবার ছেলে—সোলজার নয়।"

কেবল এই নয়—পাঁচজন বাঙালী ছেলের মত নরেন্দ্রনাথ দত্ত একজন গ্রন্থকারও ছিলেন। শিক্ষিত বাঙালী যুবকমাত্রই বোধহয় সাহিত্য-যশপ্রার্থী। শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত বি. এ. ও শ্রীবৈষ্ণবচরণ বসাক "সঙ্গীত-কল্পতরু" নামে একটি সংগীত-সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করেন। গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে দীর্ঘ নব্বই পৃষ্ঠাব্যাপী ভূমিকায় সুর, তাল, বাদ্যযন্ত্র, বাজনা, বোল, স্বরসাধনা, কনসার্ট প্রভৃতি বহু বিষয়ের ওপর আলোচনা করা হয়েছে। স্বামী গম্ভীরানন্দজী নানা যুক্তিসহ প্রমাণ করেছেন যে, ঐ ভূমিকাটির রচয়িতা হলেন নরেন্দ্রনাথ।

দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্সারের সংগে তিনি পত্র-বিনিময়ও করেছিলেন। শোনা যায় যে, তিনি স্পেন্সারের কোন কোন সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে তাঁকে জানালে স্পেন্সার গ্রন্থের পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করতে সম্মত হয়ে নরেন্দ্রনাথকে প্রশংসাসূচক একটি চিঠি দেন। তিনি 'শিক্ষা' নাম দিয়ে স্পেন্সারের শিক্ষা-সম্বন্ধীয় গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেন এবং প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় তা প্রকাশ করেন।

ওপরের আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, নরেন্দ্রনাথ এক অসাধারণ প্রতিভাদীপ্ত বেপরোয়া যুবক।। শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী (পরবর্তীকালে স্বামী সারদানন্দ) নরেন্দ্রনাথের এক প্রতিবেশীর কাছ থেকে শুনেছিলেন, "এই বাটীতে একটা ছেলে আছে, তাহার মত ত্রিপণ্ড ছেলে কখন দেখিনি; বি. এ. পাস করেছে বলে যেন ধরাকে সরা দেখে। বাপ-খুড়োর সামনেই তবলায় চাটি দিয়ে গান ধরলে, পাড়ার বয়োজ্যেষ্ঠদের সামনে দিয়েই চুরুট খেতে খেতে চললো

—এইরূপ সকল বিষয়ে।" অচিরেই এই 'ত্রিপণ্ড ছেলে'-টির সংগে এক বন্ধুর বাড়ীতে শরৎচন্দ্রের সাক্ষাৎ হল—তখনো তাঁদের মধ্যে কোন পরিচয় নেই। তিনি শুনেছেন যে, বিয়ের পর বন্ধুটি (যিনি লেখক ও সম্পাদক) উচ্ছৃংখল হয়েছে এবং নানা অসদুপায়ে অর্থ রোজগার করছে। এ সম্পর্কে সত্যতা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে তাঁর বন্ধুগৃহে আগমন। বাইরের ঘরে তিনি বন্ধুর জন্য অপেক্ষা করছেন—"এমন সময়ে সহসা এক যুবক সেই ঘরে প্রবিষ্ট হইলেন এবং গৃহস্বামীর পরিচিতের ন্যায় নিঃসংকোচে নিকটস্থ একটি তাকিয়ায় অর্ধশায়িত হইয়া একটি হিন্দী গীতের একাংশ গুনগুন্ করিয়া গাহিতে লাগিলেন। যতদূর মনে আছে, গীতটি শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক, কারণ 'কানাই' ও 'বাঁশরী' এই দুইটি শব্দ স্পষ্ট মনে প্রবেশ করিয়াছিল। সৌখীন না হইলেও যুবকের পরিষ্কার পরিচ্ছদ, কেশের পরিপাট্য এবং উন্মনা দৃষ্টির সহিত 'কালার বাঁশরী'র গান ও আমাদিগের উচ্ছৃংখল বন্ধুর সহ ঘনিষ্ঠতার সংযোগ করিয়া লইয়া আমরা তাঁহাকে বিশেষ সুনজরে দেখিতে পারিলাম না। গৃহমধ্যে আমরা যে বসিয়া রহিয়াছি, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তাঁহাকে ঐরূপ নিঃসঙ্কোচ ব্যবহার এবং পরে তামাকু সেবন করিতে দেখিয়া আমরা ধারণা করিয়া লইলাম—আমাদের উচ্ছৃংখল বন্ধুর ইনি একজন বিশ্বস্ত অনুচর এবং এইরূপ লোকের সহিত মিশিয়াই তাঁহার অধঃপতন হইয়াছে।"

একটু পরে শরৎচন্দ্রের সেই বন্ধু ঘরে এলেন এবং দীর্ঘদিন দেখা-সাক্ষাৎ না হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের সংগে সামান্য দু-একটি কথা বলেই সেই অপরিচিত যুবকটির সংগে সাহিত্য আলোচনা শুরু করলেন। যুবকটি বলতে লাগল, সব রচনাই সাহিত্য নয়—ভাবপ্রকাশের সংগে সংগে সুরুচি ও উচ্চ আদর্শ থাকা চাই। নিজ বক্তব্যের সমর্থনে যুবকটি চসার ও অন্যান্য কয়েকজন ইংরেজ কবির উদ্ধৃতিও দিল। সে বলল, ভোগই জীবনের চরম আদর্শ নয়।

শরৎচন্দ্র মনে করলেন যে, যুবকের কথা ও কাজের মধ্যে সামঞ্জস্য নেই। এর কয়েকমাস পরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা মত নরেন্দ্রনাথের সংগে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে তিনি দেখলেন যে, সেই 'ত্রিপণ্ড যুবক'-ই নরেন্দ্রনাথ।

নরেন্দ্রনাথ ছিলেন এমনই এক দক্ষ চৌখস মননশীল সর্ববিদ্যাবিশারদ সর্বজনপ্রিয় ও নানা গুণসম্পন্ন যুবক। গান বাজনা নাটক আড্ডা খেলাধুলো রঙ্গরস পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা—সবকাজে সিদ্ধহস্ত। এর সংগে আছে আজন্মলালিত আধ্যাত্মিকতা। সমকালীন কলকাতার সব বিখ্যাত ব্যক্তিই তাঁর পরিচিত। ব্রাহ্ম সমাজের নেতৃবর্গ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, রাজনীতিক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আইনজ্ঞ উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শিক্ষাবিদ ও সমাজ-সংস্কারক বিদ্যাসাগর, চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিক মহেন্দ্রলাল সরকার, সমকালীন বিখ্যাত নট ও নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ—সকলের কাছেই তিনি সুপরিচিত। এত গুণবান ও চৌখস হওয়া সত্ত্বও তিনি সমকালীন সর্বপ্রকার চারিত্রিক ত্রুটি থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত ছিলেন।

মদ্যপান, পতিতালয়ে গমন ও উচ্ছৃংখল জীবন যাপন করা ছিল তৎকালীন যুবসমাজের কাছে অতি সাধারণ ব্যাপার—কেবল যুবসমাজ কেন ধনী ও প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের কাছে এগুলি ছিল মর্যাদাসূচক। "ধনী গৃহস্থগণ প্রকাশ্যভাবে বারবিলাসিনীগণের সহিত আমোদ প্রমোদ করিতে লজ্জা বোধ করিতেন না।……এমন কি বিদেশিনী ও যবনী কুলটাদিগের সহিত সংশ্লিষ্ট হওয়া দেশীয় সমাজে প্রাধান্য লাভের একটা উপায় স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল।" (রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, শিবনাথ শাস্ত্রী, ১৯৫৭, পৃঃ ৫৫-৫৬)। কলকাতায় তখন গাঁজা খাওয়া এত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল যে, শহরের নানা স্থানে গাঁজার কয়েকটি বড় বড় আড্ডা গড়ে ওঠে। (ঐ)। নব্য-যুবকদের মধ্যে মদ্যপান ছিল বাহাদুরীর অংগ। হিন্দু কলেজের ষোল সতের বৎসরের ছেলেরা মদ্যপান করাকে গর্বের বিষয় বলে মনে করত। কলেজের ছাত্ররা গোলদীঘির মধ্যে প্রকাশ্যে বসে মুসলমান দোকানদারের দোকান থেকে কাবাব মাংস কিনে এনে দশজনে মিলে মদের সংগে খেত। এ ব্যাপারে যে যত অসমসাহসিকতা দেখাতে পারত তার তত বাহাদুরি হত এবং সেই তত সংস্কারক বলে পরিগণিত হত! (ঐ, পৃঃ ১৫৭)।

নরেন্দ্রনাথের বন্ধুদের মধ্যে এমন কয়েকজন ছিল, যাদের চরিত্র ভাল ছিল না। তারা তাঁর চরিত্র নষ্ট করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। এ সময় একাধিকবার তাঁকে প্রলোভনের সম্মুখীন হতে হয়, কিন্তু দৃঢ়চরিত্র নরেন্দ্রনাথের তাতে

সামান্যতম ক্ষতিও হয়নি। ১৮৯৬ সালের ৬ই জুলাই লণ্ডন থেকে তিনি এক পত্রে লেখেন—"বিশ বছর বয়সের সময় আমি এমন গোঁড়া বা একঘেয়ে ছিলাম যে, কারও প্রতি সহানুভূতি দেখাতে পারতাম না—আমার ভাবের বিরুদ্ধ হলে কারও সঙ্গে বনিয়ে চলতে পারতাম না, কলকাতার যে ফুটপাথে থিয়েটার, সেই ফুটপাথের উপর দিয়ে চলতাম না পর্যন্ত।" (বাণী ও রচনা, ৭ম, পৃঃ ২৫৫)।

ধর্মের অন্বেষণে ইওরোপীয় বিদ্যায় সুশিক্ষিত সংশয়বাদী যুবক উপস্থিত হলেন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। তাঁর যুক্তিবাদী মন নিয়ে তিনি যুগাবতারের প্রতিটি কার্যকলাপ বিচার করেছেন, সমাধির মধ্যে অনুসন্ধান করেছেন ইন্দ্রজাল এবং সম্মোহনের। শুধু কি তাই? শ্রীরামকৃষ্ণ কাঞ্চন বা মুদ্রা স্পর্শ করেন না। শিষ্য যুগাবতারের বিছানার নীচে মুদ্রা লুকিয়ে রেখে তাঁকে পরীক্ষা করেছেন। গুরু এজন্য শিষ্যকে ধিক্কার দেননি—শিষ্যের সৎসাহসে তিনি আনন্দই পেয়েছিলেন।

একবার নয়—বার বার। তিনি বলতেন, "পোদ্দার যেমন টাকা পয়সা বাজিয়ে গুণে নেয়, তেমনি তুইও আমায় বাজিয়ে নিবি। যতক্ষণ না তুই পুরোপুরি নিঃসন্দেহ হচ্ছিস ততক্ষণ পর্যন্ত আমায় মেনে নিস না।" (রামকৃষ্ণ ও তাঁর শিষ্যগণ, ইশারউড, অনুবাদ: রবিশেখর সেনগুপ্ত, ১৩৮৮, পৃঃ ১৭৯)। গুরুকে বাজিয়ে নেওয়ার পর নরেন্দ্রনাথ তখন সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করেছেন কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাসংবরণের দু'দিন আগেও নরেন্দ্রনাথ তাঁর অবতারত্ব সম্পর্কে নিঃসংশয় নন। রোগ-যন্ত্রণায় কাতর গুরুর বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে তিনি চিন্তা করছেন, "আচ্ছা, তিনি তো অনেক সময় নিজেকে ভগবানের অবতার বলে পরিচয় দিয়েছেন; এখন, এই সময় যদি বলতে পারেন, 'আমি ভগবান', তবেই বিশ্বাস করি।" মনে এই চিন্তা ওঠার সংগে সংগে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে উঠলেন—"এখনও তোর জ্ঞান হল না? সত্যি সত্যি বলছি, যে রাম, সেই কৃষ্ণ, সেই ইদানীং এই শরীরে রামকৃষ্ণ—তবে তোর বেদান্তের দিক দিয়ে নয়।"

নরেন্দ্রনাথ আজীবন যুক্তিবাদী—সেই বাল্যকাল থেকেই। শৈশবে ব্রহ্মদৈত্যের অস্তিত্ব তিনি মেনে নিতে পারেননি,—মুসলমানের হুঁকো টেনে দেখেছেন জাত যায় কিনা—যৌবনে শ্রীরামকৃষ্ণকেও তিনি সহজে মেনে নেননি। গুরু রামকৃষ্ণ শিষ্যদের যুক্তিবাদী হবার উপদেশই দিয়েছেন। যোগেন্দ্রনাথ

রায়চৌধুরীকে (স্বামী যোগানন্দ) সানন্দে বলেছেন—"সাধুকে দিনে দেখবি রাতে দেখবি, তবে বিশ্বাস করবি।" আবার এমনও বলেছেন—"অযথা বিশ্বাস করে কখনও এমনভাবে ঠকবি না। ভক্ত হয়েছিস বলে কি তুই বোকা হবি!"[১]

[১] পিতৃ-বিয়োগের পর (১৮৮৪) জীবনের কঠিনতম সমস্যার মুখোমুখী হলেন নরেন্দ্রনাথ। দেখা গেল সারা পরিবার ঋণজালে জর্জরিত। সুদিনের পারিবারিক বন্ধুরা দূরে চলে গেলেন। নিকটতম আত্মীয়রা পরিবারটিকে বাস্তুচ্যুত করার জন্য আদালতে গেলেন। বাড়ীতে বিধবা মা ছাড়া নাবালক ভাই-বোনেরা আছে—তিনিই বয়োজ্যেষ্ঠ এবং বি. এ. পাশ। চাকরীর সন্ধানে বেরোলেন নরেন্দ্রনাথ। তাঁর নিজের কথায়—"মৃতাশৌচের অবসান হইবার পূর্ব হইতেই কর্মের চেষ্টায় ফিরিতে হইয়াছিল। অনাহারে নগ্নপদে চাকরির আবেদন হস্তে লইয়া মধ্যাহ্নের প্রখর রৌদ্রে আফিস হইতে আফিসান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতাম……কিন্তু সর্বত্রই বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিতে হইয়াছিল। সংসারের সহিত এই প্রথম পরিচয়েই বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম হইতেছিল, স্বার্থশূন্য সহানুভূতি এখানে অতীব বিরল—দুর্বলের, দরিদ্রের এখানে স্থান নাই। দেখিতাম, দুই দিন পূর্বে যাহারা আমাকে কোন বিষয়ে বিন্দুমাত্র সহায়তা করিবার অবসর পাইলে আপনাদিগকে ধন্য জ্ঞান করিয়াছে, সময় বুঝিয়া তাহারাই এখন আমাকে দেখিয়া মুখ বাঁকাইতেছে এবং ক্ষমতা থাকিলেও সাহায্য করিতে পশ্চাৎপদ হইতেছে। দেখিয়া শুনিয়া কখন কখন সংসারটা দানবের রচনা বলিয়া মনে হইত। মনে হয়, এই সময়ে একদিন রৌদ্রে ঘুরিতে ঘুরিতে পায়ের তলায় ফোস্কা হইয়াছিল এবং নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া গড়ের মাঠে মনুমেন্টের ছায়ায় বসিয়া পড়িয়াছিলাম।" (লীলা প্রসঙ্গ, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২৩৪)।

দারিদ্র্য সেদিন এমনই অবস্থায় পেঁছেছিল যে, "প্রাতঃকালে উঠিয়া গোপনে অনুসন্ধান করিয়া যেদিন বুঝিতাম গৃহে সকলের প্রচুর আহার্য নাই এবং হাতে পয়সা নাই, সেদিন মাতাকে 'আমার নিমন্ত্রণ আছে' বলিয়া বাহির হইতাম এবং কোন দিন সামান্য কিছু খাইয়া, কোন দিন অনশনে কাটাইয়া দিতাম। অভিমানে, ঘরে বাহিরে কাহারও নিকটে ঐ কথা প্রকাশ করিতেও পারিতাম না।" (ঐ, পৃঃ ২৩৫)।

এত কষ্টেও তিনি আজন্ম-লালিত ঈশ্বরে বিশ্বাস ত্যাগ করেননি। প্রতিদিন সকালে ঈশ্বরের নাম করে বিছানা ত্যাগ করে আশায় বুক বেঁধে চাকরীর সন্ধানে বের হতেন। একদিন সকালে শয্যাত্যাগের সময় ঈশ্বরের নাম করছেন, এমন সময় শুনলেন মায়ের ভর্ৎসনা—"চুপ কর্ ছোঁড়া, ছেলেবেলা থেকে কেবল ভগবান ভগবান—ভগবান তো সব করলেন!"

এ সময় তিনি মেট্রোপলিটন স্কুলের বৌবাজার শাখায় এক মাস প্রধান শিক্ষকের চাকরী করেন। সিটি কলেজিয়েট স্কুলে একটি শিক্ষক পদ শূন্য হলে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীকে চাকরীর জন্য বললে তিনি তা এড়িয়ে যান। অবশ্য এ সময় এটর্নীর অফিসে কাজ করে এবং কয়েকটি পুস্তকের অনুবাদ করে তিনি সামান্য কিছু উপার্জন করেছিলেন, কিন্তু স্থায়ী কিছুই মিলছিল না।

অবশেষে শ্রীরামকৃষ্ণ সহায় হলেন। তিনি জানিয়ে দিলেন যে, তাঁর পরিবারের "মোটা ভাত-কাপড়ের কখন অভাব হবে না।" (ঐ, পৃঃ ২৪৫)।'

কয়েক বছর পূর্বে প্রকাশিত এক ইংরাজী গ্রন্থে এবং একটি বাংলা গবেষণা পত্রিকায় জনৈক বঙ্গ-সন্তান মন্তব্য করেছেন যে, চাকরী না পেয়ে এবং জীবন-সংগ্রামে ব্যর্থ হয়ে নরেন্দ্রনাথ দত্ত সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। এ ধরনের মন্তব্য কেবলমাত্র মূর্খামিই নয়, চরমতম হঠকারিতার পরিচায়ক॥ স্বামীজীর ইংরাজী ও বাংলা জীবনীগুলি পাঠ করলেই দেখা যাবে যে, ধর্মীয় প্রবণতা ও সন্ন্যাসী হবার বাসনা তাঁর সহজাত ছিল।' এছাড়া, পিতৃ-বিয়োগের পূর্বে এবং পরেও তাঁর কাছে এমন সব বিবাহের প্রস্তাব এসেছিল যাতে অনায়াসেই তিনি সাংসারিক কৃচ্ছ্রতার হাত থেকে মুক্ত হয়ে বিলাসীর জীবনযাপন করতে পারতেন।

সাময়িকভাবে তাঁর চাকরী মেলে নি ঠিকই—কিন্তু এমন প্রতিভাবান যুবককে সত্যিই কি সেদিন রোধ করার ক্ষমতা কারো ছিল! 'সংসারে থাকলে রাজার মত প্রতিষ্ঠিত মানুষ হিসেবেই তিনি থাকতেন, কিন্তু তাঁর জন্য নির্দিষ্ট ছিল আরও মহত্তর কাজ—অভাব অন্নকষ্ট ও বেকারত্বের জ্বালা কেমন তাও জানার দরকার ছিল ভারতের প্রথম সোসালিস্ট' স্বামী বিবেকানন্দের। হয়তো এই কারণেই এমন প্রতিভাদীপ্ত চৌখস এবং বহুজন-পরিচিত যুবকটিকে চাকরীর জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হয়েছে। তা ছিল বিধি-নির্দিষ্ট।'

২

এক অভূতপূর্ব যুবা-সন্ন্যাসী

১৮৮৬ সালের ১৬ই আগস্ট—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ইহলীলা সংবরণ করলেন। তাঁকে কেন্দ্র করে সমবেত হয়েছিলেন কিছু ত্যাগী যুবক— যাঁদের অন্তঃসন্ন্যাস হয়ে গেছে কিন্তু বহিঃ-সন্ন্যাস হয়নি, এবং কিছু গৃহী ভক্ত। যুগাবতারের দুরারোগ্য ব্যাধি নিছক ছলনামাত্র। এই ব্যাধিকে উপলক্ষ্য করে তিনি তাঁর সন্তানদের সমবেত করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। লীলাবসানের দু'দিন পূর্বে যুবক নরেন্দ্রনাথকে তিনি বললেন—"দেখ নরেন তোর হাতে এদের সকলকে দিয়ে যাচ্ছি, কারণ তুই সবচেয়ে বুদ্ধিবান ও শক্তিশালী। এদের খুব ভালবেসে, যাতে আর ঘরে ফিরে না গিয়ে একস্থানে থেকে খুব সাধনভজনে মন দেয়, তার ব্যবস্থা করবি।"

দলনায়ক নরেন্দ্রনাথ যুগাবতারের অন্তিম ইচ্ছা রক্ষা করে গঠন করেছিলেন এক সন্ন্যাসী সংঘ। বরাহনগরে এক জীর্ণ ও জঙ্গলাকীর্ণ পরিত্যক্ত বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত হল প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ। ১৮৮৭ সালের জানুয়ারী মাসে বিরজা হোম করে তাঁরা সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন। প্রচণ্ড অভাব-অনটনের মধ্যেও উচ্চশিক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত বংশের সন্তান এই সব তরুণ সন্ন্যাসীরা মঠে থেকেই সাধন-ভজন করতেন। এ সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন যে, মঠে এক এক দিন এমন অভাব হয়েছে যে, খাবার কিছুই নেই। ভিক্ষে করে চাল আনা হয়েছে, কিন্তু নুন নেই। অনেকদিন শুধু নুন-ভাতই তাঁরা খেয়েছেন, তবু কারও ভ্রূক্ষেপ নেই। জপধ্যানের প্রবল তোড়ে সবাই ভেসে চলেছেন। কেবলমাত্র তেলাকুচো পাতা সেদ্ধ এবং নুন-ভাত খেয়েই তারা মাসের পর মাস কাটিয়েছেন। স্বামীজীর মতে সে কঠোরতা দেখলে ভূত পালিয়ে যায়। (বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৩৯)।

বিবেকানন্দ ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন যে, তরুণ সন্ন্যাসীদের আহারের কোন সংস্থান ছিল না এবং তাঁরা স্থির করেছিলেন যে, পরিচিত কোন ব্যক্তির কাছ থেকে তাঁরা কিছু নেবেন না। সুতরাং এই অবস্থায় সকলে মুষ্টিভিক্ষা করতে শুরু করলেন। ভিক্ষায় যে-চাল জুটত তা সেদ্ধ করা হত। তারপর একটুকরো কাপড়ের ওপর তা ঢেলে তার চারদিকে সকলে বসতেন এবং লবণ ও লঙ্কার ঝোল করে তা দিয়েই ভোজন পর্ব শেষ করতেন। একটি বাটিতে নুন-

লঙ্কার ঝোল থাকিত। সকলেই এক গ্রাস করে ভাত একবার মুখে নিতেন ও একবার ঝোল হাতে করে মুখে দিতেন। জল-খাওয়ার জন্য একটিমাত্র ঘটি ছিল। পোশাকের মধ্যে ছিল সকলের জন্য একটি করে কৌপীন ও একখণ্ড গৈরিক বহির্বাস। এছাড়া, দেওয়ালের গায়ে একটি সাদা কাপড় ও সাদা চাদর টাঙানো থাকত। কারো বাইরে যাওয়ার দরকার হলে তিনি তা ব্যবহার করতেন। মাসে একবার তাঁরা দাড়ি গোঁফ ও মস্তক মুণ্ডন করতেন। এত দারিদ্রের মধ্যেও তাঁদের সংগে ছিল বন্ধুদের দেওয়া প্রায় শ'খানেক ইংরেজী, সংস্কৃত ও বাংলা বই।

কেবলমাত্র সাধন-ভজন-ধ্যানই নয়—বরাহনগরের এই মঠ সেদিন প্রকৃতপক্ষে একটি শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। ত্যাগী তরুণ সন্ন্যাসীবৃন্দ চরম কৃচ্ছ্রতার মধ্যেও এখানে গীতা উপনিষদ তন্ত্র পুরাণ রামায়ণ মহাভারত সাংখ্য যোগ ন্যায় বৈশেষিক মীমাংসা বেদান্ত প্রভৃতি সম্পর্কে মননশীল আলাপ-আলোচনা করতেন। বৌদ্ধ জৈন বৈষ্ণব শৈব হীনযান মহাযান প্রভৃতি ধর্মমতের আলোচনাও বাদ যেত না। ভগবান যীশু খ্রীষ্টের কথা আলোচনা করতে গিয়ে সন্ন্যাসীরা সন্ত ফ্রান্সিস ও ইগ্নেসিয়াস লায়লা প্রভৃতি খ্রীষ্টীয় সন্ন্যাসীদের জীবন ও বাণীর সংগে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়েছিলেন। কাণ্ট হেগেল মিল স্পেন্সার—এমনকি নাস্তিক ও জড়বাদী মতবাদ এবং ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্পকলা প্রভৃতি বিষয়ে প্রচণ্ড বাদানুবাদ চলত। নরেন্দ্রনাথ ছিলেন এই আলোচনার মধ্যমণি। তিনি ওজস্বিনী ভাষায় ভারত ইতিহাস, ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের বীরত্বপূর্ণ কাহিনী, গিবনের রোম সাম্রাজ্যের পতনের ইতিহাস এবং কার্লাইলের ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস আলোচনা করতেন।

বস্তুতঃ শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর বরাহনগর মঠে বুদ্ধের করুণা, শঙ্করের মেধা এবং চৈতন্যের প্রেম—এই মহাত্রিবেণীর সমন্বয়ে নবভারত গঠনের চিন্তায় বিভোর ছিলেন তাঁর ত্যাগী সন্তানেরা। আত্মমুক্তি নয়—তাঁদের লক্ষ্য জগতের মুক্তি—"আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ"। নরেন্দ্রনাথকে বিশাল বটগাছের মত হতে হবে—তাঁর ছায়ায় আশ্রয় নেবে হাজার হাজার মানুষ। লোকালয় থেকে সরে গিয়ে সাধন-ভজন করলে চলবে না—সমস্যা-কণ্টকিত মানুষের মধ্যে বাস করে দুঃস্থ মানুষের মুক্তির সাধনা করতে হবে। ভারতবর্ষের বুকে এ এক অভূতপূর্ব আদর্শ। ইতিপূর্বে এই আদর্শে ভারতে কোন সন্ন্যাসী সম্ব

প্রতিষ্ঠিত হয়নি। শ্রীরামকৃষ্ণ এই সংঘের প্রাণপুরুষ—স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর কর্ণধার। এ সময় সতীর্থদের উদ্দেশ্যে তিনি বলতেন—"মানুষ গড়ে তোলাই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য হোক্! মনে রেখো, এই আমাদের একমাত্র সাধনা। বৃথা বিদ্যার গর্ব পরিত্যাগ কর। উৎকৃষ্টতম মতবাদ অথবা সুক্ষ্মবুদ্ধিসমন্বিত তর্কের আবশ্যক কি? ঈশ্বরানুভূতিই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, শ্রীরামকৃষ্ণ স্বীয় জীবনে এ আদর্শ দেখিয়ে গেছেন। আমরা তাঁর আদর্শজীবনই অনুসরণ করবো।" (বিবেকানন্দ চরিত, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ১৩৩৫, পৃঃ ৬৩-তে উদ্ধৃত)।

এরপর যুবা সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ বের হলেন ভারত-পরিক্রমায়। পদব্রজে পরিব্রাজক বেশে ভ্রমণ করলেন, আসমুদ্রহিমাচল সারা ভারত। এই ভারত ভ্রমণের মাধ্যমে পূর্ণতা পেয়েছিল তাঁর শিক্ষা—নিজের চোখে তিনি দেখেছিলেন দেশের দুঃখ-দুর্দশা-দারিদ্র্য-অশিক্ষা-কুশিক্ষা ও কুসংস্কারকে, চিনেছিলেন ক্ষমতা ও ঐশ্বর্যবান রাজন্যবর্গ থেকে দেশের দীনতম মানুষটিকে পর্যন্ত।

এ সময়েই আধুনিক শঙ্করাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের ধ্যাননেত্রে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে শতধা-বিচ্ছিন্ন ভারতভূমির এক অখণ্ড রূপ—অতীত ভারতের গৌরব-গাথা এবং সমকালীন ভারতের স্থবিরত্ব তাঁর মনে যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদের সৃষ্টি করে। তিনি উপলব্ধি করেন যে, ধর্ম নয়—অন্ন ও শিক্ষাই ভারতের এখন একমাত্র প্রয়োজন। ভ্রমণকালে বিভিন্ন মানুষ যেমন এই যুবা সন্ন্যাসীর পাণ্ডিত্য ও বাক্‌বিভূতিতে মুগ্ধ হয়েছিলেন, তেমনি স্বামী বিবেকানন্দও নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে যথার্থ 'মানুষে' রূপান্তরিত হয়েছিলেন। এসময় রাজপ্রসাদ থেকে দরিদ্রের কুটির—সর্বত্র বিচরণ করেছেন তিনি—অন্নগ্রহণ করেছেন ঘৃণ্য মেথরের, বাস করেছেন মুসলিম গৃহে, গান শুনেছেন ঘৃণ্য নর্তকীর কণ্ঠে। এভাবে দূর হয়েছে তাঁর মনের আজন্ম-লালিত সব সংস্কার। বলা বাহুল্য, তাঁর এই ভারত ভ্রমণ নিরবচ্ছিন্ন ছিল না—মাঝে মাঝে বরাহনগর মঠে ফিরে এসে তিনি আবার পরিব্রাজক-রূপে বেড়িয়ে পড়েন।

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে বারাণসীধামে কিছু বানর তাঁকে তাড়া করে। তিনি ভয়ে দৌড়োতে থাকলে এক বৃদ্ধ সাধু তাঁকে ডেকে বলেন—"থামো থামো। পালিও না—রুখে দাঁড়াও।" বলা বাহুল্য, স্বামীজী রুখে দাঁড়ালে বানরের দল পালিয়ে যায়। এ ঘটনার কথা স্মরণ করে পরবর্তীকালে স্বামীজী বলতেন

—"Face the brutes. Face nature. Face ignorance, illusion. Never fly"—পশুদের সম্মুখে রুখে দাঁড়াও। প্রকৃতি, অজ্ঞানতা ও মায়ার সম্মুখে রুখে দাঁড়াও। কখনও পালিও না।

কাশীতে বিখ্যাত মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সংগে তাঁর পরিচয় ও দীর্ঘ আলোচনা হয়। পঁচিশ বছর বয়সী এই সন্ন্যাসীর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে ভূদেবচন্দ্র মন্তব্য করেন—"আশ্চর্য বটে! এই অল্প বয়সেই এত অভিজ্ঞতা ও সূক্ষ্মদৃষ্টি! আমি বলতে পারি, ইনি ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি হবেন।"

এখানে ভারত-বিখ্যাত বিদ্বান সন্ন্যাসী স্বামী ভাস্করানন্দজীর সংগে সন্ন্যাস-জীবনের আদর্শ সম্পর্কে আলোচনাকালে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের কথা ওঠে। প্রসঙ্গক্রমে ভারত-বিশ্রুত এই সন্ন্যাসী বলেন যে, সম্পূর্ণভাবে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। স্বামী বিবেকানন্দ তখন নিজ গুরুর কথা উল্লেখ করলে, ভাস্করানন্দ হেসে বলেন যে, "তুমি বালক মাত্র, এ বয়সে ওসব বুঝবে না।" ক্রমে গুরুর চরিত্র সম্পর্কে সমালোচনা শুরু হলে স্বামীজী তীব্র প্রতিবাদ জানান এবং স্থানত্যাগ করেন। তৎকালে স্বামী ভাস্করানন্দজীর মত সন্ন্যাসীর বিরুদ্ধে কারো প্রতিবাদ করার সাহস ছিল না—বহু রাজা ধনী ও পণ্ডিত ব্যক্তি তাঁর কৃপাপ্রার্থী ছিলেন। বলা বাহুল্য, ভাস্করানন্দজী স্বামী বিবেকানন্দের সাহস ও যুক্তিপূর্ণ কথায় মুগ্ধ হয়ে মন্তব্য করেন—"এঁর কণ্ঠে সরস্বতী আরূঢ় হয়েছেন। এঁর হৃদয়ে জ্ঞানালোক প্রদীপ্ত হয়েছে।"

কাশী থেকে বরাহনগরে ফিরে, কিছুকাল পরে আবার তিনি ভ্রমণে বের হন। অযোধ্যায় শ্রীরামচন্দ্র, লক্ষ্ণৌ-এ নবাববংশ এবং আগ্রায় মোগল বাদশাহদের স্মৃতিবিজড়িত নানা স্থান এবং অপরূপ শিল্প-ভাস্কর্য দেখে তিনি মুগ্ধ ও আনন্দিত হন। তাজমহলের অপরূপ সৌন্দর্যরাশি তাঁকে বিস্মিত করে। ভারতের অপূর্ব গৌরব-স্মৃতিতে তিনি গৌরবান্বিত হন। হরিদ্বার যাওয়ার পথে হাতরাস নামক স্টেশনে স্টেশন-মাস্টার শরৎচন্দ্র গুপ্ত তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সেখানে তাঁর আগমনে স্থানীয় মহলে বেশ আলোড়ন দেখা দেয়। সমাগত ব্যক্তিবর্গের কাছে তিনি ধর্ম ও স্বদেশ-সংক্রান্ত আলোচনা করতেন। প্রয়াগ ও গাজীপুরেও তাঁকে স্থানীয় ব্যক্তিদের সংগে আলোচনা নিরত দেখা যায়।

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে বরাহনগর থেকে স্বামীজী হিমালয়-ভ্রমণে বের হয়ে প্রথমে ভাগলপুরে আসেন। ভাগলপুরে মন্মথনাথ চৌধুরীর গৃহে তিনি কিছুদিন ছিলেন। মন্মথনাথ চৌধুরীর স্মৃতিকথা থেকে জানা যায় যে, স্বামীজী ইংরেজী ও সংস্কৃত ভাষা এবং যোগ ও সংগীতে সমভাবে প্রবল দক্ষ ছিলেন। ভাগলপুরের মথুরানাথ সিংহ বলেন যে—"তাঁর সংগে আমার অনেক বিষয়ে—যথা সাহিত্য, দর্শন ও ধর্ম,—বিশেষতঃ শেষোক্ত দুই বিষয়ে—অনেক চর্চা হয়। আমার মনে হয়েছিল, বিদ্যা ও দর্শন যেন তাঁর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে মিশে আছে। আমি বুঝতে পারলাম, তাঁর উপদেশের মূল কথা ছিল এক সুগভীর স্বার্থলেশশূন্য দেশপ্রেম, এবং তারই মিশ্রণে তিনি নিজ বক্তব্যগুলি জীবন্ত করে তুলতেন। এটা ছিল তাঁর চরিত্রের একটা শাশ্বত রূপ। আমি যখন চিকাগো ধর্মমহাসভায় তাঁর সাফল্যের সংবাদ পাঠ করলাম, তখন মনে হল, এতদিনে ভারত তাঁর প্রকৃত নেতাকে পেয়েছে।" এসময় বারাণসীতে প্রমদাদাস মিত্রকে তিনি বলেছিলেন—"আবার যখন এখানে ফিরব, তখন আমি সমাজের ওপর একটা বোমার মতো ফেটে পড়ব, আর সমাজ আমাকে কুকুরের মত অনুসরণ করবে।"

সেখান থেকে তিনি অযোধ্যা, নৈনীতাল, আলমোড়া, শ্রীনগর, দেরাদুন হৃষীকেশ প্রভৃতি স্থান হয়ে মীরাটে আসেন। মীরাটের স্থানীয় এক পাঠাগার থেকে স্বামী অখণ্ডানন্দ তাঁর জন্য প্রতিদিন স্যার জন লাবকের গ্রন্থাবলীর এক একটি করে খণ্ড আনতেন এবং পরদিন তা ফেরত দিতেন। গ্রন্থাগারিক মনে করতেন যে, বই না পড়ে এ সব লোক-দেখানো পড়ার ভান করা হচ্ছে। স্বামীজী তা জানতে পেরে একদিন সেই পাঠাগারে হাজির হন এবং গ্রন্থাগারিককে বলেন যে, সন্দেহ হলে তিনি বই থেকে যে-কোন প্রশ্ন করে দেখতে পারেন। বলা বাহুল্য, গ্রন্থাগারিক তাঁর সকল প্রশ্নের উত্তর পেয়ে বিস্মিত হন। 'এ সম্পর্কে স্বামী অখণ্ডানন্দকে স্বামীজী বলেন যে, তিনি বইয়ের প্রতিটি শব্দ আলাদা আলাদা করে পড়েন না। গোটা একটা বাক্য—এমনকি একটা গোটা প্যারা তিনি এক নজরে পড়েন।'

গুরু-ভাইরা মীরাটে তাঁর সঙ্গে ছিলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ মীরাটের দিনগুলি সম্পর্কে বলছেন যে, স্বামীজী এসময় তাঁদের জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত সব শিক্ষা দিতেন। একদিকে বেদান্ত, উপনিষদ, সংস্কৃত নাটকাদি পাঠ ও ব্যাখ্যা করতেন, আবার অন্যদিকে রান্নাও শেখাতেন।"

মীরাট থেকে স্বামীজী দিল্লী এবং তারপর রাজপুতনার আলোয়ারে যান। আলোয়ারেই তিনি সর্বপ্রথম যথার্থ আচার্যরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁর আকর্ষণে সমাজের নানা স্তরের নানা ধর্মের বিভিন্ন বয়সের মানুষ দিনের পর দিন স্বামীজীর কাছে এসে তাঁর উপদেশ শ্রবণ করতেন। এখানে স্বামীজীর চারপাশে একদল যুবক সমবেত হয়েছিল। তাদের তিনি বলেন—"আমি তোমাদের জন্য জীবনপাত করতেও রাজী আছি, কেননা তোমরা আমার উপদেশ পালন করতে চাও এবং করারও সামর্থ্য আছে।......সত্য লাভের জন্য চাই পুরুষকার। যে খাটতে পারে না, তার ওপর ভগবানের দয়া হবে কেমন করে? যার পুরুষকার নেই সে তো তমসাচ্ছন্ন। অর্জুন নিজের পুরুষকার বিসর্জন দিতে যাচ্ছিলেন বলেই তো ভগবান তাঁকে স্বধর্মপালনের আদেশ দিয়েছিলেন, যাতে করে তিনি নিষ্কামভাবে স্বীয় কর্তব্য পালনের দ্বারা সত্ত্বগুণ, চিত্তশুদ্ধি, কর্মত্যাগ ও আত্মসমর্পণের যোগ্য হতে পারেন। শক্তিমান হও, বীর্য অবলম্বন কর। মানুষ যদি বীর্যবান ও শক্তিমান হয়, তবে সে দুষ্কর্ম করলেও আমি তাকে শ্রদ্ধা করি, কেননা তার সাহস ও বীরত্বই একদিন তাকে কুপথত্যাগের প্রেরণা দেবে; এবং সে স্বার্থসিদ্ধির জন্য আর কখনও কর্ম করবে না এবং এইভাবে ক্রমে সত্যলাভে সক্ষম হবে।"

এখানে সর্বদাই যুবকদের তিনি চরিত্রগঠন, দেশের মঙ্গলচিন্তা, সমাজসেবা, সংস্কৃত শিক্ষা, দেশের ইতিহাসচর্চা এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে নানা উপদেশ দিতেন। যুবক গোবিন্দ সহায়কে এক পত্রে তিনি লেখেন—"তোমরা আলোয়ারবাসী যে কয়জন যুবক আছ, তোমরা সকলেই চমৎকার লোক, এবং আশা করি যে, অচিরেই তোমাদের অনেকেই সমাজের অলঙ্কারস্বরূপ এবং জন্মভূমির কল্যাণের হেতুভূত হইয়া উঠিবে। পবিত্র এবং নিস্বার্থ হইতে চেষ্টা করিও, উহাতেই সমগ্র ধর্ম নিহিত।"

স্বামীজী সেদিন সত্যিই সংস্কারমুক্ত এক প্রকৃত সন্ন্যাসী—সর্বভূতে তিনি সমদর্শন করছেন—দেশ ও দশের মঙ্গলচিন্তায় তাঁর অন্তর পূর্ণ। এই ভ্রমণই তাঁকে প্রকৃত মনুষ্যত্বে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। এ সময় নানা স্থানে নানা পণ্ডিতের কাছে তিনি শাস্ত্রের পাঠ নিয়েছেন, আবার বহু সাধারণ মানুষের কাছ থেকেও তিনি শিখেছেন অনেক কিছু। একদা বৃন্দাবনের পথে ক্ষুধা ও পিপাসায় শ্রান্ত-ক্লান্ত তিনি। পথে দেখলেন একটি মানুষ তামাক খাচ্ছে। শ্রান্তি

নিবারণের জন্য তাঁর তামাক খাওয়ার ইচ্ছে হল। লোকটির কাছে গিয়ে তার ছিলিমে দুটো টান দেবার ইচ্ছা জানালে লোকটি সসঙ্কোচে পেছিয়ে গিয়ে বলল —"মহারাজ, আপনি সাধু, আর আমি ভংগী (মেথর)।" সংস্কারের বশে স্বামীজী তামাক না খেয়েই এগিয়ে চললেন। কিছু দূর এসে তাঁর মনে পড়ল তিনি সন্ন্যাসী—জাতিভেদ ও অন্যান্য সব সংস্কার তিনি ত্যাগ করেছেন। সুতরাং তিনি ফিরে এলেন। লোকটির কাছে আবার সেই এক অনুরোধ করলেন। তার কোন আপত্তিই তিনি শুনলেন না এবং তামাক খেলেন। এই ঘটনা শুনে নট সম্রাট গিরিশচন্দ্র ঘোষ স্বামীজীকে বলেছিলেন—"তুমি গাঁজাখোর, তাই নেশার ঝোঁকে মেথরের কলকে টেনেছিলে।" স্বামীজী এর উত্তরে বলেছিলেন—"না, জি. সি. সত্যই আমার নিজেকে পরীক্ষা করে দেখার ইচ্ছে হয়েছিল। সন্ন্যাস নিয়ে পূর্বসংস্কার দূর হয়েছে কিনা, জাতিবর্ণের পারে চলে গেছি কিনা, পরীক্ষা করে দেখতে হয়।"

এই কারণেই ক্ষুধায় কাতর হয়ে বিহারে আস্তাবলের সহিসের দেওয়া চাটনী তিনি অনায়াসে খেতে পারেন, আলোয়ারে মৌলবীর গৃহে আহার করেন এবং স্টেশনে দরিদ্র চামারের তৈরী রুটি ভক্ষণ করেন পরম তৃপ্তির সংগে। ঘৃণ্যা নর্তকীর কণ্ঠে গান শুনে সর্বভূতে ব্রহ্মসত্তা উপলব্ধি করে নর্তকীর কাছে মার্জনা চেয়ে তিনি বলেন—মা আমি অপরাধ করেছি, আপনাকে ঘৃণা করে উঠে যাচ্ছিলাম। আপনার গানে আমার চৈতন্য হল।

দরিদ্রের কুটির থেকে রাজপ্রাসাদ—সর্বত্র অবাধে বিচরণ করেছেন স্বামীজী, কিন্তু কারো কাছে মাথা নত করেননি—বরং সর্বশক্তিমান্ রাজন্যবর্গ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন। আলোয়ার-রাজ তাঁর সঙ্গে কথা বলে মুগ্ধ হন এবং মন্তব্য করেন, "এরূপ মহাত্মা আমি আর কখনও দেখিনি।" খেতুড়ীরাজ অজিত সিং তাঁর কাছে মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করেন। জুনাগড়, ভুজ, বরোদা, ভবনগর, কোলাপুর, মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর, রামনাদ, হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি স্থানের রাজন্যবর্গের সংগেও তাঁর যোগাযোগ ঘটে এবং তিনি তাঁদের সংগে ধর্ম আলোচনার সংগে সংগে কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান, শিক্ষা, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়েও আলোচনা করতেন। বলা বাহুল্য, ব্যক্তিগত কোন প্রয়োজনে নয়—রাজন্যবর্গ যাতে দরিদ্র দেশবাসীর মঙ্গলসাধনে ব্রতী হন সেই প্রয়াসেই স্বামীজী তাঁদের সংগে মেলামেশা করতেন। এ সম্পর্কে তিনি নিজেই বলছেন যে, গরীব প্রজার

ইচ্ছা থাকলেও সৎকার্য করার ক্ষমতা তার নেই, কিন্তু রাজার হাতে হাজার হাজার প্রজার মঙ্গলবিধানের ক্ষমতা বহু আগে থেকেই আছে, কেবল তা করার ইচ্ছে তাঁদের নেই। সেই ইচ্ছে যদি কোনভাবে তাঁর মধ্যে একবার জাগিয়ে দেওয়া যায় তাহলে তাঁর অধীনস্থ প্রজাদের অবস্থার উন্নতি হবে এবং জগতেরও অনেক বেশী কল্যাণ হবে।'

পরিব্রাজক-রূপে যেখানেই তিনি গেছেন, সেখানেই তাঁর গুণাবলীতে মুগ্ধ হয়েছে স্থানীয় জনসাধারণ ও বিদ্বৎ-সমাজ। বস্তুতঃ সর্ববিষয় ও সর্ববিদ্যাতে পারঙ্গম এবং আধুনিক ভাবধারা-সমন্বিত এমন প্রগতিশীল সন্ন্যাসী ইতিপূর্বে ভারতবর্ষে পরিলক্ষিত হয়নি। আসমুদ্রহিমাচল ভ্রমণ করে স্বামীজী প্রকৃত ভারতবর্ষকে চিনলেন, নিজ চোখে দেখলেন দেশবাসীর হৃতসর্বস্ব রূপ, বুঝলেন ইংরেজ শাসনের ছত্রছায়ায় দেশ কিভাবে তমোগুণে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। তিনি লিখছেন—"এই সব দেখে—বিশেষ দারিদ্র্য আর অজ্ঞতা দেখে আমার ঘুম হয় না।.....এই যে আমরা এতজন সন্ন্যাসী আছি, ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, লোককে দর্শন-শিক্ষা দিচ্ছি, এসব পাগলামি। 'খালি পেটে ধর্ম হয় না'—গুরুদেব বলতেন না? ঐ যে গরীবগুলো পশুর মতো জীবনযাপন করছে, তার কারণ মূর্খতা; পাজী (পুরোহিত) বেটারা চার যুগ ওদের রক্ত চুষে খেয়েছে, আর দুই পা দিয়ে দলেছে।.....আমাদের জাতটা নিজের বিশেষত্ব হারিয়ে ফেলেছে, সেইজন্য ভারতের দুঃখকষ্ট। সেই জাতীয় বিশেষত্বের বিকাশ যাতে হয়, তাই করতে হবে—নীচ জাতিকে তুলবে। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান—সকলেই তাদের পায়ে দলেছে।" (৬।৪১২-১৩)

সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের সেদিন একমাত্র চিন্তা দেশের মুক্তি—যুগ যুগ সঞ্চিত কুসংস্কার, অশিক্ষা, কুশিক্ষা, দারিদ্র্য এবং সর্বোপরি স্বৈরাচারী ইংরেজ শাসনের নিগড় থেকে দেশের মুক্তি।। স্বামীজীর পশ্চিম ভারত ভ্রমণকালে বনবিভাগের জনৈক পদস্থ কর্মচারী হরিদাস মিত্র তাঁর মধ্যে দেখেছিলেন বাল্যবিবাহের চরম বিরোধী, আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সকল শাখায় সুপণ্ডিত এক দেশপ্রেমিক সন্ন্যাসীকে, যিনি গীতা এবং কার্লাইল ও জুলস্ ভার্ণের রচনাদি সম্পর্কে সমান আগ্রহী। সত্যই অভূতপূর্ব এই সন্ন্যাসী! পান-সুপুরি, দোক্তা—এমন কি চুরুটের প্রতিও অদ্ভুত আকর্ষণ। গুণগ্রাহী শিষ্য তাঁকে কিছু দিতে চান—স্বামীজীর যা ইচ্ছে তাই-ই দেবেন। স্বামীজী সন্ন্যাসী—কিছু নেবেন

না। শিষ্যের বারংবার অনুরোধে তিনি হাসিমুখে চাইলেন বাজারের উৎকৃষ্টতম চুরুট এল। বিদায়ের সময় হাসিমুখে সেই চুরুট টানতে টানতে তিনি গাড়ীতে উঠলেন। সত্যিই অদ্ভুত!

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে স্বামীজী মাদ্রাজ শহরে আসেন। এখানে তিনি মাদ্রাজের তৎকালীন ডেপুটি অ্যাকাউনট্যান্ট-জেনারেল মন্মথনাথ ভট্টাচার্যের বাড়ীতে ওঠেন। স্বামীজীর জীবন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনে মাদ্রাজ এক গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অধিকারী। মাদ্রাজেই তিনি প্রথম তাঁর অনুগামী একদল নিষ্ঠাবান যুবক পেয়েছিলেন. মাদ্র জের যুবকরাই প্রথম তাঁর আদর্শকে বাস্তবায়িত করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছিল এবং এই মাদ্রাজে কেবলমাত্র একজন প্রতিভাবান সন্ন্যাসী হিসেবেই নয়—জাতীয় জাগরণের মহানায়ক হিসেবে তিনি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেন।

মাদ্রাজে পদার্পণের প্রথম দিনেই একদল উচ্চশিক্ষিত যুবক তাঁর কাছে সমবেত হয় এবং কালক্রমে তারা স্বামীজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। প্রথম দিন থেকেই শহরের বহু গণ্য-মান্য ব্যক্তি, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও অধ্যাপকেরা তাঁর কাছে আসতে থাকেন এবং তিনি তাঁদের কাছে ধর্ম সাহিত্য বিজ্ঞান মনস্তত্ত্ব বিজ্ঞান ইতিহাস শিল্পকলা সংগীত সমাজনীতি রাজনীতি প্রভৃতি সর্ব বিষয়েই আলোচনা করতেন। মাদ্রাজের ট্রিপলিকেন লিটারারি সোসাইটিতেও তিনি বক্তৃতা দেন এবং এই বক্তৃতাই মাদ্রাজের সর্বসাধারণের কাছে তাঁকে পরিচিত করে তোলে। বলা বাহুল্য, মাদ্রাজে—বিশেষতঃ এই নগরীর তরুণদের ওপর তাঁর প্রভাব ছিল ব্যাপক। সমসাময়িক কয়েকজন তরুণের স্মৃতিচারণা থেকে এই সর্বাত্মক প্রভাবের স্বরূপ নির্ণয় করা যাবে। বিবেকানন্দ-অনুরাগী স্যার আল্লাদী কৃষ্ণস্বামী আয়ার লেখেন—"স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা যাবার আগে যখন মাদ্রাজে আসেন, তখন তিনি একজন অপরিচিত সন্ন্যাসী। অল্পসময় এখানে থেকে তিনি তরুণদের সংগে এমন উচ্চাঙ্গের আলোচনা করেন যে, তারা শহরের সব জায়গা থেকে তাঁর কাছে এসে সমবেত হয়। বিরাট মৌলিকতার অধিকারী বলে তাঁর প্রতিভাকে স্বীকার করে নেন স্যার সুব্রহ্মণ্য আয়ার ও অন্যান্যরা।"

তৎকালীন যুবক পি. আনন্দ চালু বলছেন—"প্রথম যখন তিনি মাদ্রাজে আসেন তখনই তাঁকে দেখি। তিনি আমাকে জানতেন না। আমি এতই ক্ষুদ্র

যে আমাকে জানা সম্ভব ছিল না। এক সন্ধ্যায় তাঁর সম্মানে একটি পার্টির আয়োজন হল। মাদ্রাজের চিন্তাজগতের সকল জ্যোতিষ্কই হাজির সেখানে —তার ঠিক উল্টোজগতের অধিবাসী আমি—আমিও হাজির। তাঁদের অনেকেই স্বামীজীর বুদ্ধির বিদ্যুৎঝলক দর্শন করেছেন। এক কোণে পণ্ডিতদের মধ্যে একটা ক্ষুদ্র চক্রান্তের আয়োজন হয়ে গেল—স্বামীজী যা বলছেন, তার বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাতে হবে। স্বামীজী প্রবল সাহসে, প্রায় চ্যালেঞ্জের স্বরে নিজেকে অদ্বৈতবাদী বলে ঘোষণা করলেন। ঘোঁটের মধ্য থেকে প্রশ্ন হল: 'আপনি বলছেন, আপনি ঈশ্বরের সংগে এক। তাহলে তো আপনার দায়িত্ব বলে কিছু রইল না। যখন আপনি কোন পাপ করবেন, কি ন্যায়পথ থেকে ভ্রষ্ট হবেন, তখন আপনাকে বাধা দেবার উপায় তো রইল না?' তৎক্ষণাৎ সে দিকে ফিরে স্বামীজী বিধ্বংসী উত্তরটি দিলেন, 'যদি সত্যই বিশ্বাস করি, আমি ঈশ্বরের সঙ্গে এক, তাহলে পাপের পথে যাবো কি করে? এক্ষেত্রে বাধার প্রশ্নই ওঠে না।' সবাই চুপ। তখনি তাঁকে আমি চিনলুম।"

সি রামানুজচারিয়ার বলেন "স্বামীজীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ ১৮৯৩ ফেব্রুয়ারিতে, যখন তিনি পরিব্রাজকবেশে মাদ্রাজে আসেন।......আমরা তখন ছাত্র; শুনেছিলাম, উত্তর-ভারত থেকে সচ্চিদানন্দ নামে এক সন্ন্যাসী এসেছেন, অদ্ভুত বুদ্ধিমান, যাঁর চমকপ্রদ ব্যক্তিত্ব। আমরা শুনেছিলাম, মাদ্রাজের অনেক তরুণ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। তাঁদের মধ্যে আছেন এম. সি. আলাসিঙ্গা পেরুমল (পচ্চাইপ্পা কলেজের), জি ভেঙ্কটরঙ্গরাও ডি. আর. বালাজী রাও (পরে ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্কের), জি. জি. নরসিমাচারি ইত্যাদি। সেই সঙ্গে ট্রিপলিকেন লিটারারি সোসাইটি নামক একটি তাজা প্রতিষ্ঠানের কয়েকজন তরুণও দেখা করেছেন। এই প্রতিষ্ঠানটি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে এসে বক্তৃতা করাতে খুব উৎসাহী।......প্রথমে স্বামীজী ট্রিপলিকেন লিটারারি সোসাইটির এক ক্ষুদ্র সম্মেলনে ভাষণ দেন। কিন্তু তাতেই দারুণ একজন বক্তারূপে তিনি এমন দাগ কাটেন যে, নবীন দল তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। প্রবীণেরাও অবিলম্বে বুঝে গেলেন—এই অসাধারণ ব্যক্তির অভ্যন্তরে সঞ্চিত হয়ে আছে প্রকাণ্ড মনীষা, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, ঐকান্তিক দেশপ্রেমের অগ্নি, উজ্জ্বল সহাস্য বাক্‌বৈদগ্ধ্য এবং সর্বোপরি অপরাজেয় ত্যাগশক্তি। মাদ্রাজ শীঘ্রই জানতে পারল—তাদের উত্তোলিত করবার শক্তি নিয়ে এসেছেন একজন মানুষ—আর এ ওকে ডিঙিয়ে

ছুটতে লাগল—তাঁর দর্শন পাবার জন্য। এক প্রভাতে, যখন তিনি পনর-বিশটি তরুণকে পিছনে নিয়ে, ময়লাপুরের লুজ চার্চ রোড ধরে পশ্চিম দিকে রাজকীয়ভাবে হেঁটে চলছিলেন দণ্ড হাতে, স্যার সুব্রহ্মণ্য আয়ারের বাড়ির দিকে······তখনই আমি তাঁকে প্রথম দেখেছিলুম, এবং সেবারকার মত শেষ দেখা। রাস্তার শেষ পর্যন্ত তাঁর অনুগমন করেছিলুম। কিন্তু পথিমধ্যে ক্রমে বিরাট জনতা সংগে এসে জুটে গেল, মূল দলের সংগে যাদের (আমিও তার মধ্যে ছিলাম) স্যার সুব্রহ্মণ্য আয়ারের বাড়িতে ঢুকতে দেওয়া হয় নি।'

মাদ্রাজে স্বামীজীর 'জনৈক শিষ্য' তাঁকে দেখেছিলেন 'মহাজ্ঞানী ঋষি', নবযুগের প্রফেট, কবি, দার্শনিক, বিজ্ঞান ও শিল্পের যে-কোন শাখায় সংগ্রামী বীর" হিসেবে। তিনি লিখছেন—মাদ্রাজে "সন্ন্যাসীর আগমনের দিনেই আমাদের অর্ধ ডজন বাছা-বাছা বন্ধু ভট্টাচার্য-বাবুর বাংলোয় হাজির। আমার বন্ধুদের সম্বন্ধে বলা যাবে, তাঁরা সকলেই আধুনিক পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির কোনো না কোনো শাখার বিষয়ে মোটামুটি ভালরকম জ্ঞানসম্পন্ন। ·····আমরা গিয়ে পড়লাম সেই সন্ন্যাসীর সামনে, যাঁর উজ্জল সহাস্য মুখ, অপূর্ব জ্যোতি-বিচ্ছুরিত সঞ্চরমান নয়ন। জিজ্ঞাসিত হয়ে বন্ধুরা আত্মপরিচয় দিলেন। অল্প কিছু প্রাথমিক শিষ্টাচারের পরে, সাধুকে একেবারে গেঁথে ফেলা হল প্রশ্নের পর প্রশ্নে—সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন—সর্ববিষয়ের প্রশ্ন।······ স্বামীজীর ভাবগর্ভ এবং সুস্বর উত্তরগুলি কেবলই ঝলসে-ঝলসে উঠে প্রশ্ন-কারীকে চুপ করিয়ে দিতে লাগল। স্বচ্ছন্দে উদ্ধৃতির পর উদ্ধৃতি দিয়ে যেতে লাগলেন সর্বপ্রকার ক্লাসিক্যাল লেখকদের রচনা থেকে, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ও ইতিহাস সম্বন্ধে। ভ্রমণক্লান্ত সন্ন্যাসীকে বিশ্রামের সুযোগ দিতে আমার বন্ধুরা যখন সন্ধ্যাশেষে বাড়ির পথ ধরলেন, তখন তাঁরা সন্ন্যাসীর যোগ্যতা সম্বন্ধে সর্বপ্রকার অনুমান করতে আরম্ভ করে দিয়েছেন। একজন বললেন, তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্যের এম. এ. অন্য একজন বললেন, না, উনি প্রচণ্ড দার্শনিক ; তৃতীয় জন বললেন, উনি ঐতিহাসিক, কারণ ঐ বিষয়ে উনি কয়েকজন সুপরিচিত পণ্ডিতের কথা উদ্ধৃত করেছেন। এঁদের মধ্যে অত্যুচ্চ-সংস্কৃতিসম্পন্ন একজনকে যখন স্বামীজী-বিষয়ে প্রশ্ন করা হল, তিনি বললেন, 'ওঁর মনের বিশাল দিগন্তের আকার আমাকে বিমূঢ় ও অভিভূত করে ফেলেছে। ঋগ্বেদ থেকে রঘুবংশ, বেদান্তদর্শনের তাত্ত্বিক ঊর্দ্ধগত রূপ থেকে

আধুনিককালের কাণ্ট ও হেগেল ; প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত ও নীতিশাস্ত্রের সমগ্র পরিধি ; প্রাচীন যোগের সুমহান প্রকৃতি থেকে আধুনিক ল্যাবরেটারির জটিলতা—সবই যেন এঁর দৃষ্টির সামনে পরিষ্কার। এই ব্যাপারটিই আমাকে হতভম্ভ করে ওঁর দাস করে ফেলেছে।' এঁদের মধ্যে আমার বলার কিছু ছিল না। আমি তাঁর দর্শনেই বশীভূত এবং আত্মবিক্রীত। তাঁর অসাধারণ মনীষা এবং বলবার ক্ষমতার রূপ স্তব্ধ বিস্ময়ে কেবল দেখে গেছি। সেই দিন থেকে শুরু করে আমেরিকার জন্য স্বামীজীর মাদ্রাজত্যাগ অবধি প্রত্যেকটি দিন, শহরের নবীন প্রবীণ সকলের কাছে মন্মথবাবুর বাড়িতে প্রাত্যহিক তীর্থযাত্রার দিন।"

সে সময়ের আরেকজন তরুণ কে. ব্যাসরাও লিখছেন—"তিনি একজন সন্ন্যাসী—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এ. পাস করেছেন, তাঁর মস্তক মুণ্ডিত, চমৎকার চেহারা, পরিধানে ত্যাগচিহ্ন গেরুয়া বস্ত্র ; তিনি ইংরেজী ও সংস্কৃত ভাষায় অনর্গল কথা বলেন, বিরুদ্ধ কথার পাল্টা জবাব দেবার অসাধারণ ক্ষমতা রাখেন, মুক্তকণ্ঠে সুললিত স্বরে যখন গান ধরেন, যেন মনে হয় বিশ্বাত্মার সঙ্গে তিনি এক হতে চলেছেন, আর তিনি সারা ধরার পর্যটক! মানুষটি স্বাস্থ্যবান্ ও দীর্ঘাবয়ব, রসিকতায় ভরপুর, আর সিদ্ধাই প্রকাশে যারা ব্যগ্র তাদের প্রতি তাঁর হৃদয় ঘৃণাপূর্ণ। সুপক্ব খাদ্যে তাঁর তৃপ্তি আছে, হুঁকার প্রতি ও তাম্রকুট সেবনে তাঁর বিশেষ প্রীতি, অথচ এমনি দক্ষতা এবং সারল্যের সংগে বৈরাগ্যের কথা বলেন যে, কেউ মুগ্ধ এবং শ্রদ্ধাবনত না হয়ে থাকতে পারেন না। এমন অদ্ভুত বাস্তবতার সামনে এসে বি. এ. এবং এম. এ. পাস ব্যক্তিগণ হতভম্ব হয়ে যেত। তাঁর মধ্যে তারা এমন এক মানুষের পরিচয় পেত, যাঁর কাছে কেউ অধ্যাত্মক্ষেত্রচিত মল্লক্রীড়া বা অসিসঞ্চালনের স্পর্ধা নিয়ে এলে তিনি বেশ আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পারতেন। আবার গম্ভীর আলোচনার পর যখন তিনি সাধারণভূমিতে নামতেন, তখন তারা দেখত, তিনি হাস্যকৌতুকে ব্যঙ্গবিদ্রূপে এবং কোন কিছুকে হেসে উড়িয়ে দিতেও বেশ পটু। কিন্তু অন্য সব কিছু ছেড়ে দিলেও তাঁর যে অবিমিশ্র অত্যুজ্জ্বল দেশপ্রেম ছিল, তাই সকলের চিত্ত জয় করত। যে যুবক সাংসারিক সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন এবং বন্ধন-মুক্ত হয়েছেন, তাঁর একটি মাত্র ভালবাসার বস্তু ছিল—তাঁর স্বদেশ, এবং একটি মাত্র বিষাদের কারণ ছিল—সেই স্বদেশের পতন। এই বিষয়ে চিন্তামগ্ন

হয়ে তিনি এমন সব কথা বলতেন, যাতে শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধবৎ বসে থাকতেন। হুগলী নদী থেকে তাম্রপর্ণী নদী পর্যন্ত পর্যটক মানুষটির এই ছিল প্রকৃতি। তিনি মুক্তকণ্ঠে আমাদের যুবকসম্প্রদায়ের নির্বীর্যতার জন্য দুঃখপ্রকাশ করতেন এবং তার নিন্দা করতেন। তাঁর বাক্যাবলী বিদ্যুদ্বেগে নিঃসৃত হত এবং ইস্পাতের মত পথ কেটে চলত; তিনি সকলেরই প্রাণে সাড়া জাগাতেন, অনেকেরই চিত্তে স্বীয় উদ্দীপনা সঞ্চারিত করতেন এবং ভাগ্যবান জন কয়েকের হৃদয়ে অনির্বাণ বিশ্বাসের প্রদীপ প্রজ্বলিত করেছিলেন।"

মাদ্রাজে বিখ্যাত ট্রিপলিকেন লিটারারি সোসাইটিতে বক্তৃতাকালে তিনি জাতিভেদ, বাল্যবিবাহ, নিম্নবর্ণের প্রতি অত্যাচার, ছুঁৎমার্গ প্রভৃতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান এবং নারী স্বাধীনতার কথা বলেন। এই সোসাইটির তরুণ সদস্যদের অনেকেই সমাজ-সংস্কারের সংগে যুক্ত ছিলেন। তাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন যে, তারা বিপথগামী কারণ প্রচলিত সমস্ত রীতি-নীতিকে উড়িয়ে দিয়ে ধর্মবিরুদ্ধ পাশ্চাত্য আদর্শে তারা সমাজ-সংস্কারের চেষ্টা করছে। তিনি বলেন যে, অতীতের মহান গৌরবময় ঐতিহ্যের ওপর ভিত্তি করে জাতীয় সৌধের ভিত্তি নির্মাণ করতে হবে।

মাদ্রাজের যুবকদের তিনি বলতেন—"যদি প্রয়োজন হয়, সমাজব্যবস্থার উন্নতি করো, বিধবাদের বিয়ে দাও, জাতিপ্রথার মাথায় বাড়ি মারো, কিন্তু ধর্মকে ত্যাগ করো না। সামাজিক ব্যাপারে প্রগতিশীল হও কিন্তু ধর্মব্যাপারে রক্ষণশীলতা রেখো।" তাদের তিনি বলতেন—"কাজ, কাজ, কাজ, দিবারাত্র কাজ করো……কাজ ছেড়ে পালানো শান্তির পথ নয়।……কাজের চরিত্র নিয়ে মাথা ঘামিও না। মনকে কেবল জিজ্ঞাসা করো, তুমি নিঃস্বার্থ কি না? তা যদি হও কোনো কিছুতে ভ্রূক্ষেপ করো না, কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে সামনে যে-কর্তব্য আছে তা যদি পালন করে যাও, তাহলেই তুমি গীতার সত্য উপলব্ধি করবে।"

এ সময় মাদ্রাজের একটি ঘটনা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে—তা হল স্বামীজীর সংস্পর্শে এসে মাদ্রাজ খ্রীষ্টান কলেজের অজ্ঞেয়বাদী অধ্যাপক সিঙ্গারাভেলু মুদালিয়রের সম্পূর্ণ রূপান্তর। তিনি শাস্ত্রে অবিশ্বাসী, অজ্ঞেয়বাদী ও মুক্ত-চিন্তাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন—পাশ্চাত্য জীবনযাত্রা অবলম্বন করতেন। স্বামীজীর সংস্পর্শে এসে তাঁর রূপান্তর ঘটে। তিনি চাকরি ছাড়েন, সংসার ত্যাগ করেন এবং ক্রমে এক আত্মসমর্পিত উল্লেখযোগ্য

সন্ন্যাসীতে পরিণত হন। এই ঘটনার উল্লেখ করে স্বামীজী-অনুরাগী যুবক সি. রামানুজাচারিয়ার লিখছেন—"সমস্ত মাদ্রাজে এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়েছিল এবং জনসাধারণ কিছুটা বুঝতে পেরেছিল—বিবেকানন্দ নামক বারুদখানা ব্যাপারটা কি!"

প্রতিভাবান দেশপ্রেমিক এই সন্ন্যাসী সেদিন দেশবাসীর দুঃখ-দুর্দশায় কাতর হয়ে পড়েছেন। তিনি দারিদ্র্য অশিক্ষা কুসংস্কার ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণের হাত থেকে মুক্তি পেতে চান। তাঁর মানসলোকে সেদিন উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে বঙ্কিমচন্দ্র-কল্পিত দেশমাতার ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী মূর্তি। নব-ভারত গঠনের চিন্তায় বিভোর তিনি। কি করে এই নবভারত গঠিত হবে?

চাই জনসাধারণের উন্নতি, চাই শিক্ষা, সম্পদ, স্বাস্থ্য, চাই আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান। পাশ্চাত্য দুনিয়া এই সব জাগতিক বিষয়ে অনেক এগিয়ে গেছে। ভারতবাসীকেও তাই শিখতে হবে—এ ছাড়া গত্যন্তর নেই। আমেরিকা যাত্রার প্রাক্কালে স্বামী তুরীয়ানন্দকে তিনি বলছেন—"আমি সারা ভারত ভ্রমণ করেছি। ......সর্বত্রই জনসাধারণের ভয়াবহ দুঃখ-দারিদ্র্য স্বচক্ষে দেখেছি। দেখে আকুল হয়েছি, চোখের জল বাধা মানেনি। এখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, তাদের দুঃখ-দারিদ্র্য দূর করবার চেষ্টা না করে তাদের মধ্যে ধর্মপ্রচারের চেষ্টা করা বৃথা। এই কারণে জনসাধারণের মুক্তির অন্যতম উপায় খুঁজতেই আমি এখন আমেরিকায় চলেছি।"

আমেরিকায় তখন বিশ্বধর্ম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। স্বামীজী স্থির করলেন সেখানে যেতে হবে। বাধা দুটি। এক—হিন্দু সন্ন্যাসীর পক্ষে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ—জাতিচ্যুতির সামিল। দ্বিতীয়তঃ—অর্থাভাব। সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধে স্বামীজীর আপত্তি ছিল না—এই প্রবল সামাজিক বাধাকে তিনি নিছক পুরোহিতদের দ্বারা আরোপিত বলে মনে করতেন। কিন্তু অর্থসংকট বড়ই প্রবল। তিনি কপর্দকহীন সন্ন্যাসী—কোথায় পাবেন এত টাকা! মাদ্রাজে তাঁর অনুগামী যুবকদের কাছে এ সম্পর্কে বলতেই তারা সোৎসাহে টাকা তুলতে থাকে এবং এভাবে পাঁচশ টাকা সংগৃহীত হয়। টাকা দেখে তিনি বিচলিত হন—তিনি দ্বিধাগ্রস্থ। তাঁর আমেরিকা যাত্রা—সত্যিই কি বিশ্বজননীর তাই ইচ্ছা! তিনি তাদের ঐ টাকা দরিদ্রদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে বললেন, বললেন—মায়ের ইচ্ছা থাকলে টাকা এমনিই আসবে। এরপর ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী

মাসে তিনি হায়দ্রাবাদে যান এবং সেখানকার রাজপুরুষ, অভিজাত ব্যক্তি এবং ব্যবসায়ীরা তাঁর আমেরিকা যাত্রার খরচ দিতে চান। স্বামীজী জানান যে, প্রয়োজন হলে নেবেন।

সেখান থেকে তিনি মাদ্রাজে ফেরেন। মাদ্রাজের তরুণরা মার্চ এবং এপ্রিল মাস ধরে টাকা সংগ্রহের চেষ্টা করতে থাকেন। এই দলের নেতা ছিলেন তরুণ শিক্ষক আলাসিঙ্গা পেরুমল, যিনি সেদিন টাকার জন্য প্রকৃতপক্ষে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করেছেন। ধনীদের কাছ থেকে নয়—ওই যুবকদল প্রধানতঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাছ থেকেই অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন কারণ স্বামীজী তাদের বলেছিলেন যে, তিনি ভারতীয় জনতা ও গরীবদের জন্যই বিদেশে যাচ্ছেন এবং এ কারণে তিনি চান যে, টাকাটা গরীবদের কাছ থেকেই আসুক। ভারতীয় জনতার দান করার মত কোন ক্ষমতাই সেদিন ছিল না—তাই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের কাছ থেকে এই তরুণ দল কিছু অর্থ সংগ্রহ করে। অর্থের প্রয়োজনে তারা সেদিন মহীশূর, হায়দ্রাবাদ ও রামনাদেও যান।

কেবলমাত্র এই তরুণরাই নয়—স্বামীজীর জন্য বিভিন্ন রাজন্যবর্গও অর্থ সাহায্য করেছিলেন। বলা বাহুল্য, প্রয়োজনের তুলনায় তা ছিল সামান্যই। অর্থ সংগ্রহের সম্ভাবনা এক সময় এমনই শোচনীয় স্তরে ছিল যে, স্বামীজী বলেছিলেন, প্রয়োজন হলে "আফগানিস্তানের ভেতর দিয়ে পাহাড়-পর্বত ডিঙ্গিয়ে ঝোপঝাড় ভেঙ্গে হেঁটে" তিনি আমেরিকা যাবেন।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ৩১-এ মে বোম্বাই থেকে জাহাজ ছাড়ল। ত্রিশ বছরের এক দরিদ্র সন্ন্যাসী তার যাত্রী—ভারতীয় হিন্দুর পক্ষে নিষিদ্ধ সেই কালাপানি অতিক্রম করে তিনি চলেছেন এক অজানা-অপরিচিত দেশে—সঙ্গে প্রয়োজনীয় পোশাক-পরিচ্ছদ—এমনকি অর্থও নেই। তাঁর সম্বল আত্মবিশ্বাস আর বুকভরা দেশপ্রেম।

সিংহল, পেনাং, সিঙ্গাপুর অতিক্রম করে জাহাজ এগিয়ে চলেছে। এশিয়ার অন্যতম প্রাচীন সভ্যতার পীঠস্থান চীন দর্শন করলেন তিনি। বিদেশী আধিপত্যে চীনের শোচনীয় অবস্থা স্বামীজীর দৃষ্টি এড়ায়নি। ইয়োকোহামা থেকে তিনি মাদ্রাজী তরুণ পেরুমল আলাসিঙ্গাকে লিখছেন যে, "চীন ও

ভারতবাসী যে 'মমিতে' পরিণত হয়ে এক প্রাণহীন সভ্যতার স্তরে আটকে রয়েছে, অতি দারিদ্র্যই তার অন্যতম কারণ। সাধারণ হিন্দু বা চীনবাসীর পক্ষে তার প্রাত্যহিক অভাব এতই ভয়ানক যে, তার আর কিছু ভাববার সময় থাকে না।" (বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ, পৃঃ ৩৫৫)।

এশিয়ার নবজাগ্রত শক্তি জাপানের সমৃদ্ধিতে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর মতে জাপান সম্পূর্ণভাবে জাগরিত। সে বুঝেছে তার কি প্রয়োজন—এমনকি জাপানের পুরোহিত সম্প্রদায়ও দেশের উন্নতিতে আগ্রহী। জাপানের সর্বস্তরে সেদিন উন্নতির ছোঁয়া লেগেছিল। তাঁর মনে প্রশ্ন জেগেছিল—পাশ্চাত্য বিদ্যা শিখে জাপান এত উন্নতি করলে ভারত কেন পারবে না! দেশপ্রেমিক সন্ন্যাসী আলাসিঙ্গা পেরুমলকে লিখছেন যে, "জাপানীদের সম্বন্ধে তাঁর মনে কত কথা উদিত হচ্ছে, যা একটি সংক্ষিপ্ত চিঠির মধ্যে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে, ভারতীয় যুবকদের দলে দলে প্রতি বৎসর চীন ও জাপানে যাওয়া উচিত। জাপানে যাওয়া আবার বিশেষ দরকার; কারণ জাপানীদের কাছে ভারত এখনও সর্বপ্রকার উচ্চ ও মহৎ পদার্থের স্বপ্ন-রাজ্যস্বরূপ।

এরপর তিনি তাদের ধিক্কার দিয়ে বলছেন—এ ধিক্কার সমগ্র ভারতীয় যুবকদের প্রতিই—"আর তোমরা কি করছ? সারা জীবন কেবল বাজে বকছ। এস, এদের দেখে যাও, তারপর যাও—গিয়ে লজ্জায় মুখ লুকোও গে। ভারতের যেন জরাজীর্ণ অবস্থা হয়ে ভীমরতি ধরেছে! তোমরা দেশ ছেড়ে বাইরে গেলে তোমাদের জাত যায়! এই হাজার বছরের ক্রমবর্ধমান জমাট কুসংস্কারের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে বসে আছ, হাজার বছর ধরে খাদ্যাখাদ্যের শুদ্ধাশুদ্ধতা বিচার করে শক্তিক্ষয় করছ! পৌরোহিত্যরূপ আহাম্মকির গভীর ঘূর্ণিতে ঘুরপাক খাচ্ছ! শত শত যুগের অবিরাম সামাজিক অত্যাচারে তোমাদের সব মনুষ্যত্বটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে—তোমরা কি বল দেখি? আর তোমরা এখন করছই বা কি? আহাম্মক, তোমরা বই হাতে করে সমুদ্রের ধারে পায়চারি করছ! ইউরোপীয় মস্তিষ্কপ্রসূত কোন তত্ত্বের এক কণামাত্র—তাও খাঁটি জিনিস নয়—সেই চিন্তার বদহজম খানিকটা ক্রমাগত আওড়াচ্ছ, আর তোমাদের প্রাণমন সেই ৩০ টাকার কেরানিগিরির দিকে পড়ে রয়েছে; না হয় খুব জোর একটা দুষ্ট উকিল হবার মতলব করছ। ইহাই ভারতীয় যুবকগণের

সর্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা। আবার প্রত্যেক ছাত্রের পাশে একপাল ছেলে—তাঁর বংশধরগণ—'বাবা, খাবার দাও, খাবার দাও' করে উচ্চ চীৎকার তুলেছে! বলি, সমুদ্রে কি জলের অভাব হয়েছে যে, তোমাদের বই, গাউন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমা প্রভৃতি সমেত তোমাদের ডুবিয়ে ফেলতে পার না?"

চরম ধিক্কার—চরমতম কশাঘাত! এর পরেই আবার কর্মের আহ্বান—"এস মানুষ হও। প্রথমে দুষ্ট পুরুতগুলোকে দূর করে দাও। কারণ এই মস্তিষ্কহীন লোকগুলো কখনও শুধরোবে না। তাদের হৃদয়ের কখনও প্রসার হবে না। শত শত শতাব্দীর কুসংস্কার ও অত্যাচারের ফলে তাদের উদ্ভব; আগে তাদের নির্মূল কর। এস, মানুষ হও। নিজেদের সংকীর্ণ গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে বাইরে গিয়ে দেখ, সব জাতি কেমন উন্নতির পথে চলেছে। তোমরা কি মানুষকে ভালবাসো? তোমরা কি দেশকে ভালবাসো? তা হলে এস, আমরা ভাল হবার জন্য—উন্নত হবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করি। পেছনে চেও না—অতি প্রিয় আত্মীয়স্বজন কাঁদুক; পেছনে চেও না, সামনে এগিয়ে যাও।

"ভারতমাতা অন্ততঃ সহস্র যুবক বলি চান। মনে রেখো—মানুষ চাই, পশু নয়। .... এখন জিজ্ঞাসা করি, সমাজের এই নূতন অবস্থা আনবার জন্য সর্বান্তঃকরণে প্রাণপণ যত্ন করবে, মাদ্রাজ এমন কতকগুলি নিঃস্বার্থ যুবক দিতে কি প্রস্তুত—যারা দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হবে, তাদের ক্ষুধার্ত মুখে অন্ন দান করবে, সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করবে, আর তোমাদের পূর্ব-পুরুষগণের অত্যাচারে যারা পশুপদবীতে উপনীত হয়েছে, তাদের মানুষ করবার জন্য আমরণ চেষ্টা করবে?" (৬।৩৫৮-৫৯)।

দেশের যুবকদের প্রতি এক অনবদ্য আহ্বান—দেশপ্রেমিক সন্ন্যাসীর হৃদয় নিংড়ানো আহ্বান। বলা বাহুল্য, এই পত্রটিতে যেন যুবা সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের সমগ্র জীবনদর্শন প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে। তিনি চান যুবকরা দেশকে ভালবাসুক, দেশকে উন্নত করুক, পুরোহিতদের অত্যাচার ও শতাব্দীর অনাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াক, জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করে তাদের মনুষ্যত্ব ফিরিয়ে দিক, ইউরোপের অন্ধ অনুকরণ না করে জীবনমুখী শিক্ষা গ্রহণ করুক, বাল্যবিবাহ বন্ধ হোক এবং নিজেদের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না থেকে তারা জগৎকে দেখুক ও চিনুক—এর মধ্যেই আছে মুক্তির

পথ। এ কাজ করতে গেলে যুবকদেরই চাই—অন্ততঃ সহস্র যুবক চাই, যারা প্রকৃত অর্থেই মানুষ—পশু নয়।

ইয়োকোহামা থেকে প্রশান্ত মহাসাগর অতিক্রম করে তিনি বংকুবর বন্দরে পেঁছোন। তারপর সেখান থেকে ট্রেনপথে কানাডার মধ্য দিয়ে ৩০-এ জুলাই ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি শিকাগো নগরীতে উপনীত হলেন। পথে নানা ফন্দীবাজের পাল্লায় পড়ে তাঁর অর্থ প্রায়-শেষ। অচেনা-অজানা বিদেশে সহায়-সম্বলহীন কপর্দকশূন্য ত্রিশ বছরের এক তরুণ সন্ন্যাসী। পরণে গৈরিক বেশ—প্রচণ্ড শীতে কোন শীতবস্ত্র নেই। রাস্তায় বেরোলে তাঁর ঐ বিচিত্র বেশের জন্য নানা বিদ্রূপ-ব্যঙ্গ এবং হাততালি—অসহনীয় এক অবস্থা। খবর নিয়ে জানলেন যে, সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহের আগে ধর্মসম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে না, তাতে অংশগ্রহণ করতে গেলে উপযুক্ত পরিচয়পত্র থাকা চাই এবং প্রতিনিধি নির্বাচনের তারিখও উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

ইতিমধ্যে শিকাগোর হোটেলওয়ালা তাঁর অবশিষ্ট সব অর্থ আত্মসাৎ করেছে। সব দিক থেকেই চরম হতাশাব্যঞ্জক অবস্থা! আলাসিঙ্গাকে তিনি লিখছেন—"এখানে আসিবার পূর্বে যেসব সোনার স্বপ্ন দেখিতাম, তাহা ভাঙিয়াছে; এক্ষণে অসম্ভবের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইতেছে। শত শত বার মনে হইয়াছে, এদেশ হইতে চলিয়া যাই; কিন্তু আবার মনে হয়, আমি একগুঁয়ে দানা, আর আমি ভগবানের নিকট আদেশ পাইয়াছি। আমি কোন পথ দেখিতে পাইতেছি না।····· মরি বাঁচি, উদ্দেশ্য ছাড়িতেছি না।······আমাকে এখন অনাহার, শীত, অদ্ভুত পোশাকের দরুণ রাস্তার লোকের বিদ্রূপ—এগুলির সহিত যুদ্ধ করিয়া চলিতে হইতেছে।" (৬।৩৬১)

এত হতাশাময় অবস্থাতেও তিনি ভেঙ্গে পড়েননি বা প্রাণপ্রিয় ভারতের কথা ভোলেননি। এই একই চিঠিতে তিনি লিখছেন—"নিরাশ হইও না। স্মরণ রাখিও, ভগবান গীতায় বলিতেছেন, 'কর্মে তোমার অধিকার, ফলে নয়।'······ কোমর বাঁধ, বৎস, প্রভু আমাকে এই কাজের জন্য ডাকিয়াছেন।...আমি এই দেশে অনাহারে বা শীতে মরিতে পারি; কিন্তু হে মান্দ্রাজবাসী যুবকগণ, আমি তোমাদের নিকট এই গরীব, অজ্ঞ, অত্যাচারপীড়িতদের জন্য এই সহানুভূতি, এই প্রাণপণ চেষ্টা—দায়স্বরূপ অর্পণ করিতেছি। যাও, এই মুহূর্তে সেই পার্থসারথির মন্দিরে—যিনি গোকুলের দীনদরিদ্র গোপগণের সখা ছিলেন, যিনি

গুহক চণ্ডালকে আলিঙ্গন করিতে সঙ্কুচিত হন নাই, যিনি তাঁহার বুদ্ধ-অবতারে রাজপুরুষগণের আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিয়া এক বেশ্যার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন ; যাও, তাঁহার নিকট গিয়া সাষ্টাঙ্গে পড়িয়া যাও, এবং তাঁহার নিকট এক মহা বলি প্রদান কর : বলি—জীবন-বলি তাহাদের জন্য, যাহাদের জন্য তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, যাহাদের তিনি সর্বাপেক্ষা ভালবাসেন, সেই দীন দরিদ্র পতিত উৎপীড়িতদের জন্য। তোমরা সারা জীবন এই ত্রিশকোটি ভারতবাসীর উদ্ধারের জন্য ব্রত গ্রহণ কর। যাহারা দিন দিন ডুবিতেছে।

"এ একদিনের কাজ নয়। পথ ভীষণ কণ্টকপূর্ণ। কিন্তু পার্থসারথি আমাদের সারথি হইতেও প্রস্তুত, তাহা আমরা জানি। তাঁহার নামে, তাঁহার প্রতি অনন্ত বিশ্বাস রাখিয়া ভারতের শতশতযুগসঞ্চিত পর্বতপ্রমাণ অনন্ত দুঃখ-রাশিকে অগ্নিসংযোগ করিয়া দাও, উহা ভস্মসাৎ হইবেই হইবে।···

"এ ব্রত গুরুতর, আমরাও ক্ষুদ্রশক্তি। কিন্তু আমরা জ্যোতির তনয়, ভগবানের তনয়।···আমরা সিদ্ধিলাভ করিবই করিব। শত শত লোক এই চেষ্টায় প্রাণত্যাগ করিবে, আবার শত শত লোক উহাতে ব্রতী হইতে প্রস্তুত থাকিবে।··· তুচ্ছ জীবন, তুচ্ছ মরণ, তুচ্ছ ক্ষুধা, তুচ্ছ শীত।···অগ্রসর হও, প্রভু আমাদের নেতা। পশ্চাতে চাহিও না। কে পড়িল দেখিতে যাইও না। এগিয়ে যাও, সম্মুখে, সম্মুখে। এইরূপেই আমরা অগ্রগামী হইব—একজন পড়িবে, আর একজন তাহার স্থান অধিকার করিবে।" (৬।৩৬৫-৬৭)

সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ হলেন সেই ডানপিটে নরেন্দ্রনাথ—শত কষ্টেও যিনি হার মানেন না। হার মানলেন না—শত লাঞ্ছনা, হাজার কষ্ট, লক্ষ মৃত্যুভয় বুকে চেপে তিনি আমেরিকার মাটি কামড়ে পড়ে রইলেন—প্রেরণা তাঁর গুরুদেব—ভরসা ভারতের লাখ লাখ অসহায় দরিদ্র জনসাধারণ—তাদের মুক্তির উপায় খুঁজতেই তো এই বিদেশে আসা!

•

শিকাগোতে হোটেল খরচ খুব বেশী। স্বামীজী তাই বোস্টনে যাওয়া স্থির করলেন—সেখানে খরচ কম। ট্রেনে এক অভিজাত বৃদ্ধার সঙ্গে পরিচয় হল। তরুণী ভারতীয় সন্ন্যাসীর সংগে কথাবার্তা বলে বৃদ্ধা মুগ্ধ হন এবং স্বামীজীকে

তাঁর গৃহে অতিথি হিসেবে বরণ করেন। শ্রীমতী ক্যাথেরিন এ্যাবট্ স্যানবর্ন নাম্নী প্রতিপত্তিশালিনী এই বৃদ্ধা স্বামীজীকে বোস্টনের শিক্ষিত ও গণ্যমান্য সমাজে পরিচয় করিয়ে দেন এবং তাঁর উদ্যোগে স্বামীজী নানা স্থানে প্রচুর বক্তৃতা করেন। এই সব বক্তৃতার মাধ্যমে তিনি ভারতীয় সংস্কৃতি, ভারতীয় ইতিহাস, হিন্দুধর্ম, ভারতে ইংরেজ শাসক ও মিশনারীদের অত্যাচার প্রভৃতির কথা তুলে ধরেন এবং বিদেশে ভারত সম্পর্কে মিশনারীদের মিথ্যা প্রচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। তিনি বলেন, ভারতে ধর্মের অভাব নেই এবং একারণে সেখানে মিশনারী পাঠাবার কোন প্রয়োজন নেই—প্রয়োজন কারিগরী বিদ্যা শেখাবার ব্যবস্থা করা। ভারতে ইংরেজ শাসনের স্বরূপ উদঘাটন করে দৃঢ়তার সংগে তিনি বলেন—"ভারতের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখতে পারেন, হিন্দুরা রেখে গেছে অপূর্ব সব মন্দির। মুসলমানেরা সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ। আর ইংরেজরা? স্তূপীকৃত ভাঙ্গা ব্রান্ডির বোতল—আর কিছু নয়।.. ইংরেজদের কৃতকর্মের প্রতিশোধ ইতিহাস নেবেই নেবে। আমাদের গাঁয়ে গাঁয়ে দেশে দেশে যখন মানুষ দুর্ভিক্ষে মরছে, তখন ইংরেজরা আমাদের গলায় পা দিয়ে পিষেছে, নিজেদের তৃপ্তির জন্য আমাদের শেষ রক্তবিন্দুটি পর্যন্ত শুষে নিয়েছে, আর এ-দেশের কোটি কোটি টাকা নিজের দেশে চালান করেছে।" (Swami Vivekananda in America : New Discoveries, Marie Lousie Burke, 1966, P. 25)

এই বৃদ্ধার মাধ্যমেই স্বামীজীর সংগে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীক ভাষার অধ্যাপক জন হেনরি রাইটের পরিচয় হয়। অধ্যাপক রাইট তাঁর সংগে কথা বলে মুগ্ধ হন এবং সানন্দে তাঁকে ধর্মমহাসভায় যোগদানের ব্যবস্থা করে দিতে রাজী হন। স্বামীজী তাঁকে পরিচয় পত্রের কথা বললে গুণমুগ্ধ অধ্যাপক বলেন—"আপনার কাছে পরিচয়পত্র চাওয়া আর সূর্যকে তার কিরণ-বিকিরণের কি অধিকার আছে জিজ্ঞাসা করা একই কথা।" কেবলমাত্র এই নয়—মহাসভার প্রতিনিধি-নির্বাচক কমিটির সম্পাদককে তিনি লিখলেন—"ইনি এমন একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি যে, আমাদের সকল অধ্যাপকের পাণ্ডিত্য এক করলেও এঁর সমকক্ষ হয় না।"

স্বামীজী শিকাগোয় রওনা হলেন, কিন্তু শিকাগো স্টেশনে পৌঁছে দেখলেন যে, তিনি ধর্মমহাসভার সর্বেসর্বা ডাঃ ব্যারোজের ঠিকানাটি হারিয়ে ফেলেছেন।

পথচারীদের জিজ্ঞাসা করেও তিনি কোন উত্তর পেলেন না। রাত হয়ে আসছে —মাথা গোঁজার জন্য একটা হোটেলের সন্ধান চাই—এই সাহায্যটুকুও কেউ করল না। অবশেষে স্টেশনে একটা প্রকাণ্ড খালি বাক্সের মধ্যে আশ্রয় নিয়ে প্রবল শীতের হাত থেকে রক্ষা পেলেন। সকালে পথে বেরোলেন। পোশাক ময়লা, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় তিনি ক্লান্ত, কিন্তু সর্বত্রই মিলল 'কালা আদমী'-র একমাত্র প্রাপ্য ঘৃণা অপমান লাঞ্ছনা ঠাট্টা-বিদ্রূপ। অবসন্ন মন ও ক্লান্ত শরীর নিয়ে তিনি এক সময় রাস্তার ধারে বসে পড়লেন—এ সময়েই স্বামীজীর সামনে হাজির হলেন মিসেস হেল—স্বামীজীর 'মাদার চার্চ'—স্বামীজীর 'মা'—আমেরিকায় তাঁর এক অতি বিশ্বস্ত ভক্ত। আহার ও বিশ্রামের পর শ্রীমতী হেল স্বামীজীকে ধর্মমহাসভার কার্যালয়ে নিয়ে যান, তিনি সেখানে প্রতিনিধিরূপে গৃহীত হন এবং প্রতিনিধিদের সংগে তাঁর বসবাসের ব্যবস্থা হয়।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর—শুরু হল বিশ্বধর্মসম্মেলন। আমেরিকার ছয়-সাত হাজার জ্ঞানী, গুণী, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও সাংবাদিকে পূর্ণ সভাকক্ষ। ত্রিশ বছরের তরুণ সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ সেখানে হিন্দু ধর্মের প্রতিনিধি। এ ধরনের কোন সভায় বক্তৃতা করার কোন পূর্ব-অভিজ্ঞতা তাঁর নেই। তিনি রীতিমত বিচলিত। একের পর এক বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিরা তাঁদের তৈরী করা ভাষণ পাঠ করলেন—স্বামীজীর এ সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। তাঁকে ডাকা হল বারকয়েক—তিনি পরে বলবেন বলে সময় নিলেন। যখন দেখলেন যে, আর ভাষণ স্থগিত রাখা উচিত নয়—তখন তিনি উঠে দাঁড়ালেন। প্রথাগতভাবে শ্রোতৃমণ্ডলীকে সম্বোধন না করে, তিনি শুরু করলেন "আমেরিকাবাসী ভগ্নী ও ভ্রাতাগণ",......। এই কথাটির বিপুল শক্তি শ্রোতৃ-মণ্ডলীর অন্তর স্পর্শ করল। শত শত শ্রোতা উঠে দাঁড়িয়ে পড়লেন—চতুর্দিক থেকে শুধু হর্ষধ্বনি আর করতালি। কয়েক মিনিট ধরে তা চলল। প্রথম দিনের এই সংক্ষিপ্ত ভাষণে তিনি হিন্দু ধর্মের সার্বজনীনতা ও বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের কথা বললেন।

এই ক্ষুদ্র ভাষণের ফল হল মারাত্মক। ডাঃ ব্যারোজ লিখছেন, "শ্রীযুক্ত বিবেকানন্দ যখন শ্রোতৃবৃন্দকে 'ভগিনী ও ভ্রাতৃগণ' বলে সম্বোধন করেছিলেন,

তখন এক তুমুল করতালিধ্বনি উত্থিত হয়ে অনেক মিনিট স্থায়ী হয়েছিল।" শ্রীমতী এস. কে. ব্লজেট বলছেন—"আমি ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের শিকাগো ধর্মমহাসভায় উপস্থিত ছিলাম। সেই যুবকটি উঠে যখন বললেন, 'আমার আমেরিকাবাসী বোন ও ভাইরা' তখন সাত হাজার নরনারী এমন কি একটা জিনিসের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদনের জন্য উঠে দাঁড়াল যা তারা ভাষায় প্রকাশ করতে সমর্থ ছিল না। যখন বক্তৃতা শেষ হল, তখন দেখলাম দলে দলে নারীরা তাঁর সান্নিধ্য লাভের জন্য বেঞ্চ ডিঙিয়ে এগিয়ে চলেছে।"

প্রথম আবির্ভাবেই বিবেকানন্দ আমেরিকাবাসীর হৃদয় জয় করে নিলেন। একদিনেই তাঁর যশ ছড়িয়ে পড়ল সারা আমেরিকায়। মার্কিন সংবাদপত্রগুলি একযোগে ঘোষণা করল যে, ধর্মসম্মেলনে সর্বশ্রেষ্ঠ বক্তা হলেন স্বামী বিবেকানন্দ। 'দি প্রেস অব আমেরিকা' লিখছে—"হিন্দু দর্শন ও বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত প্রিয়দর্শন ও তরুণবয়স্ক আচার্য বিবেকানন্দ ধর্মমহাসভায় যে বক্তৃতা প্রদান করেছেন, তাতে সমগ্র সভ্যমণ্ডলী স্তম্ভিত ও মুগ্ধ হয়েছেন। সেখানে বহু বিশপ ও প্রায় প্রত্যেক খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের ধর্মোপদেষ্টাগণ উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা সকলেই বিবেবেকানন্দের প্রভাবে বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছেন। এই মহাপুরুষের বাগ্মিতা, তার জ্ঞানদীপ্ত সৌম্য মুখমণ্ডল এবং তাঁর চিরসম্মানিত ধর্মের মাধুর্যবর্ণনের জন্য তিনি যে সুন্দর ইংরাজী বলেন—সমস্ত মিলিত হয়ে শ্রোতৃবৃন্দের অন্তরে এক গভীর দিব্যভাব সঞ্চার করেছে।"

'দি ইণ্টিরিয়র শিকাগো' লিখছে, "ইনিই সেই ব্যক্তি, যাঁর প্রশংসা-ধ্বনিতে মহাসভায় সর্বাপেক্ষা অধিক কোলাহল উত্থিত হয়েছিল এবং শ্রোতৃবৃন্দের আগ্রহাতিশয়ে যাঁকে বার বার সভামধ্যে ফিরে আসতে হয়েছিল।"

আমেরিকার সর্বশ্রেষ্ঠ পত্রিকা 'হেরাল্ড' লিখছে—"ধর্মমহাসভায় বিবেকানন্দ অবিসংবাদিতরূপে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তাঁর বক্তব্য শুনে আমরা বুঝতে পেরেছি যে, ভারতের মত জ্ঞানবৃদ্ধ দেশে ধর্মপ্রচারক পাঠান কত নির্বুদ্ধিতার কাজ।"

ধর্মমহাসভা যে ক'দিন চলেছিল তার প্রায় প্রতিদিনই স্বামীজীকে নানা অধিবেশনে বক্তৃতা করতে হয়। এখানে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ও সর্বশ্রেষ্ঠ বক্তারূপে তিনি সর্বসাধারণের স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। শ্রোতৃমণ্ডলীকে সভায় ধরে রাখা এবং সভায় শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য কর্তৃপক্ষকে প্রায়ই তাঁর জনপ্রিয়তার সুযোগ নিতে হত। তিনি শুধু মঞ্চের একদিক থেকে অপরদিকে হেঁটে গেলেই

হাততালি পেতেন। শ্রোতারা যাতে সভায় শেষ পর্যন্ত বসে থাকেন সেজন্য মহাসভার কর্তৃপক্ষ তাঁকে দিনের শেষ বক্তা হিসেবে ঠিক করে রাখতেন। প্রচণ্ড গরম বা নীরস প্রাণহীন বক্তৃতার জন্য শ্রোতারা হয়তো চলে যাচ্ছেন, তখনই দিনের শেষ বক্তা হিসেবে সভাপতি স্বামী বিবেকানন্দের নাম ঘোষণা করতেন। এর ফলে প্রচণ্ড গরমের মধ্যে দু-এক ঘণ্টা বিরক্তিকর ভাষণ শোনার কষ্ট সহ্য করেও তাঁরা শান্তভাবে বসে থাকতেন। বিবেকানন্দের পনেরো মিনিটের ভাষণ শোনা যাবে —এটাই তাদের লাভ।

শিকাগোবাসী সেদিন শহরের রাস্তায় রাস্তায় বিবেকানন্দের পূর্ণাবয়ব মানুষ-প্রমাণ ত্রিবর্ণচিত্র টাঙিয়ে দিয়েছিল। ছবির নীচে লেখা থাকত "ভারতের হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ!' পথচারীরা ছবির সামনে দাঁড়িয়ে টুপি খুলে অবনত মস্তকে এই বিজয়ী বীরের প্রতি শ্রদ্ধা জানাত। মাসের পর মাস ধরে বিভিন্ন সংবাদপত্রে শুধু প্রশংসা, আর প্রশংসা! তিনি যেখানে যেতেন, জনতা সেখানেই তাঁকে ঘিরে ধরত এবং তাঁর কাছ থেকে কিছু শুনতে চাইত। গোঁড়া খ্রীষ্টানরাও তাঁর সম্পর্কে বলত যে, তিনি "নরকুলের অলঙ্কারস্বরূপ"। মহাসভার বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি মারউইন-মেরী স্নেল বলছেন যে, স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন "নিঃসন্দেহে মহাসভার সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ও প্রভাবশালী ব্যক্তি।"

ভারতে থিওসফিক্যাল সোসাইটির প্রতিষ্ঠাত্রী শ্রীমতী এ্যানি বেশান্ত শিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামীজীর মধ্যে দেখেছিলেন এক 'সৈনিক সন্ন্যাসী'-কে যিনি সেদিন যথার্থই ছিলেন ভারতের 'চারণ সন্ন্যাসী'।

ধর্মমহাসভার পর আমেরিকার নানা প্রান্ত থেকে তাঁর কাছে বক্তৃতার আহ্বান আসতে লাগল। এ সময় তিনি ব্যাপকভাবে আমেরিকা ভ্রমণ করে ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি, হিন্দুধর্ম, সামাজিক রীতিনীতি, নারীর আদর্শ প্রভৃতি সম্পর্কে ভাষণ দেন। ব্যাপক ভ্রমণের ফলে একদিকে তিনি যেমন আমেরিকাকে জানতে সক্ষম হন, তেমনি অপরদিকে মিশনারীদের ঘৃণ্য অপপ্রচারের ফলে আমেরিকায় ভারত সম্পর্কে সৃষ্ট মিথ্যা ধারণা অপসারিত হয়। খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী দেশের বুকে দাঁড়িয়ে তিনি সেদিন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় খ্রীষ্টান মিশনারী ও ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদের মুখোশ খুলে দিয়েছিলেন।

তাঁর এই অভূতপূর্ব সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হয়েছিলেন অনেকেই। ব্রাহ্মসমাজ,

থিওসফিক্যাল সোসাইটি, রমাবাঈয়ের দল ও খ্রীষ্টান মিশনারীরা একযোগে তাঁর বিরুদ্ধে নানা কুৎসা রটাতে থাকে। বিদেশের মাটিতে ত্রিশ বছরের এক যুবক রাজ-সম্মানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন—একদল ঈর্ষাকাতর মানুষ সুপরিকল্পিত-ভাবে দিনের পর দিন তাঁর বিরুদ্ধে জঘন্য কুৎসা রটিয়ে বেড়াচ্ছে, কিন্তু এই যুবকটির একমাত্র আরাধ্যা সেদিন ভারতমাতা। নানা বক্তৃতার মাধ্যমে তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির কথা প্রচার করছেন, ভারতের মুখে লিপ্ত কালিমা অপসারণ করছেন, বক্তৃতার মাধ্যমে অর্জিত অর্থ ভারতে পাঠাচ্ছেন দেশের সেবার জন্য এবং ভারতীয় যুবকদের চিঠির পর চিঠি লিখে তাদের কর্মে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানাচ্ছেন। তিনি লিখছেন—"দৃঢ়ভাবে কাজ করিয়া যাও, অবিচল অধ্যবসায়শীল হও এবং প্রভুর উপর বিশ্বাস রাখো। কাজে লাগো।......মনে রাখিবে, দরিদ্রের কুটিরেই আমাদের জাতীয় জীবন স্পন্দিত হইতেছে।...... তাহাদিগকে উন্নত করিতে পারো? তাহাদের স্বাভাবিক আধ্যাত্মিক প্রকৃতি নষ্ট না করিয়া তাহাদিগকে আপনার পায়ে দাঁড়াইতে শিখাইতে পারো? তোমরা কি সাম্য, স্বাধীনতা, কার্য ও উৎসাহে ঘোর পাশ্চাত্য এবং ধর্মবিশ্বাস ও সাধনায় ঘোর হিন্দু হইতে পারো? ইহাই করিতে হইবে এবং আমরাই ইহা করিব। তোমরা সকলে ইহা করিবার জন্যই আসিয়াছ। আপনাতে বিশ্বাস রাখো। প্রবল বিশ্বাসই বড় বড় কার্যের জনক। এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও। মৃত্যু পর্যন্ত গরীব, পদদলিতদের উপর সহানুভূতি করিতে হইবে—ইহাই আমাদের মূলমন্ত্র। এগিয়ে যাও, বীরহৃদয় যুবকবৃন্দ!" (৬।৩৯২-৯৩)

যুবকরাই স্বামীজীর বল, যুবকরাই স্বামীজীর মনের মানুষ—তাই বিদেশ থেকে তাঁর চিঠি যুবকদের কাছেই। বিদেশে থেকেই তিনি দেশে গড়ে তুলতে চান একটি শক্তিশালী যুবসংগঠন, যা জাতির মুক্তিকে ত্বরান্বিত করবে, লড়াই করবে জাতির শত্রুদের বিরুদ্ধে—জাগিয়ে তুলবে ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরিকে। দেশের প্রতি তাঁর ভালবাসা মিথ্যা বুজরুকী নয়—দরিদ্র নিরন্ন ভারতবাসীর কথা চিন্তা করে আমেরিকায় ধনীর প্রাসাদে দুগ্ধফেননিভ শয্যা ত্যাগ করে শীতের রাতে কাঁদতে কাঁদতে মেঝের শুয়ে কাটিয়েছেন তিনি সারা রাত। আমেরিকায় কিছু তরুণী স্বামীজীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁর মন জয় করার চেষ্টা করে, কিন্তু স্বামীজী ছিলেন অবিচল। তিনি সর্বপ্রকার প্রলোভনের ঊর্ধ্বে। এ সম্পর্কে জনৈকা হিতাকাঙ্ক্ষী বর্ষীয়সী মহিলা তাঁকে সতর্ক করে দিলে তিনি বলেন—"আপনি

আমার স্নেহময়ী মা! আপনি আমার জন্য ভয় পাবেন না। সত্য বটে আমি এককালে বটতলায় শুয়ে এবং কোন চাষার দেওয়া একপাত্র অন্ন খেয়ে দিন কাটিয়েছি। কিন্তু আমিই আবার কোন মহারাজার বাড়ীতেও অতিথি হয়েছি, আর দাসীরা সারা রাত আমার গায়ে ময়ূরপুচ্ছের পাখার হাওয়া করেছে। প্রলোভন আমি ঢের দেখেছি—আমার জন্য আপনার ভাবনা নেই।" বিবেকানন্দ বিবেকানন্দই—এখানে মিথ্যাচার, ভণ্ডামী বা প্রলোভনের কোন সুযোগ নেই।

আমেরিকার বহু পণ্ডিত ও কৃতী নারী-পুরুষ স্বামীজীর অনুগামী হয়েছিলেন—তাঁরা ছিলেন আমেরিকায় স্বামিজীর একনিষ্ঠ অনুচর। মিসেস কেট ট্যানাট উড্স্, এলা হুইলার উইল্কক্স, মিসেস ব্যাগলি, সিস্টার ক্রিস্টন, ওলি বুল, মিস ওয়ালডো, জোসেফিন ম্যাকলাউড, মাদাম মেরী লুইসী, হেল-পরিবার ও লেগেট-পরিবার ছিলেন স্বামীজীর প্রতি বিশেষভাবে অনুরক্ত এবং স্বামীজীর ভাবধারা-প্রচারে এঁদের অবদান শ্রদ্ধার সংগে স্মরণীয়। আমেরিকায় তিনি কয়েকজন শিষ্যাশিষ্যাকে ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাস দান করেন এবং বেদান্ত প্রচারের উদ্দেশ্যে 'বেদান্ত সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর পাণ্ডিত্য ও মনীষা এমনই ছিল যে, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতার পর তাঁকে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্য-দর্শন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়। বলা বাহুল্য, তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন।

আমেরিকা থেকে স্বামীজী ইংল্যাণ্ডে যান। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে তিনি দু'বার ইংল্যাণ্ডে গিয়েছিলেন। প্রথমবার ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইংল্যাণ্ডে পৌঁছে তিনি সেখানে প্রায় তিনমাস অবস্থান করেন। দ্বিতীয়বার ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের শেষ দিকে তিনি ইংল্যাণ্ডে পৌঁছোন এবং ১৬ই ডিসেম্বর ইংল্যাণ্ড ত্যাগ করে ইউরোপের কয়েকটি স্থান ভ্রমণ করে ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। পরবর্তীকালে ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য ভ্রমণকালে তিনি ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স এবং অন্যান্য দেশে যান।

স্বামীজীর ইংল্যাণ্ড-ভ্রমণ সম্পর্কেও বলা যায় যে, আমেরিকার মতই তিনি এলেন এবং ইংল্যাণ্ডবাসীকে জয় করলেন। এখানে তিনি বড় বড় সভায় বক্তৃতা

করতে চাননি—সাধারণ ঘরোয়া পরিবেশে ছোট ছোট বৈঠক করতেন মাত্র। এই সব সভাগুলিতে ভীড় উপচে পড়তে লাগল—হাজার হাজার মানুষ তাঁর গুণগ্রাহীতে পরিণত হলেন। সমগ্র লণ্ডনে সাড়া পড়ে গেল। পত্রিকাগুলিও প্রচারে নামল। অচিরেই নানা বিশিষ্ট ক্লাব ও সোসাইটি থেকে তাঁর আমন্ত্রণ আসতে লাগল।

২২শে অক্টোবর, ১৮৯৫ সালে বহু গণ্যমান্য ও শিক্ষিত ব্যক্তির উপস্থিতিতে তিনি পিকাডিলির 'প্রিন্সেপ হলে' 'আত্মবিজ্ঞান' সম্পর্কে ভাষণ দিলেন। পত্র-পত্রিকায় শুধু উচ্ছ্বসিত প্রশংসা—আর প্রশংসা। তাঁর এই বক্তৃতার প্রভাব সম্পর্কে 'স্ট্যান্ডার্ড' পত্রিকা লিখছে—"সেদিন এক ভারতীয় যুবক সন্ন্যাসী প্রিন্সেপ-হলে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের পর এক কেশবচন্দ্র সেন ব্যতীত ভারতবাসীর মধ্যে এমন উৎকৃষ্ট বক্তা আর কখনো ইংল্যাণ্ডের বক্তৃতামঞ্চে দৃষ্ট হয় নি।·· বক্তৃতা-প্রদানকালে তিনি মহাত্মা বুদ্ধ ও যীশুর দু-চারটি কথার তুলনায় রাশি রাশি কলকারখানা, বিবিধ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও পুস্তকাদি দ্বারা মানুষের যে কত সামান্য উপকার সাধিত হচ্ছে সে-সম্বন্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করেন। বক্তৃতাটি যে তিনি পূর্ব থেকে প্রস্তুত করে আসেন নি, তা স্পষ্ট বোঝা যায়। তাঁর কণ্ঠস্বর মধুর এবং বক্তৃতাকালে তাঁর মুখে একটি কথাও আটকায় নি।"

পরিণত বয়সে দীর্ঘকাল প্রচারের ফলে রামমোহন এবং কেশবচন্দ্র ইংল্যাণ্ডে যে স্থান দখল করেছিলেন, তরুণ বিবেকানন্দ কেবলমাত্র একটি বক্তৃতাতেই সেই স্থান দখল করেন। রামমোহন ইংল্যাণ্ডে গিয়েছিলেন মোগল সম্রাটের দূত হিসেবে। কেশবচন্দ্র ইংল্যাণ্ডে সাম্প্রদায়িক ধর্মমত প্রচার করেন এবং সেখানে যীশুখৃষ্ট সম্পর্কেই বক্তৃতা দেন। ব্রাহ্মসমাজের প্রতাপচন্দ্র মজুমদার সেখানে একেশ্বরবাদ সম্পর্কে বক্তৃতা করেন এবং লণ্ডনে শিবনাথ শাস্ত্রীর বক্তৃতার বিষয় ছিল 'ব্রাহ্মধর্ম'। কেশবচন্দ্র ও প্রতাপচন্দ্রের বক্তৃতায় হিন্দুধর্ম সম্পর্কে কমবেশী ক্ষমাপ্রার্থনাকারী ভাব ছিল। তাঁদের প্রচারিত হিন্দুধর্ম ছিল বহুদেববাদ, পৌত্তলিকতা ও জাতি-বিভাগে পূর্ণ। ইংল্যাণ্ড-আমেরিকায় হিন্দুধর্ম সম্পর্কে এই ধারণাই ছিল। বিবেকানন্দ এই ধারণার ওপর প্রথম আঘাত হানলেন। তাঁর বক্তব্যের মধ্যে কোন দীনতা ভীরুতা দ্বিধা বা ক্ষমা-প্রার্থনার ভাব ছিল না—সেখানে ছিল দম্ভ, সাহসিকতা ও চ্যালেঞ্জের সুর। এছাড়া, বিবেকানন্দের প্রচার ভারতে যে

প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল—রামমোহন বা কেশবচন্দ্র তা সৃষ্টি করতে পারেন নি। (স্বামী বিবেকানন্দ, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ১৩৩৫, পৃঃ ১৯৮-২০০)।

ইংল্যাণ্ডের নানা স্থানে ঘরোয়া বৈঠক এবং মঞ্চে দাঁড়িয়ে নানা বিষয় সম্পর্কে তিনি অসংখ্য বক্তৃতা করেন। সারা ইংল্যাণ্ড যেন তাঁকে কাছে পাবার জন্য উন্মাদ হয়ে উঠেছিল। (মিস মুলার, মিঃ স্টার্ডি, গুডউইন, মার্গারেট নোবেল (নিবেদিতা), সেভিয়ার দম্পতি তাঁর নিষ্ঠাবান অনুচরে পরিণত হন।)

স্বামীজীকে নিয়ে ইংল্যাণ্ডে এত হৈ চৈ লণ্ডনের ভারতীয় ছাত্র ও বাসিন্দাদেরও স্পর্শ করেছিল। তাঁরা 'লণ্ডন হিন্দু অ্যাসোসিয়েশন' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন এবং স্বামীজীকে তার সভাপতি মনোনীত করা হয়। এই সমিতির একটি অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্বও করেছেন। স্থানীয় ভারতীয় ছাত্ররা নানা বিষয়ে পরামর্শ করার জন্য তাঁর কাছে আসত।

তাহলে দেখা যাচেছ যে ধর্মমহাসভা উপলক্ষে আমেরিকায় পদার্পণ করা থেকে ১৮৯৭ সালে ভারত প্রত্যাবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকায় স্বামীজী ঝঞ্ঝার মত বিচরণ করেছেন। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং বিশ্ববিশ্রুত পণ্ডিত—অনেকের সংগেই এসময় তিনি কেবলমাত্র পরিচিতই হন নি—তাঁদের যথেষ্ট প্রভাবিতও করেছেন। রুশ দার্শনিক টলস্টয় এ সময় স্বামীজীর রচনার সংগে পরিচিত হয়ে প্রভাবিত হন। আমেরিকান দার্শনিক উইলিয়ম জেমস্, বিখ্যাত বিদ্যুৎ-বৈজ্ঞানিক নিকোলা টেসলা, বিখ্যাত জার্মান ভারততত্ত্ববিদ অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার, জার্মানীর কিয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ডয়সন, এডওয়ার্ড কার্পেণ্টার এবং আরও অনেক মনীষীর সংগে তাঁর পরিচয় ঘটে। বলা বাহুল্য, এই মনীষীরা এই তরুণ যুবসন্ন্যাসীর প্রতিভায় মুগ্ধ ও তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হন।

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারী 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রখ্যাত রাজনৈতিক নেতা বিপিনচন্দ্র পালের রচনা থেকে ইংল্যাণ্ডে স্বামীজীর প্রভাবের কথা জানা যায়। তিনি লিখছেন—"ভারতে কোনো-কোনো মহলে ধারণা আছে, ইংল্যাণ্ড এবং আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাবকে তাঁর বন্ধু-বান্ধবেরা অত্যন্ত অতিরঞ্জন করে দেখিয়েছেন। আমেরিকা সম্বন্ধে কিছু বলতে পারব না, কিন্তু ইংল্যাণ্ডে যথেষ্ট সংখ্যক মানুষ, তাঁর অনুগামী যদি

তাঁরা নাও হন—তাঁর কার্যাবলীর প্রতি অনুরাগসম্পন্ন। নানা জায়গায় অনেক মানুষের সংগে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে, যাঁরা তাঁর সম্বন্ধে অত্যন্ত উচ্চ ধারণা পোষণ করে থাকেন। আপনারা জানেন, আমি তাঁর সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত নই, এবং তাঁর সংগে আমার ক্ষেত্রবিশেষে তত্ত্বগত মতভেদও আছে। কিন্তু একথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে, প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রাদির মধ্যে সমুচ্চ অধ্যাত্ম-আদর্শ সম্বন্ধে এখানকার মানুষদের নয়ন ও হৃদয় উন্মুক্ত করে দিয়ে তিনি যথার্থ শ্রেয় কার্য করেছেন। ভারত ও ইংল্যান্ডের মধ্যে সম্পর্কের কতকগুলি স্বর্ণসূত্র তিনি যোজনা করেছেন। কিছুদিন আগে মিঃ হাউইস-লিখিত 'দি ডেড পুলপিট' নামক গ্রন্থ থেকে যে-উদ্ধৃতি পাঠিয়েছিলাম, সেটি আপনারা নিশ্চয় দেখেছেন। ওর মধ্যে তিনি বিবেকানন্দ-বাদের (Viveka-nandism) উল্লেখ করেছেন। গীর্জার আওতা থেকে যে-সব আন্দোলন লোকদের দূরে সরিয়ে দিচ্ছে, বিবেকানন্দ-বাদ তাদের অন্যতম, এবং বিবেকানন্দের কার্যাবলী কতকগুলি স্পষ্ট প্রত্যক্ষ ফলোৎপাদন করেছে—মিঃ হাউইস সেকথা বলেছেন।"

স্বামী বিবেকানন্দের এই সাফল্যে সমকালীন পত্র-পত্রিকাগুলি মেতে উঠেছিল। বিরাট অংশ জুড়ে প্রতিদিনই বিবেকানন্দ-সংবাদ। তাতে প্রশংসা-নিন্দা—দুই-ই ছিল। তাঁর সাফল্যে দেশজুড়ে নানা স্থানে অনুষ্ঠিত হয় প্রচুর সভা সমিতি—এ সবে অংশ গ্রহণ করেন দেশের প্রায় সকল গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং যুব-সম্প্রদায়। আমেরিকায় তাঁর কাছে পাঠান হয় অজস্র উচ্ছ্বসিত-প্রশংসাপত্র। জনৈক পত্র লেখক বোম্বাই-এর এক পত্রিকায় "বিবেকানন্দকে নিয়ে কেন এত মাতামাতি" শীর্ষক এক পত্রে লেখেন—"বিবেকানন্দই এখন একমাত্র আলোচ্য বিষয়। সবাই তাঁকে নিয়ে মেতে আছে। যদি কোন ব্যক্তি এখন বিবেকানন্দের প্রতি শ্রদ্ধাশীল না হন তাহলে সবার চোখে সে নিতান্তই বোকা বা আরও মন্দ কিছু।" স্বামীজীকে মাদ্রাজ থেকে একটি অভিনন্দন-পত্র পাঠান হয় এবং স্বামীজীও একটি অনবদ্য প্রত্যুত্তর পাঠান (দ্রঃ বাণী ও রচনা, ৫ম, পৃঃ ৪৪৬-৬৬)। স্বামীজী-অনুজ মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখছেন—"দুই চারিদিনের মধ্যে বক্তৃতাটি পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে শহরে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। কি ট্রামে, কি স্কুল-কলেজে, কি অফিসে—সর্বদিকে ঐ কথা। বাঙালী জাতির আত্মশক্তির বিকাশ হইতে লাগিল। জাতিগত ভাব,

জাতিগত ইচ্ছা, জাতিগত প্রাধান্যের ভাব জাগিয়া উঠিল। হাটে-বাজারে, এমনকি গঙ্গার ঘাটে স্ত্রীলোকদের ভিতরেও বাঙালী সন্ন্যাসীর কথা আলোচনা হইতে লাগল। একের বিজয় যেন সকলের বিজয় হইয়া উঠিল। এরূপ ভাব আর কখনও বাঙালী জাতির ভিতর দেখা যায় নাই। প্রত্যেক লোকের মধ্যে মহাবীরের ভাব উঠিতে লাগিল। সকলেই যেন বিশ্ববিজয়ী। এরূপ সাহসপূর্ণ উন্মাদনার বাণী বাঙালী পূর্বে শোনে নাই। শহরময় একটা গমগমে ভাব। এই সময় হইতে প্রকাশ্যে কেহ আর স্বামীজীর নিন্দা করিতে সাহস করিত না, কারণ তাহা হইলে যুবকগণের নিকট প্রহার খাইবার সম্ভাবনা ছিল। যুবকেরা তখন উত্তেজনায় অস্থির। অবিলম্বে বক্তৃতাটি সংস্কৃত শ্লোকসহ কালী-বেদান্তীর তত্ত্বাবধানে প্যামফ্লেটরূপে প্রকাশিত হইল। প্যামফ্লেটখানি খুব বিক্রয় হইতে লাগিল।”

নটসম্রাট গিরিশচন্দ্র ঘোষ স্বামীজীর এই সাফল্যকে 'মিরাকল্' বলে চিহ্নিত করে এর পশ্চাতে গুরু রামকৃষ্ণের শক্তি দেখতে পেলেন। প্রবীণরা বলতে লাগলেন—“নরেন যে সকলকে ছাপিয়ে উঠল! এখন যে বুদ্ধ-শঙ্করের দলে চলে গেল! সাধারণ লোকের হিসেবে আর রইল না!”

বস্তুতঃ, আমেরিকায় স্বামীজীর বিশ্ববিজয়ী সম্মানলাভ এবং বহির্বিশ্বে স্বামীজীর প্রচারকার্য ভারতীয় মুক্তি-আন্দোলনের ইতিহাসে কেবলমাত্র একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনাই নয়—ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটি যুগান্তর—একটি 'ল্যাণ্ডমার্ক'। মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, বিদেশে বেদান্ত প্রচার করে কিভাবে ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা আসতে পারে অথবা বিদেশে বেদান্ত প্রচারের কি সার্থকতা? দুটো জিনিস মনে রাখতে হবে—প্রথমতঃ ইংরেজ শাসনে দেশ স্থবির, জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট—দেশে সাম্প্রদায়িক অনৈক্য বিদ্যমান, জনমানসে ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতি বীর্যবত্তা—সব কিছু সম্পর্কেই একটা হীনমন্যতা বিদ্যমান; দ্বিতীয়তঃ, ইংরেজের অপপ্রচারের ফলে বিদেশে ভারতের ভাবমূর্তি কালিমালিপ্ত—বিদেশীদের চোখে ভারত তখন বর্বরের দেশ, এবং তাদের ধারণা ইংরেজের আগমনের ফলেই ভারতে সভ্যতার আলোক প্রবেশ করেছে। এই অবস্থায় ভারত যদি স্বাধীনতা চায় তবে সে নিশ্চয়ই

বিশ্বের সহানুভূতি পাবে না—যা যে কোন মুক্তিকামী জাতির পক্ষে অপরিহার্য। সুতরাং এমতাবস্থায় বিশ্বের সহানুভূতি লাভের জন্য বিদেশে ভারতের ঐতিহ্যশীল সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রচারের প্রয়োজন ছিল। বিশ্ব-ইতিহাসের পাতায় এ ধরণের অনেক নজির মিলবে। বিদেশে বিবেকানন্দের কীর্তি ভারতবাসীকে দিল গৌরব, ঐক্যবোধ এবং আত্মপ্রত্যয়, সুদৃঢ় হল জাতীয়তাবোধের ভিত্তি, প্রাণবন্ত হল দেশপ্রেম। বিদেশেও ভারত সম্পর্কে ধারণার পরিবর্তন হল। বহু বৎসরের চেষ্টায় ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতারা সমবেতভাবে যা করতে পারেন নি, বিবেকানন্দ একাই তা করলেন। এ সম্পর্কে ১লা সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪ সালের অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য: "He has done much more to elevate our nation in the estimation of the people of the West than what has hitherto been done by all our political leaders put together."

স্বামীজীর ভাবশিষ্য বঙ্গীয় বিপ্লববাদের প্রধান পুরোহিত ও ঋত্বিক শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ বলেন—"বিবেকানন্দের সম্বন্ধে তাঁর গুরু বলেছিলেন, তিনি জগৎকে দুহাতে ধরে বদলে দেবার মত শক্তিধর পুরুষ, সেই বিবেকানন্দের যাত্রা জগৎ সমক্ষে প্রথম প্রকাশ্যে দেখিয়ে দিল, ভারত জেগেছে—শুধু বেঁচে থাকার জন্য নয়—জয় করার জন্য সে জেগেছে।"

প্রখ্যাত বাঙালী মনীষী বিনয়কুমার সরকার আমেরিকা-ইওরোপে স্বামীজীর এই সাফল্যকে 'দিগ্বিজয়' আখ্যায় ভূষিত করেছেন। তাঁর মতে বিবেকানন্দের মাধ্যমেই "ভারতের নরনারী দিগ্বিজয়ের নেশায় মাতোআরা হলো। বর্তমান যুগের ভারতবাসীর কাছে দিগ্বিজয় একদম নয়া চিজ্।" (বিনয় সরকারের বৈঠকে, প্রথম ভাগ, হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য, ১৯৪৪, পৃঃ ১৮৮)। স্বামীজীর শিকাগো বক্তৃতায় তিনি ১৯০৫ সালের স্বদেশী আন্দোলন বা 'বঙ্গবিপ্লবের' সূত্রপাত লক্ষ্য করছেন। তিনি বলছেন, যে ১৯০৫ সালের বঙ্গবিপ্লবের মধ্যে "দেখলাম—দিগ্বিজয়ের ঝাণ্ডা খাড়া করে দাঁড়িয়ে আছেন বিবেকানন্দ। সেই দিগ্বিজয়ের সূত্রপাত বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতা (১৮৯৩)। আমার বিচারে সেই বৎসরই সুরু হল বিবেকানন্দ-যুগ। ১৮৯৩ হচ্ছে ১৯০৫-এর আত্মিক পূর্বপুরুষ।" (ঐ, পৃঃ ২৩১)।

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর লণ্ডন ত্যাগ করে ইটালী হয়ে দীর্ঘ চার বছর পর তিনি ভারত অভিমুখে যাত্রা করলেন—তাঁর সংগী ইংরেজ শিষ্য সেভিয়ার-দম্পতি এবং গুডউইন। ৩০-এ ডিসেম্বর নেপলস্ থেকে জাহাজ ছাড়ল—গন্তব্যস্থান সিংহলের কলম্বো।

দীর্ঘদিন পাশ্চাত্যে থেকে মানুষের সঙ্গে একাত্মভাবে মিশে স্বামীজী দেখেছেন অনেক কিছু, শিখেছেন আরও বেশী। পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, সংগঠনশক্তি এবং অদম্য উৎসাহ প্রভৃতিকে কাজে লাগিয়ে দরিদ্র ভারতের দরিদ্রতম জনসাধারণকে জাগাতে হবে—গড়ে তুলতে হবে সোনার ভারত। এ কাজে তাঁর সহায়ক হবে ভারতের যুব-শক্তি। এই হল সেদিন স্বামীজীর ধ্যান-জ্ঞান-চিন্তা।

দুঃখ-দারিদ্র্য কণ্টকিত ভারতই ছিল তাঁর দেবতা। লণ্ডন ত্যাগের পূর্বে জনৈক ইংরেজবন্ধু তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন—"বিলাসপূর্ণ ঐশ্বর্যশালী ও শক্তিমান পাশ্চাত্ত্য দেশে চার বছর বাসের পর এখন আপনার মাতৃভূমি আপনার কাছে কেমন লাগবে?"

উত্তরে স্বামীজী বলেছিলেন—"দেশ ছেড়ে আসবার আগে আমি ভারতকে ভালবাসতাম; এখন ভারতের প্রতি ধূলিকণা পর্যন্ত আমার কাছে পবিত্র, ভারতের বায়ু পর্যন্ত পবিত্র; ভারত এখন পুণ্যভূমি—তীর্থক্ষেত্র।"

বস্তুত সেদিন ভারতপ্রেমে বিভোর স্বামীজী—দুঃখ-দারিদ্র্যক্লিষ্ট ভারতের সব কিছুর প্রতিই তাঁর সেই প্রাণভরা ভালবাসা। এই ভালবাসাই তাঁকে প্ররোচিত করে বজ্রমুষ্টিতে দুর্বিনীত নিন্দুক মিশনারীর জামার কলার ধরে তাঁকে জাহাজ থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেবার জন্য—আবার এই ভালবাসার জন্য ভয় দেখাতে এডেন বন্দরে ভারতীয় পানওয়ালাকে দেখে এই বিশ্বজয়ী বীর স্বীয় মর্যাদা ভুলে রাস্তার ধারে তার পাশে বসে গল্প জুড়ে দিয়ে তার ছিলিমে তামাক খান।

এই বুকভরা ভালবাসা নিয়ে স্বদেশ ভারতভূমির দিকে এগিয়ে চললেন তিনি, সেখানে শক্তিশালী এক বিস্ফোরণের মতো ফেটে পড়ার জন্য।

৩

যুব-সন্ন্যাসী : যুব জাগরণ

একদিন আমেরিকার ডেট্রয়েটে বিশেষ এক মুহূর্তে কয়েকজন শিষ্যের সামনে গভীর ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে স্বামীজী চীৎকার করে বলে ওঠেন— "ভারতকে শুনতেই হবে আমার কথা! ভারতকে আমি মূল ধরে নাড়া দেব! আমি বিদ্যুৎ-শিহরণ এনে দেব জাতির ধমনীতে। দাঁড়াও, দেখবে, ভারত কিভাবে আমাকে বরণ করে নেয়। ও হল ভারত, ও হল আমার ভারত! ও ভারত জানে, আমি বুকের রক্ত তুলে কী দিয়ে গেলাম এখানে। বেদান্তকে বিলিয়ে গেলাম মুক্ত হাতে। আমার ভারত জানে, কিভাবে সমাদর জানাতে হয়। ভারত জয়ধ্বনি তুলে আমাকে গ্রহণ করবে।"

সত্যিই তাই—স্বামীজীর ভারত-প্রত্যাবর্তনে বিদ্যুৎ-শিহরণ বয়ে গিয়েছিল জাতির ধমনীতে, ভারতবাসী এই বীর সন্তানকে বরণ করেছিল মহামহিম বিজয়ী সেনাপতিরূপে, সেদিন আসমুদ্রহিমাচল ভ্রমণ করে সত্যিই তিনি ভারতের মূলে এক প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়েছিলেন—জেগে উঠেছিল পরাধীনতার নাগপাশে জর্জরিত হৃতসর্বস্ব ক্ষীয়মাণ মুমূর্ষু জাতি। ভারত-ইতিহাসে শুরু হয়েছিল এক নবযুগের—বিবেকানন্দ তাঁর স্রষ্টা—নবযুগের প্রফেট—মুক্তিদাতা মহাপুরুষ। যুব সমাজ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বরণ করেছিল এই মহানায়ককে, প্রতিষ্ঠিত করেছিল হৃদয়-রাজ্যের স্বর্ণ-সিংহাসনে, শপথ নিয়েছিল তাঁর আদর্শকে বাস্তবায়িত করার —গড়ে তুলেছিল এক মহাজাতি। তাদের নেতা—সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারী স্বামীজীর জাহাজ কলম্বো পৌঁছোল— তাঁর সংগে আছেন সেভিয়ার-দম্পতি ও গুডউইন। সেখানে বিপুল সম্বর্ধনা অপেক্ষা করছিল এ বিজয়ী বীরের জন্য। তাঁকে সম্বর্ধনা জানাবার জন্য কলম্বোর পদস্থ ব্যক্তিদের নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়েছিল। কমিটির মুখপাত্র হিসেবে কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তি জাহাজে উঠে স্বামীজীকে অভিনন্দন জানান। তারপর তিনি একটি লঞ্চে উঠে জেটির দিকে আসতে থাকেন। জাহাজ-ঘাটে উপস্থিত হাজার হাজার মানুষ। লঞ্চ যতই এগিয়ে আসছে, ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে জনতার কলরব ও আনন্দোচ্ছ্বাস—সমুদ্র-গর্জনও পরাজিত হয় তার কাছে।

জাহাজ-ঘাটে তাঁকে মাল্যদান করে অভ্যর্থনা জানান হল। সংবাদপত্রের বিবরণ —"তার পরেই আবেগে ভেঙ্গে পড়ল জনতা।… কোন শক্তিতেই সেই বিশাল জনতাকে ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হল না। পাগলের মত তারা টুপি, রুমাল, ছাতা ইত্যাদি আকাশে ছুঁড়তে লাগল।" অপেক্ষমাণ ঘোড়ার গাড়ীতে করে কয়েকটি সুসজ্জিত তোরণ পার হয়ে স্বামীজীকে নিয়ে যাওয়া হল অনবদ্য-সাজে সজ্জিত সভাস্থলে। জনতা ছুটল সেদিকে—পথের সুসজ্জিত তোরণ এবং অন্যান্য সাজ-সজ্জার দিকে তাদের দৃষ্টি নেই—প্রতিটি মানুষ চাইছে বিশ্বজয়ী এই যুবা-সন্ন্যাসীর কাছে পৌঁছে তাঁকে ভালভাবে দর্শন করতে। জনতার প্রচণ্ড চাপে সাজ-সজ্জার অনেক কিছুই ভেঙ্গে পড়ল। আনুষ্ঠানিক সংগীত স্তোত্রপাঠ ও অভিনন্দনের পর "কর্ণবধিরকারী হর্ষধ্বনির মধ্যে স্বামীজী উঠে দাঁড়ালেন এবং নিজস্ব ভঙ্গীতে বাগ্মিতাপূর্ণ হৃদয়গ্রাহী ভাষায় অভিনন্দনের উত্তর দিলেন। তাঁর কথাগুলি অতি সরল ও সুস্পষ্ট হলেও বিরাট জনতার মনে তা গভীর আলোড়ন তুলল।"

সম্বর্ধনার উত্তরে এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে তিনি বললেন যে, তিনি কোন সেনাপতি রাজা বা ধনী—কিছুই নন। এ সত্ত্বেও তাঁর মত এক ভিক্ষুক সন্ন্যাসীকে সম্বর্ধনা জানান হয়েছে নিশ্চয়ই তাঁর আধ্যাত্মিকতার জন্য। জনসাধারণকে তিনি বললেন যে, আধ্যাত্মিকতাই সব এবং তাঁরা যেন এই আধ্যাত্মিকতাকে আঁকড়ে ধরে থাকেন।

এখানে যে-কয়দিন স্বামীজী ছিলেন তাঁর বাসস্থানে সর্বদাই জনস্রোত, রাস্তায় বেরোলে ঠিক সেই একই অবস্থা—পথে বার বার তাঁর গাড়ী থামিয়ে জনতা তাঁকে সম্বর্ধনা জানাচ্ছে। কলম্বোয় প্রিন্সেপ হল ও কলম্বো পাবলিক হলে বিশাল জনসমাগমের মধ্যে তিনি ভাষণ দেন এবং ভারতের অতীত ঐতিহ্যকে তুলে ধরে 'পুণ্যভূমি ভারত'-এর আধ্যাত্মিকতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

কলম্বো থেকে ট্রেনে কাণ্ডি এবং তারপর ঘোড়ার গাড়ীতে করে তিনি জাফনার দিকে রওনা হন। সর্বত্রই সম্বর্ধনা আর অভিনন্দনের ঢেউ। জাফনায় তিনি পেলেন রাজোচিত সম্মান। শুনলে আশ্চর্য লাগে—জাফনা শহরের বারো মাইল দূরে থেকে শুরু হয়েছে এই সম্বর্ধনা। সেখানে উপস্থিত শহরের সব গণ্যমাণ্য মানুষ। শহরের প্রতিটি পথ, প্রতিটি বাড়ী যেন তাঁর সম্মানে

সুসজ্জিত। সন্ধ্যার দৃশ্য অপরূপ—মশাল শোভাযাত্রসহ তাঁকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সভাস্থলে—উৎসাহে ফেটে পড়েছে সারা পথ—স্বামীজীর পেছনে ছুটছে অন্ততঃ দশ থেকে পনেরো হাজার মানুষ। ২৩-এ জানুয়ারী হিন্দু কলেজ প্রাঙ্গণে বিশাল শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে বেদান্ত সম্পর্কে ভাষণ দানকালে তিনি বলেন—"আমাদের দেশে এখন আর কাঁদিবার সময় নাই—এখন কিছু বীর্যের আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।……অতি শৈশবাবস্থা হইতেই তোমাদের সন্তানগণ তেজস্বী হউক, তাহাদিগকে কোনরূপ দুর্বলতা, কোনরূপ বাহ্য অনুষ্ঠান শিক্ষা দিবার প্রয়োজন নাই। তাহারা তেজস্বী হউক, নিজের পায়ে দাঁড়াক, —সাহসী সর্বংসহ হউক।" (৫.২৬-২৭)।

স্বামীজীর আগমনে সিংহলে এক অভূতপূর্ব উন্মাদনা দেখা দেয়। কেবলমাত্র শহরেই নয়—সিংহলের দূর-দূরান্তবর্তী গ্রামগুলিতেও সেদিন অভূতপূর্ব এক উন্মাদনা। বিভিন্ন শহর থেকে কেবল আগ্রহপূর্ণ টেলিগ্রাম আর চিঠি আসছে—সকলেরই ইচ্ছা স্বামীজী তাদের শহরে যান। কিন্তু স্বামীজীর হাতে সময় কম। এছাড়া, পথশ্রমে তিনি ক্লান্ত। তাঁর জনৈক সহযাত্রী লিখছেন যে, আর কিছুদিন সিংহলে থাকলে লোকের শ্রদ্ধাভক্তি ও অনুরাগের চোটে তিনি মারা যেতেন।

২৫-এ জানুয়ারী মধ্যরাত্রে সিংহল ত্যাগ করে পরদিন (২৬-এ জানুয়ারী, ১৮৯৭) তিনি ভারতের দক্ষিণ-প্রান্তে পাম্বান দ্বীপে পেঁছোলেন—দীর্ঘদিন পর ভারতভূমিতে পদার্পণ করলেন বিশ্বজয়ী বীর—সেদিন তাঁর বয়স মাত্র চৌত্রিশ বছর। রামনাদ-রাজ সুসজ্জিত এক রাজকীয় নৌকা নিয়ে স্বামীজীকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য প্রস্তুত। সহস্র সহস্র মানুষের হর্ষধ্বনির মধ্যে পাত্র-মিত্র-সহ সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে স্বামীজীকে তিনি অভ্যর্থনা জানালেন। জেটির নীচে অনুষ্ঠিত সভায় অভিনন্দনের উত্তরে নবযুগের বার্তাবাহক স্বামীজী ঘোষণা করেন যে, ভারত কখনই হীনবীর্য বা নিষ্কর্মা নয়—ভারতবর্ষ যে কোন দেশের অপেক্ষা কর্মপরায়ণ।

সভাশেষে একটি খোলা ঘোড়ার গাড়ীতে করে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট বাংলোয় তাঁকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে—পেছনে রাজামাত্যগণ। রাজা এতেও সন্তুষ্ট নন। রাজার নির্দেশে ঘোড়া খুলে নেওয়া হল—রাজার সংগে জনতা প্রবল উৎসাহে এক মাইল দূরের সেই বাংলোয় স্বামীজীর গাড়ী টেনে নিয়ে চলল। স্বামীজী

এখানে তিনদিন ছিলেন। তাঁর কাছে সর্বদাই নগরবাসীদের ভীড়। তাঁরা স্বামীজীর কাছে এসে নানা বিষয়ে আলোচনা করতেন। পাম্বানে অবস্থানের দ্বিতীয় দিনে তিনি রামেশ্বরের মন্দিরে যান। সেখানেও তাঁকে এক বিরাট সম্বর্ধনা জানান হয়। জনতার অনুরোধে প্রদত্ত এক ভাষণে তিনি চিত্তশুদ্ধি ও দরিদ্রের সেবার কথা বলেন।

২৯-এ জানুয়ারী স্বামীজী পাম্বান থেকে রামনাদের রাজধানী রামনাদ নগরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সন্ধ্যা ছ'টায় তিনি রামনাদ পেঁাছোন। হাজার হাজার মানুষের জয়োল্লাস, মুহুর্মুহু কামানের গর্জন এবং আতসবাজীর শব্দ ও আলোর দ্বারা স্বামীজী অভিনন্দিত হলেন—বিলিতি ব্যাণ্ডে তখন বাজছে 'হের ঐ আসিতেছে বিজয়ী মহাবীর' সংগীতটি। শহরের বিশিষ্ট নাগরিকদের সংগে স্বামীজীর পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল। তারপর রাজার দেহরক্ষী বাহিনী দ্বারা পরিবেষ্টিত একটি ঘোড়ার গাড়ীতে করে বিরাট শোভা-যাত্রা-সহ স্বামীজীকে তাঁর বাসস্থানের দিকে নিয়ে যাওয়া হল। রাস্তার দু-পাশে অগণিত মশাল, ব্যাণ্ডে 'হের ঐ আসিতেছে বিজয়ী বীর' গানের সুর—শোভাযাত্রার পুরোভাগে স্বয়ং নগ্নপদ রামনাদ-রাজ। 'শঙ্কর বিলাস' ভবনে কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর স্বামীজীকে নিয়ে যাওয়া হল সভাস্থলে।

হাজার হাজার মানুষের হর্ষধ্বনির মধ্যে স্বামীজী সভাস্থলে প্রবেশ করলেন। রামনাদবাসীর অভিনন্দনের উত্তরে নবযুগের প্রফেট স্বামী বিবেকানন্দ মানুষকে শোনালেন নতুন কথা—আশার কথা—জাগরণের কথা—"সুদীর্ঘ রজনী প্রভাতপ্রায় বোধ হইতেছে। মহাদুঃখ অবসানপ্রায় প্রতীত হইতেছে। মহানিদ্রায় নিদ্রিত শব যেন জাগ্রত হইতেছে।.... ..অন্ধ যে, সে দেখিতেছে না; বিকৃত-মস্তিষ্ক যে, সে বুঝিতেছে না—আমাদের এই মাতৃভূমি গভীর নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া জাগ্রত হইতেছেন। আর কেহই এখন ইহার গতিরোধে সমর্থ নহে, ইনি আর নিদ্রিত হইবেন না—কোন বহিঃশক্তিই এখন আর ইঁহাকে দমন করিয়া রাখিতে পারিবে না। কুম্ভকর্ণের দীর্ঘনিদ্রা ভাঙিতেছে।" (৫৩৮)। ভারতমাতার জয়গান গেয়ে জাতিকে তিনি সেদিন নিজ ধর্ম ও ঐতিহ্য বজায় রেখে পাশ্চাত্য বহির্বিজ্ঞান শিক্ষা করে কঠোর পরিশ্রমের আহ্বান জানিয়ে বললেন—"হে ভ্রাতৃবৃন্দ, আমাদের সকলকেই এখন কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে, এখন ঘুমাইবার সময় নহে। আমাদের কার্যকলাপের

উপরই ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। ঐ দেখ, ভারতমাতা ধীরে ধীরে নয়ন উন্মীলন করিতেছেন। তিনি কিছুকাল নিদ্রিতা ছিলেন মাত্র। উঠ, তাঁহাকে জাগাও—আর নূতন জাগরণে নূতন প্রাণে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর গৌরবমণ্ডিতা করিয়া ভক্তিভাবে তাঁহাকে তাঁহার শাশ্বত সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত কর।" (ঐ, পৃঃ ৪৭)। জাতিকে সাবধান করে দিয়ে তিনি বললেন— "জগতে যদি কিছু পাপ থাকে, তবে দুর্বলতাই সেই পাপ। সর্বপ্রকার দুর্বলতা ত্যাগ কর—দুর্বলতাই মৃত্যু, দুর্বলতাই পাপ।" (ঐ, পৃঃ ৪৪)।

রামনাদের পর পরমকুড়ি, মনমাদুরা এবং মাদুরা—সর্বত্রই একই চিত্র। হাজার হাজার মানুষের শোভাযাত্রা উল্লাস অভিনন্দন মানপত্র এবং স্বামীজীর জাগরণী মন্ত্র। মাদুরা থেকে তিনি সন্ধ্যায় ট্রেনে কুম্ভকোণমের দিকে যাত্রা করেন। প্রচণ্ড শীতের রাতে প্রতি স্টেশনেই অগণিত মানুষ, মানপত্র আর স্বামীজীর সংক্ষিপ্ত ভাষণ। সবার অনুরোধ স্বামীজীকে নেমে তাঁদের সংগে দু-চারদিন থাকতে হবে। ভোর চারটের সময় ত্রিচিনপল্লীতে ট্রেন থামল। হাজারের বেশী মানুষ সেখানে উপস্থিত। স্বামীজীকে সেখানে নামাবার জন্য সব রকম চেষ্টাই করা হল, স্থানীয় ছাত্ররা লিখিত আবেদন জানাল—কিন্তু তাঁর পক্ষে আর অপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না। সুতরাং স্টেশনেই বসল সম্বর্ধনা সভা। এখানেই ত্রিচিনপল্লীর জাতীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের পরিচালক সভা এবং ছাত্ররা পৃথকভাবে তাঁকে অভিনন্দন জানান।

এর পরের সম্বর্ধনা তাঞ্জোরে। খবর ছিল যে, স্বামীজীর ট্রেন সন্ধ্যেয় তাঞ্জোর পৌঁছাবে। বিরাট জনতা-পরিবৃত হয়ে শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা মানপত্র হাতে নিয়ে স্টেশনে দণ্ডায়মান। ট্রেন এল, কিন্তু তাতে স্বামীজী নেই। গণ্যমান্য ব্যক্তিরা ফিরে গেলেন—ঠকবার ভয়ে দ্বিতীয়বার তাঁরা আর স্টেশনে এলেন না। জনতা বসে রইল—তারাই ভোরবেলায় স্বামীজীকে সম্বর্ধনা জানাল।

স্বামীজী বিশ্রামের জন্য তিনদিন কুম্ভকোণমে ছিলেন, কিন্তু বিশ্রাম এখানে মেলেনি। স্বামীজীকে কেন্দ্র করে এখানেও মানুষের বিপুল উদ্দীপনা ও আনন্দোৎসব। কুম্ভকোণমের হিন্দুসমাজ ও ছাত্রদের পক্ষ থেকে তাঁকে যে অভিনন্দন দেওয়া হয়, তার উত্তরে তিনি বেদান্ত সম্পর্কে এক দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতায় তিনি আত্মবিশ্বাস, দরিদ্রের সেবা, ধর্মীয় নিষ্ঠা,

দেশপ্রেম ও গৌরবোজ্জ্বল অতীতের কথা তুলে ধরে বলেন—"তোমাদিগকে কেবল ইহাই স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, আমাদের এই মহান্ জাতীয় অর্ণবপোত শত শত শতাব্দী যাবৎ হিন্দুজাতিকে পারাপার করিতেছে। সম্ভবত আজকাল উহাতে কয়েকটি ছিদ্র হইয়াছে—হয়তো উহা কিঞ্চিৎ জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। যদি তাহাই হইয়া থাকে, তবে আমাদের ভারতমাতার সকল সন্তানেরই এই ছিদ্রগুলি বন্ধ করিয়া পোতের জীর্ণসংস্কার করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করা উচিত। আমাদের স্বদেশবাসী সকলকে এই বিপদের কথা জানাইতে হইবে—তাহারা জাগ্রত হউক, তাহারা এদিকে মনঃসংযোগ করুক। আমি ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত উচ্চৈঃস্বরে দেশবাসীকে ডাকিয়া জাগ্রত করিব, নিজেদের অবস্থা বুঝিয়া কর্তব্য সাধন করিতে আহ্বান করিব। ......"স্বদেশহিতৈষী হও—যে-জাতি অতীতকালে আমাদের জন্য এত বড় বড় কাজ করিয়াছে, সেই জাতিকে প্রাণের সহিত ভালবাসো। আমার স্বদেশবাসিগণ! যতই আমাদের জাতির সহিত অপর জাতির তুলনা করি, ততই তোমাদের প্রতি আমার অধিকতর ভালবাসার সঞ্চার হয়।" (৫।৮৮-৮৯)।

কুম্ভকোণম থেকে ট্রেনে মহানায়ক চলেছেন মাদ্রাজের দিকে। স্টেশনে-স্টেশনে জনতার উল্লাস অভিনন্দন মানপত্র। মাদ্রাজের আগে একটি ছোট স্টেশন—সেখানে ট্রেন থামবার কথা নয়। সমাগত জনতা স্টেশন-মাস্টারকে ট্রেন থামাবার অনুরোধ করল। তিনি অক্ষম। শত শত মানুষ রেললাইনের ওপর শুয়ে পড়ল—প্রতিভাদীপ্ত এই সন্ন্যাসীকে হয় তারা দেখবে, না হয় মৃত্যুকে বরণ করবে। গার্ড ট্রেন থামাতে বাধ্য হলেন। জনতা ছুটল স্বামীজীর কামরার দিকে। স্বামীজী হাত তুলে জনতাকে আশীর্বাদ জানালেন। ট্রেন চলতে লাগল মাদ্রাজের দিকে।

স্বামীজীর আগমনকে কেন্দ্র করে সমগ্র মাদ্রাজে—বিশেষতঃ যুবসমাজের মধ্যে প্রবল ঝড় বয়ে গিয়েছিল। চার বছর আগে স্বামীজীর প্রথম মাদ্রাজ আগমনের সময় তাঁকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল একটি যুবদল। এই যুবকরা সেদিন ছায়ার মত অনুসরণ করতেন তাঁকে, এই যুবকরাই সেদিন স্বামীজীর বিদেশযাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে দরজায় দরজায় ভিক্ষা করেছিলেন, এই যুবকদের উদ্দেশ্যেই স্বামীজী বিদেশ থেকে একের পর এক পত্র লিখে তাঁদের কর্মসমুদ্রে ঝাঁপ দেবার আহ্বান জানিয়েছেন। বছরের পর

বছর তাঁদের উদ্দেশ্যে লিখিত স্বামীজীর পত্রগুলি তো বিদ্যুৎ-শিহরণ—এই পত্রগুলি পাঠ করলে কাপুরুষও বীর হয়ে ওঠে, স্বার্থপর উদার হয়, খঞ্জ সোজা হয়ে দাঁড়ায়, রোগজর্জর মুমূর্ষু ব্যক্তি নবজীবনের স্বাদ লাভ করে। মাদ্রাজ চঞ্চল—চঞ্চল মাদ্রাজের যুবমানস। তাঁদের জীবন-দেবতা দেশনায়ক যুগনায়ক—নবযুগের প্রফেট স্বামীজী আসছেন। তাঁকে রাজকীয়-সম্বর্ধনা দেবার জন্য প্রস্তুত মাদ্রাজ।

তাঁকে সম্বর্ধনা জানাবার উদ্দেশ্যে শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়। সারা শহরে সেদিন সাজো সাজো রব। পথ-ঘাট এবং প্রতিটি গৃহ সেদিন নানা পত্র-পুষ্প ও পতাকায় সজ্জিত। স্টেশন থেকে দু'মাইল দূরে স্বামীজীর জন্য নির্দিষ্ট বাসস্থান ক্যাসল কার্নানের মধ্যে সতেরোটি সুদৃশ্য তোরণ নির্মিত হয়। নানা স্থানে বড় বড় অক্ষরে লেখা—'পূজনীয় বিবেকানন্দ দীর্ঘজীবী হউন', 'স্বাগত হে ভগবৎসেবক', 'প্রবুদ্ধ ভারতের হার্দিক সম্বর্ধনা', 'স্বামী বিবেকানন্দ সুস্বাগত', 'এস শান্তির অগ্রদূত' প্রভৃতি কথা। নানা স্থানে স্বামীজীর সম্বর্ধনা সম্পর্কে 'হিন্দু' পত্রিকা লিখছে—"ভারতের নানা স্থানে স্বামী বিবেকানন্দকে স্বাগত জানাবার জন্য বিরাট আয়োজন চলছে। কলকাতা অবধি তাঁর যাত্রা এবং তারপরে হিমালয়ে বিশ্রাম-প্রস্থান—এই সমস্তই এমন ধারাবাহিক সংবর্ধনার দ্বারা চিহ্নিত হবে—শাসককুল, এমনকি ভাইসরয়ের ভাগ্যেও তা কদাচিৎ ঘটে।"

তাঁর আগমনকে কেন্দ্র করে মাদ্রাজে কি ধরনের উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছিল তার বিবরণ মিলবে তৎকালীন সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায়। 'মাদ্রাজ টাইমস্' লিখছে—"গত কয়েক সপ্তাহ ধরে মাদ্রাজের হিন্দু জনসাধারণ ব্যাকুল আগ্রহে বিশ্ব-বিশ্রুত হিন্দুসন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের আগমনের জন্য প্রত্যাশা করে আছে। এখন প্রত্যেকের মুখে কেবল তাঁর নাম, এ ছাড়া আর কিছু নেই। স্কুল, কলেজ, হাইকোর্ট, পথ-ঘাট, বাজার, সমুদ্রের ধারে বেড়াবার জায়গা, সর্বত্র শত-শত উৎসুক মানুষ কেবলই পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করছে—স্বামীজী কখন আসছেন? কখন আসছেন? মফস্বল থেকে বিরাট সংখ্যক ছাত্র বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষা দেবার জন্য এখানে এসেছিল, স্বামীজীকে দেখবার জন্য তারা থেকে গেছে, যদিও তার ফলে হোটেলের বিল বাড়ছে এবং বাপ-মা অবিলম্বে ফিরবার জন্য জরুরী তাগাদা পাঠাচ্ছেন।......চার বছর পূর্বে

স্বামীজী যখন এখানে আসেন তখন তিনি ছিলেন অজ্ঞাতপরিচিত সাধারণ মানুষ।......তখন এখানে এমন কয়েকজন শিক্ষিত যুবক ছিলেন যাঁদের দৃষ্টি ছিল সুতীক্ষ্ণ এবং তাঁরা তখনই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, ঐ মানুষটির মধ্যে এমন একটা কিছু আছে, এমন একটা শক্তি আছে যা তাঁকে অন্য সকলের ঊর্ধ্বে স্থাপন করবে এবং তিনি হয়ে উঠবেন মানবসমাজের নেতা। এই তরুণ দলকে সেদিন 'বিভ্রান্ত-ভাবুক' 'স্বাপ্নিক পুনরুত্থানবাদী' বলে অবজ্ঞা করা হয়েছিল—আজ তাঁদের তৃপ্তি এই দেখে যে, তাঁদের স্বামীজী ইউরোপে ও আমেরিকায় অর্জিত প্রভূত সুখ্যাতি নিয়ে তাঁদের কাছে ফিরে আসছেন। এই যুবকরা তাঁকে 'আমাদের স্বামীজী' বলে উল্লেখ করতেই ভালবাসে।"

৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৭ স্বামীজী মাদ্রাজ শহরে এসে পৌঁছোলেন। মাদ্রাজেই তিনি পেলেন জীবনের সর্ববৃহৎ সম্বর্ধনা। সকাল থেকেই মাদ্রাজ নগরী আনন্দোৎসবে মেতেছিল। হাজার হাজার মানুষ হাতে পতাকা ও ফুল নিয়ে চরম আনন্দ ও উচ্ছ্বাসের সংগে চলেছে স্টেশনের দিকে। কানায় কানায় পূর্ণ সেদিন স্টেশন-প্ল্যাটফর্ম। স্টেশনে ট্রেন ঢোকামাত্র বজ্রনির্ঘোষ তুলে চীৎকারে ফেটে পড়ল জনতা। 'মাদ্রাজ টাইমস' লিখছে—"মাদ্রাজের হিন্দু-সমাজের সর্বশ্রেণীর লোক, সকল বয়সের ও পদমর্যাদার লোক, এমনকি মহিলারাও, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুরা, কলেজের বয়ঃপ্রাপ্ত ছাত্ররা, ব্যবসায়ী উকিল বিচারক—যত বৃত্তি ও অবস্থার মানুষ সম্ভব, সবাই স্বামীজীকে অভ্যর্থনা জানাতে স্টেশনে গেছে।......এগমোর স্টেশন-প্ল্যাটফর্মে স্থান সীমাবদ্ধ, স্পেশাল-টিকিটধারীরাই ঢুকতে পারে, সে টিকিট বিক্রীও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তখন এগমোর থেকে বীচ স্টেশন যাবার আধ আনা দামের টিকিট কেটে কৌশলে লোক ঢুকতে লাগল। সমস্ত প্ল্যাটফর্ম কানায়-কানায় ভর্তি। স্বামীজীর আসার সময় যত এগিয়ে আসতে লাগল, জনতা ক্রমেই তত অস্থির, প্রায়ই ভীড়ের চাপ এধার ওধার নড়তে লাগল। জনতার মধ্যে মাদ্রাজের সুপরিচিত ব্যক্তিদের কেউই বাদ পড়েননি। ৭-৩০ নাগাদ ট্রেন এল। দক্ষিণ-প্ল্যাটফর্মের গায়ে ট্রেন থামা-মাত্র জনতা উল্লাসধ্বনিতে আকুল হয়ে উঠে প্রবল করতালি দিতে লাগল। ব্যাণ্ডে বেজে উঠল উল্লাসপূর্ণ ভারতীয় সংগীত। স্বামীজী গাড়ী থেকে নামলে অভ্যর্থনা সমিতি তাঁকে সম্বর্ধনা জানাল।"

স্বামীকে স্টেশনের বাইরে আনা হল। জনসংখ্যা ইতিমধ্যে আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। দু'টি শ্বেত অশ্ব স্বামীজীর গাড়ী টানছে—পেছনে গাড়ীর সারি। শোভাযাত্রা একটু পর পরই থামছে—অভিনন্দন পত্র নারকেল পান-সুপারী বা পুষ্পার্ঘ্য দেওয়া হচ্ছে তাঁকে। জনতরঙ্গ উপচে পড়ছে বার বার। পথের ধারে বাড়ীর জানালা ছাদ, গাছ—সর্বত্রই শুধু মানুষ আর মানুষ। নানা স্থানে মহিলারা ধূপ দীপ কর্পূর ও পুষ্পধারা বার বার আরতি করছেন স্বামীজীকে। স্বামীজীর ওপর চলছে পুষ্পবৃষ্টি। সাউথ বীচ রোডে গাড়ী পৌঁছোলে স্বামীজীর আপত্তি সত্ত্বেও ছাত্ররা তাঁর গাড়ীর ঘোড়া খুলে নিজেরাই তা টানতে শুরু করল। মাদ্রাজ টাইমস লিখছে—"অতি প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত মাদ্রাজ, ভারতীয় বা ইউরোপীয়, মানুষকে এমন সর্বাত্মক জনপ্রিয় সোৎসাহ সম্বর্ধনা জানায় নি।......মাদ্রাজের অতি বৃদ্ধ কোন মানুষ স্মরণ করতে পারবে না—এর থেকে আন্তরিক, এর থেকে অধিক জনপূর্ণ, এর থেকে কালের ইঙ্গিতবাহী কোন সম্বর্ধনা পূর্বে অনুষ্ঠিত হয়েছে। আমরা সাহস ভরে বলতে পারি, আজকের এই সম্বর্ধনা বর্তমানের মানুষের চিত্তে অক্ষয় হয়ে থাকবে।"

মাদ্রাজে তিনি নয়-দিন ছিলেন। এ ক' দিন তাঁর বিশ্রামের কোন সুযোগ ছিল না। তাঁর বাসস্থান সর্বদাই জনসমাগমে পূর্ণ। এ ছাড়া, মানপত্র ও অভিনন্দনের উত্তর ব্যতীত মাদ্রাজে তিনি পাঁচটি বক্তৃতা দেন। ৭ই ফেব্রুয়ারী ভিক্টোরিয়া হলে তাঁকে সম্বর্ধনা জানান হয়। সমগ্র মাদ্রাজ সেদিন ভিক্টোরিয়া হলে ভেঙে পড়েছে। সভাকক্ষ কানায় কানায় পূর্ণ—জনতরঙ্গ বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছে। বহু কষ্টে তিনি হলের মধ্যে প্রবেশ করলেন। একের পর এক তাঁকে চব্বিশটি মানপত্র দেওয়া হল।

স্বামীজী উত্তর দিতে উঠে দেখলেন যে, বক্তৃতা করা অসম্ভব কারণ কয়েক হাজার মানুষ বাইরে দাঁড়িয়ে আছে—তাদের দাবি খোলা মাঠে সভা হোক।

মহানায়ক বললেন—"যে-অধিকাংশ লোক যথার্থই তাদের হৃদয়ের অভিনন্দন দিতে এসেছে, তারা বাইরেই রয়ে গেছে। আমি জনগণের ভেতর থেকে এসেছি, আমি জনগণের জন্যই প্রচারক, আমি জনগণেরই কর্মী—আমার প্রাণ আমাকে ডাকছে ওখানে।"

স্থির হল বাইরে খোলা-মাঠে সভা বসবে। বাইরের এই খোলা-মাঠের

মধ্যেই ছিলেন স্বামীজীর মনের মানুষরা – ছাত্র ও যুবকরা অধিকাংশই ভেতরে স্থান পান নি। সুন্দরম আয়ার লিখছেন—স্বামীজীর আগমনকে কেন্দ্র করে "শিক্ষিত সম্প্রদায় এবং ছাত্রদের সকলেরই মনে যে আগ্রহ জন্মেছিল তার তীব্রতা কল্পনাতীত ছিল।……ইতিমধ্যে বাইরে 'খোলা হোক' ধ্বনি অবিরাম উঠতে থাকায় ভেতরের কাজে বিঘ্ন ঘটছিল।……এই ঘটনা স্বামীজীর হৃদয় স্পর্শ করল, এবং তিনি যে মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন সেখানে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ল। তিনি বললেন যে, আগ্রহ ও উৎসাহ নিয়ে যে অগণিত যুবক বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন, তিনি তাদের নিরাশ করতে পারেন না। স্বামীজী ও তাঁর শ্রোতারা বাইরে এসে যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূর পর্যন্ত দণ্ডায়মান সেই জনসমুদ্রের মধ্যে মিশে গেলেন, আর অমনি স্বামীজীকে নিজেদের সামনে দেখে তারা আনন্দ ও হর্ষপ্রকাশে মত্ত হয়ে তুমুল চীৎকার করে উঠল।"

স্বামীজী বুঝলেন যে, জনসমাগম এত বেশী যে, তাঁর কণ্ঠ বেশী দূর যাবে না। একটি ঘোড়ার গাড়ীতে উঠে তিনি বক্তৃতা শুরু করলেন। জনতা হর্ষ-ধ্বনি করল। প্রচণ্ড ভীড় এবং কোলাহলে আর বক্তৃতা করা সম্ভব নয়। স্বামীজী তাঁর বক্তৃতা সংক্ষিপ্ত করে জনতার প্রবল উৎসাহের জন্য ধন্যবাদ দিলেন এবং বললেন তাদের উৎসাহাগ্নি যেন কখনও নিভে না যায়।

মাদ্রাজে স্বামীজী আরও কয়েকটি বক্তৃতা করেন। জনতা-নিয়ন্ত্রণের জন্য উদ্যোক্তারা মাথাপিছু একটাকা এবং দু'টাকা টিকিটের ব্যবস্থা করেছিলেন, কিন্তু এ সত্ত্বেও প্রতিটি সভা ছিল কানায় কানায় পূর্ণ।

৯ই ফেব্রুয়ারী ভিক্টোরিয়া টাউন হলে স্বামীজীর ভাষণের বিষয় ছিল 'আমার সমাজনীতি'। দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ ভাষণের মাধ্যমে স্বামীজী সেদিন যুব-সমাজকে দেশপ্রেমিক হবার আহ্বান জানালেন, হৃদয়বান হতে বললেন, মানুষকে ভালবাসতে বললেন, গুরুত্ব দিলেন শক্তি সাধনার ওপর। মাদ্রাজ টাইমস লিখছে—"উচ্চ প্রবেশ মূল্য সত্ত্বেও ভিক্টোরিয়া টাউন হল গত রাত্রে বিপুল-সংখ্যক গণ্যমান্য পুরুষ এবং ছাত্রদের দ্বারা পূর্ণ ছিল, যারা স্বামীজীর বক্তৃতা শুনতে এসেছিল।……মন্ত্রমুগ্ধ দর্শকদের ওপরে তাঁর উক্তিগুলি বজ্রের মত ফেটে পড়েছিল। তাঁর উদ্দেশ্যের ঐকান্তিকতা, উদ্দীপনা, বীর্য এবং বাগ্মিতা শ্রোতাদের ওপরে সুপ্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করেছিল।"

তাঁর দ্বিতীয় বক্তৃতা ছিল 'ভারতীয় মহাপুরুষগণ' জনসমাগমে ছিল

পূর্ববর্তী সভা অপেক্ষাও বেশী।[১] ১৩ই ফেব্রুয়ারী পচাইপ্পা হলে তাঁর তৃতীয় ভাষণ 'ভারতীয় জীবনে বেদান্তের কার্যকারিতা' প্রদত্ত হয়। স্বামীজী সেদিন বলিষ্ঠ কণ্ঠে যুবকদের উদ্দেশ্যে বললেন—"হে আমার যুবক বন্ধুগণ, তোমরা সবল হও—তোমাদের নিকট ইহাই আমার বক্তব্য। গীতাপাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলিলে তোমরা স্বর্গের আরও নিকটবর্তী হইবে।......তোমাদের শরীর একটু শক্ত হইলে তোমরা গীতা আরও ভাল বুঝিবে।......তোমাদের রক্ত পাতলা, তোমাদের মস্তিষ্ক আবিলতাপূর্ণ ও অসাড়, তোমাদের শরীর দুর্বল। শরীরের এ অবস্থা পরিবর্তন করিতে হইবে। শারীরিক দৌর্বল্যই সকল অনিষ্টের মূল, আর কিছু নহে।......তোমরা দুর্বল, অতি দুর্বল—তোমাদের শরীর দুর্বল, মন দুর্বল, তোমাদের আত্মবিশ্বাস একেবারেই নাই। তোমরা এখন পদদলিত, ভগ্নদেহ, মেরুদণ্ডহীন কীটের মতো হইয়াছ।..... আমাদের এখন চাই বল, চাই বীর্য।... তোমাদের প্রত্যেকেই বীরদর্পে দণ্ডায়মান হইয়া ইঙ্গিতে জগৎ-আলোড়নকারী মহামনীষাসম্পন্ন মহাপুরুষ হও, সর্বপ্রকারে অনন্ত ঈশ্বরতুল্য হও; আমি তোমাদের সকলকেই এইরূপ দেখিতে চাই।"[২] (৫৷১৩৪-৩৬)

১৪ই ফেব্রুয়ারী বক্তৃতার বিষয় ছিল—'ভারতের ভবিষ্যৎ'। সুন্দরম্ আয়ার লিখেছেন—"সেদিন যে-রকম জনবহুল দৃশ্য ও উৎসাহপূর্ণ শ্রোতৃ-সমাগম দেখেছিলাম, তা আর কখনও দেখি নি। স্বামীজীর বাগ্মিতা সেদিন সর্বোত্তম পর্যায়ে উঠেছিল—তিনি সিংহের মত মঞ্চের এধার থেকে ওধার পর্যন্ত পদচারণা করছিলেন। তাঁর কণ্ঠনির্ঘোষ চতুর্দিকে ধ্বনিত প্রতি-ধ্বনিত হয়ে সকলকে কাঁপিয়ে দিচ্ছিল।" যুবসমাজের প্রতি সেদিন স্বামীজীর দীপ্ত আহ্বান—"আগামী পঞ্চাশ বৎসর আমাদের গরীয়সী ভারতমাতাই আমাদের আরাধ্যা দেবতা হউন, অন্যান্য অকেজো দেবতা এই কয়েক বৎসর ভুলিলে কোন ক্ষতি নাই। অন্যান্য দেবতারা ঘুমাইতেছেন; তোমার স্বজাতি—এই দেবতাই একমাত্র জাগ্রত।...... প্রথমে এই স্বদেশবাসিগণের পূজা করিতে হইবে।......হে মাদ্রাজের যুবকবৃন্দ, আমার আশা তোমাদের উপর, তোমরা কি তোমাদের সমগ্র জাতির আহ্বানে সাড়া দিবে না? .....আমি চাই কয়েকটি যুবক। বেদ বলিতেছেন, 'আশিষ্ঠো দ্রঢ়িষ্ঠো বলিষ্ঠো মেধাবী'—আশাপূর্ণ বলিষ্ঠ দৃঢ়চেতা ও মেধাবী যুবকগণই ঈশ্বরলাভ করিবে। তোমাদের ভবিষ্যৎ জীবনগতি স্থির করিবার

এই সময়; যতদিন যৌবনের তেজ রহিয়াছে, যতদিন না তোমরা কর্মশ্রান্ত হইতেছ, যতদিন তোমাদের ভিতর যৌবনের নবীনতা ও সতেজ ভাব রহিয়াছে; কাজে লাগো—এই-ই তো সময়। কারণ নবপ্রস্ফুটিত, অস্পৃষ্ট অনাঘ্রাত পুষ্পই কেবল প্রভুর পাদপদ্মে অর্পণের যোগ্য—তিনি তাহা গ্রহণ করেন। তবে ওঠ, ওকালতির চেষ্টা বা বিবাদ-বিসংবাদ প্রভৃতি করা অপেক্ষা বড় বড় কাজ রহিয়াছে। আয়ু স্বল্প, সুতরাং তোমাদের জাতির কল্যাণের জন্য—সমগ্র মানব জাতির কল্যাণের জন্য আত্মবলিদানই তোমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ম।" (৫।১৯৮-২০৩)।

আলাসিঙ্গা পেরুমলের উৎসাহে ট্রিপলিকেন লিটারারি সোসাইটিতে 'আমাদের উপস্থিত কর্তব্য' শীর্ষক এক ভাষণে তিনি যুবসমাজকে সর্বপ্রকার কুসংস্কার দূর করে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা দ্বারা বিশ্বজয়ের আহ্বান জানান। তিনি বলেন "হে মাদ্রাজবাসী যুবকগণ, আমি তোমাদিগকে বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে বলিতেছি—আমাদিগকে বিদেশে যাইতে হইবে, আধ্যাত্মিকতা ও দার্শনিক চিন্তার দ্বারা আমাদিগকে পৃথিবী জয় করিতে হইবে, এ ছাড়া আর গত্যন্তর নাই; এইরূপই করিতে হইবে, নতুবা মৃত্যু নিশ্চিত।…… তোমরা প্রত্যেকে বরং ঘোর নাস্তিক হও, কিন্তু আমি তোমাদের কুসংস্কারপ্রাপ্ত নির্বোধ দেখিতে ইচ্ছা করি না।……আমরা চাই নির্ভীক সাহসী লোক, আমরা চাই—রক্ত তাজা হউক, স্নায়ু সতেজ হউক, পেশী লৌহদৃঢ় হউক। মস্তিষ্ককে দুর্বল করে—এমন ভাবের দরকার নাই।" (৫।১৭২-৭৪)।

বস্তুতঃ যুবকরাই ছিল স্বামীজীর সকল আশা-ভরসার স্থল। পাশ্চাত্যদেশ থেকে চিঠির পর চিঠি লিখে তিনি মাদ্রাজের যুবকদের কর্মে উদ্বুদ্ধ করেছেন ও নানা পরামর্শ দিয়েছেন। নানা বক্তৃতা, চিঠিপত্র ও কথাবার্তায় বারংবার তিনি সেই যুবকদের কথাই বলেছেন। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারী মাদ্রাজ টাইমসের জনৈক সংবাদদাতার সংগে সাক্ষাৎকার কালে তিনি বলেন—"উদীয়মান যুবকসম্প্রদায়ের উপরেই আমার বিশ্বাস। তাহাদের ভিতর হইতেই আমি কর্মী পাইব। তাহারাই সিংহবিক্রমে দেশের যথার্থ উন্নতিকল্পে সমুদয় সমস্যা পূরণ করিবে।" (৯।৪৭৩)।

মনীষী রোমাঁ রোলাঁর মতে—স্বামীজীর মাদ্রাজের বক্তৃতাগুলিতে ছিল "ঘোর গর্জনশীল মহাপ্লাবন, প্রচণ্ড প্রপাতের নির্ঘোষ।……জনগণ সেই স্রোতাবর্তের উত্তাল তরঙ্গোচ্ছ্বাসে ভাসিয়া গেল।"

১৫ই ফেব্রুয়ারী মাদ্রাজ থেকে জাহাজে রওনা হয়ে ২০-এ ফেব্রুয়ারী স্বামীজী বজবজে নামেন, তারপর সেখান থেকে স্পেশাল ট্রেনে শিয়ালদহে পৌঁছোন। শিয়ালদহ স্টেশন সেদিন অপরূপ-সাজে সজ্জিত—এক উৎসবমুখর পরিবেশ। স্টেশন-প্ল্যাটফর্ম এবং স্টেশনের চারিদিকে সেদিন ভোর থেকে শুধু মানুষ আর মানুষ। মানুষের সংখ্যা প্রায় কুড়ি হাজার। রিপন কলেজ পর্যন্ত পুরো রাস্তাটাই নানা তোরণ পাতকা ও পুষ্পে সজ্জিত। রাস্তার দুধারে বাড়ীর বারান্দা ছাদ মানুষে ভর্তি। ভোর পাঁচটা থেকেই এই অবস্থা। স্বেচ্ছাসেবক কুমুদবন্ধু সেনের লেখা থেকে জানা যায় যে, পাঁচটার সময়েই এমন অবস্থা যে স্টেশনে প্রবেশ করাই দায়।

সাড়ে সাতটায় স্বামীজীর ট্রেন এল। বৃদ্ধি পেল উৎসাহ উদ্দীপনা ঠেলাঠেলি। প্রবল জয়ধ্বনির মধ্যে স্বামীজী ট্রেন থেকে নামলেন। স্বেচ্ছা-সেবকরা একটি বেষ্টনী রচনা করে কোনক্রমে তাঁকে বাইরে এনে অপেক্ষমান ঘোড়ার গাড়ীতে তুললেন। ছাত্রদল এগিয়ে এসে ঘোড়া খুলে দিয়ে নিজেরাই গাড়ী টানতে লাগল। স্বামীজীর গন্তব্যস্থল রিপন কলেজ। গাড়ীর সামনে ব্যাণ্ডে বাজছে উল্লাসকর সুর, মাঝে স্বামীজীর গাড়ী, তার পেছনে খোল-করতালসহ কীর্তন দল এবং প্রবল জনস্রোত। স্বামীজী কলেজ-প্রাঙ্গণে নামলেন। হাজার হাজার মানুষ এগিয়ে আসছে। ভীড়ের চাপে হয়তো বা কোন অঘটন ঘটে যাবে! সাধারণভাবে একটি অভ্যর্থনার পর ঘোষণা করা হল, পরে অন্য কোন বড় জায়গায় স্বামীজীকে আনুষ্ঠানিক সম্বর্ধনা দেওয়া হবে। যুবকদল এবার তাঁর গাড়ী টেনে নিয়ে চলল বাগবাজারে পশুপতি বসুর বাড়ীতে।

স্বামীজীর কলকাতা পৌঁছোনর সাতদিন পরে ২৮-এ ফেব্রুয়ারী শোভা-বাজারে স্যার রাধাকান্ত দেবের বাড়ীর বিস্তৃত প্রাঙ্গণে তাঁকে কলকাতাবাসীর পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা দেওয়া হল। কলকাতা তথা বাংলার সকল গণ্যমান্য ব্যক্তিই সেখানে উপস্থিত—উপস্থিত কলেজের শত শত ছাত্র। পাঁচ হাজার মানুষের উপস্থিতিতে কর্ণবধিরকারী হর্ষধ্বনির মধ্যে স্বামীজী সভামঞ্চে আসন গ্রহণ করলেন। অভিনন্দনের উত্তরে তিনি যে বক্তব্য রাখলেন তাতে প্রস্ফুটিত, হয়ে উঠল স্বামীজীর দেশপ্রেমিকের রূপ। যুবকদের আহ্বান করে তিনি বললেন—"কলকাতাবাসী যুবকগণ, উঠ—জাগো, কারণ শুভ মুহূর্ত

আসিয়াছে।......সাহস অবলম্বন কর, ভয় পাইও না।......আমাদিগকে 'অভীঃ' —নির্ভীক হইতে হইবে, তবেই আমরা কার্যে সিদ্ধিলাভ করিব। উঠ—জাগো, কারণ তোমাদের মাতৃভূমি এই মহাবলি প্রার্থনা করিতেছেন।..... উঠ—জাগো, জগৎ তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছে। ভারতের অন্যান্য স্থানে বুদ্ধিবল আছে, ধনবল আছে, কিন্তু কেবল আমার মাতৃভূমিতেই উৎসাহাগ্নি বিদ্যমান। এই উৎসাহাগ্নি প্রজ্বলিত করিতে হইবে; অতএব হে কলিকাতাবাসী যুবকগণ! হৃদয়ে এই উৎসাহের আগুন জ্বালিয়া জাগরিত হও। ভাবিও না তোমরা দরিদ্র, ভাবিও না তোমরা বন্ধুহীন; কে কোথায় দেখিয়াছ—টাকায় মানুষ করিয়াছে? মানুষই চিরকাল টাকা করিয়া থাকে। জগতের যাহা কিছু উন্নতি, সব মানুষের শক্তিতে হইয়াছে, উৎসাহের শক্তিতে হইয়াছে, বিশ্বাসের শক্তিতে হইয়াছে।..... আমার দেশের উপর আমি বিশ্বাস রাখি, বিশেষতঃ আমার দেশের যুবকদলের উপর। বঙ্গীয় যুবকগণের স্কন্ধে অতি গুরুভার সমর্পিত। আর কখনও কোন দেশের যুবকদলের উপর এত গুরুভার পড়ে নাই।......নিশ্চয় বলিতেছি, এই হৃদয়বান উৎসাহী বঙ্গীয় যুবকগণের মধ্য হইতেই শত শত বীর উঠিবে।" (৫।২১৫-১৭)

এ সময় কলকাতার কলেজের ছাত্র ও যুবকেরা প্রায়ই দল বেঁধে স্বামীজীর কাছে আসত। স্বামীজী তাদের ধর্ম, দেশপ্রেম, আত্মবিশ্বাস, চরিত্রগঠন, শরীরচর্চা ও 'শিব জ্ঞানে জীব সেবা' সম্পর্কে উপদেশ দিতেন। তিনি বলতেন, "আমি এমন ধর্ম প্রচার করতে চাই, যাতে ঠিক ঠিক মানুষ তৈরী হয়।" তাঁদের আহ্বান করে বলতেন—'দু'হাজার বীরহৃদয় বিশ্বাসী চরিত্রবান ও মেধাবী যুবক এবং ত্রিশকোটী টাকা হলে আমি ভারতকে নিজের পায়ে দাঁড় করিয়ে দিতে পারি।" ঘন্টার পর ঘন্টা যুবকদের সংগে তিনি শক্তিচর্চা, দেশের সমস্যা ও তার সমাধানের উপায় নিয়ে আলোচনা করতেন। কেবলমাত্র এ সময়েই নয়—পরবর্তীকালে অসুস্থ অবস্থাতেও তাঁর বিরাম ছিল না। গুরুভাইরা নিষেধ করলে মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে তিনি বলতেন—"রেখে দে তোর নিয়ম ফিয়ম! এদের মধ্যে যদি একজনও ঠিক ঠিক আদর্শ জীবন যাপন করবার জন্য প্রস্তুত হয়, তাহলে আমার সমস্ত শ্রম সার্থক। পরকল্যাণে হলই বা দেহপাত, তাতে কি আসে যায়! চুপ করে ঘরের দোর বন্ধ করে বেঁচে থেকেই বা ফল কি? এরা কত দূরে থেকে কত কষ্ট করে আমার দু'টো কথা শুনবার জন্য এসেছে, আর অমনি ফিরে

যাবে ? তোরা যা পারিস কর, আমি জড়ের মত চুপ করে বসে থাকতে পারব না।" নব-ভারত গঠনের চিন্তায় বিভোর সেদিন স্বামীজী। দেশবাসীর দুঃখ-দারিদ্র, অভাব-অভিযোগ, অশিক্ষা-কুশিক্ষা, কুসংস্কার দূরে করতে বদ্ধ-পরিকর তিনি। নারী সমাজের শোচনীয় দুর্দশা, বাল্যবিবাহ, দুর্ভিক্ষে লাখ লাখ মানুষের মৃত্যুতে বেদনার্ত স্বামীজীর হৃদয়। যুগবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন "খালি পেটে ধর্ম হয় না।" স্বামীজী বলতেন—"কর্মতৎপরতা দ্বারা ঐহিক অভাব দূরে না হলে ধর্মকথায় কেউ কান দেবে না। তাই বলি আগে আপনার ভিতর অন্তর্নিহিত আত্মশক্তিকে জাগ্রত কর্, তারপর ইতরসাধারণ সকলের ভিতর যতটা পারিস ঐ শক্তিতে বিশ্বাস জাগ্রত করে প্রথমে অন্নসংস্থান পরে ধর্মলাভ করতে তাদের শেখা।" মানুষের দৈহিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিকল্পে তিনি প্রতিষ্ঠিত করলেন রামকৃষ্ণ মিশন। ভারতের ইতিহাসে অভূতপূর্ব এই সন্ন্যাসী সংগঠন। শিক্ষা ধর্ম সেবা শিল্প—সব কিছুর উন্নতি ঘটিয়ে মানুষের সর্বাত্মক উন্নতি বিধান এই সন্ন্যাসী সঙ্ঘের লক্ষ্য—সমাজ ত্যাগ করে নির্বিকল্প সমাধিতে ডুবে থাকা নয়। বেশ কিছু তরুণ যোগ দিলেন এই নবীন সন্ন্যাসী সঙ্ঘে।[১]

স্বামীজীর গুরু ভাইদের মধ্যে স্বামীজীর এই মতাদর্শ নিয়ে নানা সন্দেহ ছিল। তাঁকে বলা হল, এসব শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ নয়—এসব স্বামীজীর আমদানী করা বিদেশী ভাব। স্বামীজী সেদিন বলেছিলেন—"তুই কি করে জানলি এসব ঠাকুরের ভাব নয় ? অনন্ত ভাবময় ঠাকুরকে তোরা তোদের গণ্ডিতে বুঝি বদ্ধ করে রাখতে চাস ? আমি এ গণ্ডি ভেঙে তাঁর ভাব পৃথিবী-ময় ছড়িয়ে দিয়ে যাব। ঠাকুর আমাকে তাঁর পূজাপাঠ প্রবর্তন করতে কখনও উপদেশ দেন নি। তিনি সাধন-ভজন, ধ্যানধারণা ও অন্যান্য উচ্চ উচ্চ ধর্মভাব সম্বন্ধে যে সব উপদেশ দিয়ে গেছেন, যেগুলি উপলব্ধি করে জীবকে শিক্ষা দিতে হবে। অনন্ত পথ অনন্ত মত। সম্প্রদায়পূর্ণ জগতে আর একটি নূতন সম্প্রদায় তৈরী করে যেতে আমার জন্ম হয় নি। প্রভুর পদতলে আশ্রয় পেয়ে আমরা ধন্য হয়েছি। ত্রিজগতের লোককে তাঁর ভাব দিতেই আমাদের জন্ম।"[৭]

বস্তুতঃ রামকৃষ্ণ মিশন সেদিন দরিদ্র মানুষের মধ্যে সেবা স্বাস্থ্য শিক্ষা ধর্ম বিস্তার করে জাতি গঠনের কাজে নেমেছিল—দাঁড়িয়েছিল দুর্ভিক্ষ রোগ মহামারী-প্রপীড়িত মানুষের পাশে। এই 'বিরাটের' পূজাই ছিল স্বামীজীর

ঈশ্বরের উপাসনা। এ কাজে সাহায্যের জন্য তিনি চেয়েছিলেন ত্যাগী কর্মীদল। স্বামীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সেদিন বেশ কিছু তরুণ সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন।

কলকাতা থেকে স্বামীজী চললেন আলমোড়ায়। আলমোড়া থেকে তিনি বেরিলী, আম্বালা, অমৃতসর, রাওয়ালপিণ্ডি, শ্রীনগর, জম্মু, শিয়ালকোট, লাহোর, দেরাদুন, জয়পুর প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করেন। অজ্ঞাত-অখ্যাত-অপরিচিত সন্ন্যাসী নয়—জাতীয় জাগরণের মহানায়ক বিজয়ী বীররূপে সর্বত্রই তিনি বিপুলভাবে সম্বর্ধিত হন। হাজার হাজার পদস্থ মানুষ তাঁর দর্শনলাভ এবং তাঁর মুখ থেকে কিছু শোনার জন্য সর্বত্রই উন্মাদ। এসব জায়গায় স্বামীজী ইংরেজী ও হিন্দীতে সুন্দর ভাষণ দেন এবং ঘরোয়া বৈঠকে নানা বিষয়ে আলোচনা করেন। এই সব আলোচনা ও বক্তৃতায় কেবলমাত্র ধর্মই নয়—জাতীয় চেতনা, দেশপ্রেম ও আর্ত মানবাত্মার কথা সর্বত্রই বিদ্যমান। এই সব স্থানে তিনি সর্বদাই যুবক ও ছাত্রদের সংস্পর্শে আসার চেষ্টা করতেন।

বেরিলীতে তিনি বেদান্তের আদর্শসমূহ বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যে ছাত্রদের দিয়ে একটি ছাত্র-সমিতি প্রতিষ্ঠিত করান।

শিয়ালকোটে জানতে পারেন যে, সেখানে স্ত্রী-শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই। সেখানে তিনি একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করলে গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এই উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠন করেন। লাহোরে স্বামীজী প্রবল উন্মাদনার সৃষ্টি করেছিলেন। এখানে তিনি প্রায় দশ-এগার দিন ছিলেন এবং বেশ কয়েকটি বক্তৃতা করেন। প্রত্যেকটি বক্তৃতাতেই ভীড় উপচে পড়ত—বহু মানুষকে স্থানাভাবে ফিরে যেতেও হত। এখানে একদল ছাত্র সর্বদাই তাঁকে ঘিরে থাকত—স্বামীজী সম্পর্কে তাদের উৎসাহের শেষ ছিল না। লাহোরের বিভিন্ন স্থানে স্বামীজী যে-সব বক্তৃতা করেন তার ব্যবস্থা করেছিল ছাত্ররাই। স্বামীজীর ইংরেজ শিষ্য গুডউইনের লেখা থেকে জানা যায় যে, তিনি ছাত্রদের নিয়ে একটি বিরাট সভার আয়োজন করেন এবং সেখানে দরিদ্রের সাহায্য, সেবা ও শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ অসম্প্রদায়িক চরিত্রের একটি সমিতি

গঠন করেন। গুডউইন লিখছেন—"ছাত্রদের সংগে কথাবার্তার সময় স্বামীজী বার বার বর্তমান ভারতের মানুষের পক্ষে চরিত্রগঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি ছাত্রদের মাথায় সংবাদ ঠেসে দেয় কিন্তু তাদের নৈতিক চরিত্রের বিষয়ে কোনই মনোযোগ দেয় না। অনুশীলন দ্বারাই চরিত্রগঠন সম্ভব, আর এই সমিতির প্রস্তাবিত কর্মধারাই শ্রেষ্ঠ অনুশীলনের বস্তু। অপরকে সাহায্য করার চেষ্টা থেকেই ক্রমে হৃদয়ের উদারতা আসবে। যখন তারা অপরের জন্য চিন্তা করার অভ্যাস অর্জন করবে, স্বার্থত্যাগ করতে শিখবে.. তখনই বলা যাবে যে তাদের চরিত্র গঠিত হয়েছে।"

লাহোরের ধ্যান সিংহের হাবেলিতে অনুষ্ঠিত 'বেদান্ত' সম্পর্কে স্বামীজীর ভাষণ ছিল সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। স্বামীজী যেন এখানে পূর্ণশক্তিতে প্রকটিত হয়ে পড়েন। এই ভাষণে যুবসমাজকে তিনি দেশসেবা ও জনসাধারণের উন্নতিতে আত্মনিয়োগের আহ্বান জানিয়ে বলেন—"হে লাহোরবাসী যুবকবৃন্দ,……ওঠ, জাগো, যতদিন না লক্ষ্যে পৌঁছিতেছ, ততদিন নিশ্চিন্ত থাকিও না ; ওঠ, আর একবার ওঠ, ত্যাগ ব্যতীত কিছুই হইতে পারে না। অন্যকে যদি সাহায্য করিতে চাও, তবে তোমার নিজের অহংকে বিসর্জন দিতে হইবে।……তোমার সব ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দাও, এমন কি নিজেদের মুক্তি পর্যন্ত দূরে ফেলিয়া দাও ; যাও অন্যের সাহায্য কর।……তোমাদের এই ক্ষুদ্র জীবন বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হও। যদি এই জাতি জীবিত থাকে, তবে তুমি আমি—আমাদের মতো হাজার হাজার লোক যদি অনাহারে মরে, তাহাতেই বা ক্ষতি কি?……অতএব ওঠ, জাগো এবং সম্পূর্ণ অকপট হও। ভারতে ঘোর কপটতা প্রবেশ করিয়াছে। চাই চরিত্র, চাই এইরূপ দৃঢ়তা ও চরিত্রবল, যাহাতে মানুষ একটা ভাবকে মরণকামড়ে ধরিয়া থাকিতে পারে।……ওঠ, জাগো, সময় চলিয়া যাইতেছে, আর আমাদের সমুদয় শক্তি বৃথা বাক্যে ক্ষয় হইতেছে। ওঠ, জাগো—সামান্য সামান্য বিষয় ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মত-মতান্তর লইয়া বৃথা বিবাদ পরিত্যাগ কর। তোমাদের সম্মুখে খুব বড় কাজ রহিয়াছে, লক্ষ লক্ষ মানুষ ক্রমশঃ ডুবিতেছে, তাহাদিগকে উদ্ধার কর।" (৫।৩৩৮-৪০)।

স্বামীজীর সংস্পর্শে এসে লাহোরের এফ. সি. কলেজের তরুণ অধ্যাপক বিবাহিত তীর্থরাম গোস্বামী (১৮৭৩-১৯০৬ খ্রীঃ) সন্ন্যাস গ্রহণ করে স্বামী রামতীর্থ নাম ধারণ করেন এবং আমেরিকায় বেদান্ত প্রচারে ব্রতী হন।

এই সভায় উপস্থিত ছিলেন ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাসের ছাত্র পূরণ সিং। তিনি লিখছেন—"হল ভর্তি হয়ে জনতা প্রাঙ্গণে উপচে পড়েছিল। স্বামীজীর দর্শনাকাঙ্ক্ষায় অধীর হয়ে মানুষ ঠেলাঠেলি করে হলে ঢুকতে চাইছিল। এই ঐকান্তিক কিন্তু অনিয়ন্ত্রিত জনতার রূপ দেখে স্বামীজী ঘোষণা করলেন—তিনি মুক্তাঙ্গনে বক্তৃতা করবেন। হাবেলির বেষ্টিত অঙ্গন আকারে সুবৃহৎ, তার মধ্য-স্থলে মন্দির-আকারের একটি উচ্চ মঞ্চ আছে। স্বামীজী মঞ্চে উঠে দাঁড়ালেন। অতুলনীয় সেই দণ্ডায়মান মূর্তি।......এই বেদান্ত-কেশরী গর্জন করে চললেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা—পাঞ্জাবীরা মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনে গেল।..... তাঁকে দেখেই মনে হচ্ছিল—এই বিরাট পুরুষের দেহাধারে প্রেরণাগ্নি জ্বলছে।"

লাহোর থেকে স্বামীজী দেরাদুন, দিল্লী, আলোয়ার, জয়পুর, খেতরী, কিষেণগড়, আজমীর, যোধপুর, ইন্দোর, খাণ্ডোয়া প্রভৃতি স্থান হয়ে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারীর মাঝামাঝি কলকাতায় ফিরে আসেন।

স্থির হয়ে বসে থাকা স্বামীজীর পক্ষে সম্ভব ছিল না। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ২০-এ জুন দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য-গমনের উদ্দেশ্যে তিনি কলকাতা ত্যাগ করেন এবং ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, ভিয়েনা, হাঙ্গেরী, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া কনস্টান্টিনোপল ও মিশর হয়ে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর রাত্রিতে তিনি বেলুড় মঠে ফিরে আসেন।

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে তিনি পূর্ববঙ্গ ভ্রমণে যান। পূর্ববঙ্গে স্বামীজীর ঢাকা-ভ্রমণের কাহিনীই আমাদের আলোচ্য, কারণ ঢাকার তরুণ সমাজের মধ্যে স্বামীজী যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। স্বামীজীর ঢাকা গমনের ব্যাপারে ঢাকার ছাত্রদের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। "ঢাকার ছাত্ররাই স্বামীজীকে ঢাকায় আসার আহবান জানিয়েছিল। ১৯-এ মার্চ বিকেলে তিনি ঢাকা স্টেশনে পৌঁছোলে তাঁকে বিপুল সম্বর্ধনা জানান হয়। ছাত্র এবং ভদ্রলোকদের কণ্ঠোচ্চারিত শ্রীরামকৃষ্ণের জয়ধ্বনিতে আকাশ পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। এখানে তিনি মূলতঃ ঘরোয়া সভার ওপর জোর দেন, কিন্তু এ সব সভাতেও শতাধিক মানুষ উপস্থিত থাকত। ঢাকায় স্বামীজীর প্রথম প্রকাশ্য বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হয় ৩০-এ মার্চ জগন্নাথ কলেজ-হলে। স্থানাভাবে বহু মানুষকে সেদিন ফিরে যেতে হয়। দ্বিতীয় বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয়েছিল পোগস কলেজের খোলা ময়দানে।

ঢাকা কলেজের তৎকালীন ছাত্র এবং পরবর্তীকালে কৃতী আইনজীবী শ্রীসতীশচন্দ্র রায়চৌধুরী লিখছেন—"সমাজের আর একটা প্রভাবশালী অংশ ঢাকার ছাত্রসমাজ। তাহারা তখন হইতেই স্বদেশীভাবে অনুপ্রাণিত ছিল এবং যাহা কিছু বাংলার তথা ভারতের গৌরব, তাহাতেই একাত্মতা বোধ করিত।" তিনি লিখছেন—"স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করিবার স্থান স্থিরীকৃত হইল শহরের কেন্দ্রস্থলে জগন্নাথ কলেজের বিরাট প্রাঙ্গণে।...কলেজ প্রাঙ্গণ লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে আমরা ছাত্রবৃন্দও স্বামীজীর ইংরেজী ভাষায় ভাষণ শুনিবার জন্যই প্রধানত সমবেত হইলাম। ভাষার পিছনে যে একটা অসাধারণ শক্তি ছিল, সেটা আমরা তখনই প্রথম অনুভব করিলাম।

"সৌম্য, শান্ত, দীর্ঘায়তন, গৈরিক পরিহিত ও পাগড়ীবিভূষিতমস্তক স্বামীজী যখন মঞ্চে দাঁড়াইলেন, তখন তাঁহার উজ্জ্বল প্রতিভার দীপ্তি ছড়াইয়া পড়িল চারিদিকে। তাঁহার চক্ষুর সরল অথচ অন্তঃস্থলস্পর্শী জ্যোতি এক মুহূর্তে মুগ্ধ করিয়া ফেলিল সেই বিরাট জনতাকে। গৈরিকধারী সন্ন্যাসী অনেক দেখিয়াছি, কিন্তু গৈরিক বসনকে গৌরবোজ্জ্বল মনোমুগ্ধকর করিয়া তুলে এমন স্বর্গীয় প্রতিভাদীপ্ত মূর্তি আর কেহ কখনও দেখে নাই। স্বামীজী বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার আমেরিকার বক্তৃতার ধারা ছিল বেদান্তধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব-প্রতিপাদন এবং সর্বধর্মসমন্বয়ের বাণী, যাহা পাশ্চাত্যের কর্ণে এক নূতন সুরের ঝঙ্কার তুলিয়াছিল। খ্রীষ্টান পাদ্রীরাও খ্রীষ্টের বাণীর প্রতিধ্বনি শুনিলেন তাঁহার বক্তৃতায়। স্বামীজীর ঢাকার বক্তৃতায় এক নূতন সুর শুনিতে পাইলাম : 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।' তোমরা চিনিয়া লও নিজেদের—অমৃতের অধিকারী তোমরা। তোমাদের উন্নতির গতি রোধ করিবার শক্তি পৃথিবীতে কাহারও নাই। সাম্রাজ্যের দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়া তোমরা হইবে জগতের গুরু ও শিক্ষক। চাই তোমাদের আত্মবিশ্বাস (self-confidence)। ভারত ছিল একদিন আধ্যাত্মিক চিন্তাজগতের শীর্ষস্থানে। আমি প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, তোমাদের ভবিষ্যৎ আরও গৌরবময় ও মহান্। যুবকদের প্রতি ছিল বিশেষ আহ্বান : জাগো, ওঠ! ছুঁড়ে ফেলে দাও আলস্য ও নির্জীবতা। এ তোমাদের শোভা পায় না। অগ্রসর হও। চরৈবেতি চরৈবেতি।

"সে কী আহ্বান! কী তূর্য-নিনাদ! ঢাকাবাসী মহাসমারোহে শ্রীকৃষ্ণের

জন্মাষ্টমী-উৎসব সম্পন্ন করিয়া থাকে বটে, কিন্তু ইহার পূর্বে শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চজন্য শঙ্খধ্বনি তাহারা স্বকর্ণে শুনে নাই। আজ তাহারা শুনিল সেই গুরুগম্ভীর ধ্বনি—জনতা মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া শুনিল সে ভাষণ। এমনই তন্ময়ভাবে শুনিল যে, তাহার সারাংশ ব্যতীত আর কিছুই তাহাদের স্মৃতি ভারাক্রান্ত করিল না। থাকিল শুধু তাহাদের অবচেতন মনে একটা বিরাট সর্বাত্মক চেতনা। চারিদিকে চলিল নানাপ্রকার কল্পনা-জল্পনা। শিক্ষককুল এমন সুন্দর সহজ অথচ মর্মস্পর্শী ইংরেজী বক্তৃতা পূর্বে আর শুনেন নাই। বাইবেলের ইংরাজী হইতেও স্বামীজীর বক্তৃতার ভাষা সহজ সরল। আর রাজনীতিচর্চাকারীরা বলিলেন, স্বামীজী প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক নেতা, অচিরেই তৎকালিক রাজনীতির ক্ষেত্র অধিকার করিয়া বসিবেন। যুবকগণের চিত্তে সে ভাষণ এক সুদূরপ্রসারী ভাব-তরঙ্গ সৃষ্টি করিল এবং জনসেবায় আত্মোৎসর্গের সঙ্কল্প জাগাইয়া তুলিল। সকলেই স্বীকার করিবে যে, ইহার প্রতিধ্বনি ও প্রেরণা পরবর্তী কালে ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল বঙ্গ-বিভাগ আন্দোলনের তীব্র স্বাদেশিকতায়। ঢাকার জনচিত্ত সাড়া দিয়াছিল বিপুলভাবে তাঁহারা সেই বীর্যপূর্ণ আহ্বানে। ছিলেন না তিনি অহিংসাবাদের অন্ধসেবক। একদিন প্রশ্ন উঠিল—কোন্ খেলা ভালো? তিনি উত্তর দিয়াছিলেন—ফুটবল খেলা, যাহাতে আছে পদাঘাতের পরিবর্তে-পদাঘাত। সেই সময়ে লাথি মারিয়া কুলীর প্লীহা ফাটাইয়া দিয়াছিল দাম্ভিক ইংরেজ। এহেন মহাপুরুষ যাহাদের আদর্শ তাহাদের দ্বারাই সৃষ্ট হইয়াছিল স্বাধীনতার সৈন্যদল।" (উদ্বোধন, বিবেকানন্দ-শতবার্ষিক সংখ্যা, ১৩৩৫, পৃঃ ২৫৮-৫৯)।

পরবর্তীকালের বিখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী, শিক্ষাব্রতী ও জননায়ক শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তখন ঢাকা কলেজের ছাত্র পনেরো বছরের তরুণ। তাঁর আত্মজীবনীতে তিনি স্বামীজীর ঢাকা বক্তৃতার প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। (At the Cross Roads (1885—1946), Nripendra Chandra Banerji, 1946, 36-37)। তিনি লিখিয়াছেন "আমার এইকালের জীবনের পক্ষে যে-কোন হিসেবে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা—বিরাট পুরুষ স্বামী বিবেকানন্দের ঢাকায় আগমন—১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ কি এপ্রিল মাসে—এবং ঢাকার জগন্নাথ স্কুলের (কলেজের) ঠাসা সভায় ইংরাজীতে বক্তৃতাদান। এই ঘটনা আমার মনে, মগ্নচৈতন্যেও সম্ভবতঃ, গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল।......আমি

তখন বড়জোর পনেরো বছরের ছেলে—তাঁর বক্তৃতা সম্পূর্ণ অনুধাবন করতে পেরেছিলাম কিনা সন্দেহ। সে ছিল এক বৈদ্যুতিক ভাষণ, শক্তিতে ও শব্দতরঙ্গ সৃষ্টিতে প্রায় অতিপ্রাকৃত। তাঁর একটি বাক্যও এখন ঠিক স্মরণ করতে সমর্থ নই—একটি ভাবও নয়। আমি রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক মুদ্রিত গ্রন্থে ঢাকা-বক্তৃতার বিবরণ পড়েছি।······কিন্তু আমি মনে করতে পারি না—গ্রন্থে মুদ্রিত ঐ কথাগুলি স্বামীজী ঠিক ঠিক বলেছিলেন কিনা, কিংবা ঐভাবে তিনি যুক্তিবিস্তার করেছিলেন কিনা? তথাপি একটি জিনিসের স্মৃতি আমার সমগ্র জীবন জুড়ে রয়েছে—আগ্নেয়গিরির মতো এক ব্যক্তিত্ব, সমুদ্র-ঈগলের মতো শরীর ও মন, আর আত্মার ভয়ানক বিস্ফোরণ। বিবেকানন্দ তাঁর সত্তার অগ্নিশিখার দ্বারা নিশ্চয় আমার মর্মচৈতন্যের গহনতম অংশকে স্পর্শ করেছিলেন—সেইজন্য পরবর্তী জীবনে তাঁর বাণী ও রচনা আমাকে যেভাবে আলোড়িত করেছে, তেমন অন্যসূত্রে কদাচিৎ ঘটেছে। ঈশ্বর-উন্মাদ ও জ্যোতির্ময় আত্মার অরণ্যাগ্নি যেন ধেয়ে এসে আমার অপরিণত মনের যথেচ্ছ-বর্ধিত আগাছাগুলিকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিয়েছিল, এবং আমার মনকে উত্তোলন করেছিল 'ঊর্ধ্বলোকের চিরনগরীতে'।"

স্বামীজীর ঢাকা অবস্থানকালে কয়েকজন সংগীসহ তাঁর সংগে সাক্ষাৎ করেন সতেরো বছরের তরুণ—পরবর্তীকালের বিখ্যাত বিপ্লবী-নায়ক হেমচন্দ্র ঘোষ। সেদিন তাঁর সংগে আর যে-সব তরুণ সেই মহানায়কের সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন শ্রীশচন্দ্র পাল (পুলিশ ইন্সপেক্টর নন্দলাল ব্যানার্জির হত্যাকারী, ১৯০৮), মৌলবী আলিমুদ্দিন (বিখ্যাত বিপ্লবী 'মাস্টার সাহেব') এবং যোগেন্দ্র দত্ত (রডা অস্ত্র মামলার আসামী হরিদাস দত্তের অগ্রজ)। স্বামীজী এই তরুণদলকে সস্নেহে কাছে টেনে নিয়ে পিঠে হাত দিয়ে 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' বলে সম্ভাষণ জানান। হেমচন্দ্র লিখছেন—"তাঁর স্পর্শ এবং কণ্ঠস্বর আমাদের যেন বিদ্যুৎচমকিত করে দিল। আগ্রহে, প্রত্যাশায় আমাদের ধমনীর স্পন্দন দ্রুততর হয়ে উঠল। দীক্ষা গ্রহণের এ ছিল অমোঘ স্পর্শ।" (স্বামীজী সেদিন এই তরুণদলকে বলেছিলেন—"পরাধীন জাতির ধর্ম নেই।) তোদের একমাত্র ধর্ম মানুষের শক্তিলাভ করে পরস্বাপহারীকে তাড়িয়ে দেওয়া।" হেমচন্দ্র বলছেন—"সেদিনই আমি এবং আমার কতিপয় বন্ধু বিপ্লব-ধর্মে যথার্থ দীক্ষিত হয়েছিলাম।" (ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব

ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়, ১৩৮০ গ্রন্থে হেমচন্দ্র ঘোষের সংগে সাক্ষাৎকার ; পৃঃ ৫৪৪)।

শুধু কি এই ? স্বামীজী তাঁদের সামনে তাঁর সমগ্র আদর্শটিকে তুলে ধরে এই তরুণদলকে জাতি-গঠনের কাজে ঝাঁপ দেবার আহ্বান জানিয়েছিলেন। হেমচন্দ্র লিখছেন—"স্বামীজী আমাদের বিশ্লেষণ করে বোঝালেন যে, সকল ধর্মের বিশ্বজনীন আবেদনের ভিত্তিই এক। 'বিকাশই জীবন, সংকোচনই মৃত্যু। মানুষের অন্তর্নিহিত দিব্য জ্ঞানের উপলব্ধিই যদি না হয়, তাহলে ধর্মের কী সার্থকতা ?"

"তিনি আমাদের উপদেশ দিলেন মানবধর্ম ও স্বাধীনতার জন্য জীবনকে উৎসর্গ করতে, ভারতের জন্য, বিশ্বের জন্য বাঙ্গলার জাতীয় চরিত্র গঠন করে তুলতে। এ সমস্তই বুদ্ধি এবং হৃদয়ের প্রশ্ন। আমাদের বিবেকই কর্তব্যের আহ্বানে সাড়া দেয়। আদর্শনিষ্ঠা এবং নৈতিক দৃঢ়তাই সত্যিকারের গুণ, সত্যিকারের বীরত্ব ও পৌরুষ।' স্বামীজী একথাই আমাদের বিশেষভাবে বুঝিয়েছেন।"

"মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য মানুষ তৈরী করার জন্য তিনি আমাদের উপদেশ দিয়েছিলেন। তৎকালীন ভারতীয় কংগ্রেসের কার্যাবলীতে তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না। 'এভাবে দেশপ্রেম উদ্বুদ্ধ করা যায় না। বণিকের বিত্তবৈভবের জগতে ভিক্ষাপাত্রের কোন স্থান নেই।......প্রথম কর্তব্য সর্বাগ্রে করণীয় : এখন নয়া-বাংলায় সর্বাগ্রে প্রয়োজন শরীর গঠন, দুঃসাহসিকতা (শরীরমাদ্যম্)। শারীরিক সুস্থতাকে এখন ভগবদ্গীতা পাঠের চেয়েও আগে স্থান দিতে হবে। এই দুঃসাহসিকতায় পৌরুষ এবং বীরনীতি অনুসরণ করে দুর্বলকে রক্ষা করতে হবে। মহামায়ার প্রতীকরূপে নারী জাতির সম্মান করো। তোমরা কি জানো না, জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী ?......তোমরা সমাজসেবা সংগঠন করো—বিদ্যাশিক্ষার সংগে সংগে চাই সংঘবাদ, সেবাব্রত। জীবই শিব। দরিদ্র-নারায়ণকে উদ্ধার করো, তাদের পবিত্র করে।"

"স্বামীজী বলেছিলেন : প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক মানুষ এবং প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানেরই তিনটি মৌলিক গুণ আছে—সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ। কর্তব্যপালনে প্রত্যেকের ভুলত্রুটির মধ্যেই এই তিনটি গুণ অল্পবিস্তর মিশে থাকে। যেমন কাজ করবে ফলও পাবে তেমনি। যে আত্মনির্ভরশীল, মহামায়া তাকেই

সাহায্য করেন। আমাদের সত্তা আজ তমোগুণে আচ্ছন্ন। তা' না হলে, শতাব্দীর পর শতাব্দীর কী করে বিদেশীরা এসে আমাদের দেশ ও জাতিকে পদদলিত করে যাচ্ছে? হায়! এদেশ আর পুণ্যভূমি নয়! এদেশ পদাহতের দেশ, ছুঁৎমার্গীর দেশ, জোহুকুমের দাসভূমি।

"স্বামীজী আমাদের সম্মুখে আশার উজ্জ্বল চিত্র তুলে ধরলেন। 'ভারতের অতীত ছিল গৌরবোজ্জ্বল, ভারতের ভবিষ্যৎ-ও হবে উজ্জ্বলতর। তা' না হলে প্রকৃতির ঈশ্বর অর্থহীন হয়ে পড়বেন······আর একমাত্র রজোগুণ হলেই ভারতীয় জীবনে অমৃতের মতো কাজ করবে। তাই এখন সবচেয়ে আগে প্রয়োজন হলো সচেতনভাবে রজোগুণ বৃদ্ধির চেষ্টা করা, জীবনকে গতিশীল করা। অভীমন্ত্রের আহ্বান, সমস্ত দাসমনোবৃত্তি, কুসংস্কার ও হীনমন্যতাকে দূরে ঝেড়ে ফেলে দেবে। পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত জাতির পাশাপাশি চলতে হলে, হে বাঙলার তরুণদল, তোমরা ঝাঁন্সীর রাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের বীরত্বে উদ্বুদ্ধ হও, অন্যান্য জাতির গুণাবলী অনুসরণ করে কারিগরী দক্ষতা অর্জন করো······নৈতিক মান উন্নত করে দক্ষতা অর্জন করে বিদেশীদের নাগপাশ থেকে প্রাচ্যের সংস্কৃতিভূমি স্বদেশকে মুক্ত করো।) কিন্তু নিশ্চিত জেনো, কেবল পরানুকরণে কোন অভিষ্ট সিদ্ধ হবে না।.....তাতে বাস্তব জীবনের তটভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে······ আমি ধ্বংস করতে আসিনি, এসেছি উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে। অন্ধ অনুকরণ দাসত্বেরই সামিল। অন্য দেশ ও জাতির সংস্কৃতি থেকে গ্রহণযোগ্য যে-বস্তু তাকেই গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু একথা যেন আমরা বিস্মৃত না হই যে, ভারতীয় সংস্কৃতিই পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তাই পৃথিবীর সর্বত্র ভারতেও একটি বাণী প্রচার করবার দায়িত্ব রয়েছে।" ।

"স্বামীজী অতঃপর আমাদের আহ্বান জানালেন দরিদ্র, অবহেলিত, নিপীড়িত নরনারীর সেবাকার্যে আত্মনিয়োগের জন্য। সমস্ত অবনতির অবসান চাই। অস্পৃশ্যতা মহাপাপ। একে দূর করতে হবে। পৃথিবীতে ম্লেচ্ছ বলে কেউ থাকতে পারে না। তাঁরা সকলেই নারায়ণ। তিনি আমাদের চার দফা কর্মসূচী দিয়েছিলেন: 'জনসাধারণের সেবা করা, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠা এবং গ্রন্থাগার আন্দোলন।'

'দেশপ্রেমিক-সন্ন্যাসী অতঃপর আমার দিকে স্মিতহাস্যে তাকিয়ে বললেন,

'মানুষ গঠনই আমার জীবনের ব্রত। হেমচন্দ্র! তুমি তোমার সহকর্মীদের নিয়ে আমার এই ব্রতকে কার্যে পরিণত করবার চেষ্টা করো। বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী পাঠ করে তাঁর দেশভক্তি এবং সনাতন ধর্ম অনুসরণ করো। দেশসেবাই হবে তোমাদের কর্তব্য। ভারতকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে সর্বাগ্রে।'

"আরও আলোচনার পর ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা স্বামীজী যেন স্বগতোক্তির মত বলতে লাগলেন: 'হ্যাঁ, পৃথিবীর শূদ্রদের অভ্যুত্থান ঘটবে। সামাজিক গতিশীলতার নির্দেশই এই, সেই হলো শিবম্। নতুন পৃথিবী গঠনের জন্য সমগ্র প্রাচ্য-ভূমিতে নবজাগরণ ঘটবে, আজ দিবালোকের মত তা স্পষ্ট।......তোমরা আমার কাছ থেকে একথা নিশ্চিতভাবে জেনে যাও, শূদ্রের অভ্যুত্থান প্রথমে ঘটবে রাশিয়ায় এবং পরে চীনে। ভারতের অভ্যুত্থান ঘটবে তার পরেই এবং ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে এই ভারত।"

"স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের কাছে ধর্মগুরু অপেক্ষা রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টারূপেই বিশেষভাবে প্রতিভাত হন। তাঁর নির্দেশ শিরোধার্য করে আমরা নিজেদের ক্ষুদ্র সামর্থ্যানুযায়ী উন্নততর বাংলা, সমৃদ্ধতর ভারত এবং পৃথিবী গঠনে আত্মনিয়োগ করেছি। বঙ্কিমচন্দ্র এবং বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী পাঠ করে আমরা ঈশ্বরে বিশ্বাস রেখে স্বাধীনতার মন্দিরে তীর্থযাত্রায় বের হয়েছিলাম।" (স্বামী বিবেকানন্দ, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ১৯০১, ৩০৫-০৮)।

স্বামীজীর মূল আহ্বান ছিল যুবকদের কাছেই। যুবকদের কাছেই তিনি তাঁর মনের কথা ব্যক্ত করেছেন, তাঁর কথায় যুবকরাই উদ্দীপ্ত হয়েছেন সবচেয়ে বেশী। বিপ্লবী নায়ক হেমচন্দ্র ঘোষের বিবৃতিটিতে স্বামীজীর মূল আদর্শ ও লক্ষ্য পরিস্ফুট হয়েছে। স্বামীজীর আহ্বানে সেদিন হাজার যুবক উন্মাদ হয়ে উঠেছিল—তাদের চোখে স্বামীজী ছিলেন জাতীয় জাগরণের মহাপুরুষ—নবযুগের প্রফেট।

পাশ্চাত্য জয়ের পর ১৮৯৭-এ কলম্বোতে পদার্পণের সময় থেকে শুরু করে ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রদত্ত স্বামীজীর বক্তৃতা 'ভারতে বিবেকানন্দ'

নামক গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে : এই সব স্থানের বক্তৃতায় স্বামীজী কি বললেন এবং এর ফলই বা কি ?

স্বামীজীর এই পর্বের ভারত-ভ্রমণ ছিল বিজয়ী বীরের মত—যেখানেই তিনি গেছেন, সেখানেই পেয়েছেন রাজকীয় সম্বর্ধনা। এ সময় তাঁকে কেন্দ্র করে আসমুদ্রহিমাচল যে একটি অভূতপূর্ব জাগরণ ও আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল, এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। এই সব স্থানে বক্তৃতার মাধ্যমে তিনি নিছক ধর্মের কথাই বলেন নি—প্রচার করেছেন জাগরণের বার্তা। ভারতের মহত্ব, দেশপ্রেম, শক্তিচর্চা, আত্মবিশ্বাস, জনজাগরণ, দরিদ্রদের সেবা, শিক্ষাবিস্তার, সাম্য, হিন্দু মুসলিম সমস্যার সমাধান প্রভৃতি নানা কথা উচ্চারিত হয়েছে তাঁর কণ্ঠে। সমগ্র জাতির উদ্দেশ্যে তিনি আহ্বান জানালেও, তাঁর প্রকৃত আহ্বান ছিল ছাত্র ও যুবকদের কাছেই। তাঁকে কেন্দ্র করে মূলতঃ যুবকরাই মেতে উঠেছিল, তারা স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করেছিল, সভাকক্ষে স্থান না পেয়ে তারাই সভায় গোলমাল বাঁধিয়াছিল এবং তাদের আহ্বানেই একাধিকবার স্বামীজী সভাকক্ষ ত্যাগ করে বাইরে খোলা-জায়গায় বক্তৃতাও প্রদান করেছিলেন।

স্বামীজীর এই বক্তৃতাবলীর—বক্তৃতা নয়—জাগরণী মন্ত্রের প্রভাব ছিল অতুলনীয়। সমকালীন—এমন কি পরবর্তীকালের যুবসমাজ এর মধ্যেই পেয়েছিল পথ-নির্দেশ।

এ সম্পর্কে ফরাসী মনীষী রোমাঁ রোলাঁ লিখছেন, "তাঁহার সমস্ত যাত্রাপথে তিনি বক্তৃতার পর বক্তৃতায় বাতাসে বাণীর বীজ উড়াইয়া চলিলেন। এমন সুন্দর, এমন দৃপ্ত বক্তৃতা ভারত ইতিপূর্বে আর শোনে নাই। সমস্ত দেশ রোমাঞ্চিত হইল।......জনসাধারণের উন্মত্ত প্রত্যাশার প্রত্যুত্তরে তিনি তাঁহার 'ভারতের প্রতি বাণী' ঘোষণা করিলেন। সে ঘোষণা ছিল শঙ্খধ্বনির মতো; সে শঙ্খধ্বনি রামচন্দ্র, শিব ও কৃষ্ণের দেশকে পুনরায় জাগ্রত হইতে আহ্বান করিল, তাঁহার শৌর্যশীল মানব-সত্তাকে, তাঁহার অমর আত্মাকে সংগ্রামের জন্য অগ্রসর হইতে বলিল। তিনিই ছিলেন সেনাপতি। তিনি তাঁহার 'অভিযানের পরিকল্পনা' ('My Plan of Campaign') ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন এবং জনসাধারণকে সমগ্রভাবে উত্থিত হইতে আহ্বান করিলেন : 'হে আমার ভারত'! জাগ্রত হও! কোথায় তোমার জীবনী-শক্তি? সে শক্তি তোমার অমর আত্মায়।' (বিবেকানন্দের জীবন, রোমাঁ রোলাঁ, ঋষি দাস অনূদিত, ১৯০১, ১০৩-০৪)।

মনীষী বিনয়কুমার সরকার বলেন—"দেশটাকে ঠেলে তুলবার জন্য বিবেকানন্দ'র বকাবকির ভেতর অনেক-কিছু পাওয়া যায়। সেই বকাবকি-গুলোর "আসল ভেতরে," একবার ঢুকে পড়ো। দেখবে যে, স্বদেশ-সেবক বিবেকানন্দর বুখনিতে আর এই মামুলি অধমের তুচ্ছ বোলচালে প্রাণের যোগ আছে অসীম।" (বিনয় সরকারের বৈঠকে, প্রথম খণ্ড, হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য, ১৯৪৪, পৃঃ ৫৩২)। তিনি বলেন—"আমি বিবেকানন্দকে নব্য ভারতের কার্লাইল আখ্যা দিয়া থাকি এবং নেপোলিয়নের ন্যায় শক্তিশালী ও বীর বলিয়া সম্মানিত করি।...... অতি অল্প দিনের মধ্যে তাঁহার মাতৃভূমির জন্য এবং জগতের জন্য তিনি এত বেশী কার্য্য করিয়াছিলেন যে তাঁহাকে আমরা যৌবনশক্তির অবতার বলিতে বাধ্য।" (নয়া বাঙলার গোড়া পত্তন, দ্বিতীয় ভাগ, বিনয়কুমার সরকার, ১৯৩২, ৩৩৮-৩৯)।

দেশবাসীর অন্তরে স্বামীজী সেদিন কেবলমাত্র উদ্দীপনা পৌরুষ দেশপ্রেম ও জাগরণই আনলেন না—আধুনিক শঙ্করাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ জাগিয়ে তুললেন লুপ্ত ভারতবোধ বা ভারত চেতনাকে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্বে ভারতে জাতীয়তাবাদের কোন অস্তিত্ব ছিল না। তখন বাঙ্গালী বিহারী পাঞ্জাবী মারাঠী প্রভৃতি জাতি থাকলেও 'ভারতীয়' নামে কোন জাতি ছিল না। ব্রাহ্মসমাজ বিদ্যাসাগর-দয়ানন্দের আন্দোলন, সুরেন্দ্রনাথের কর্মপ্রয়াস বা কংগ্রেসী রাজনীতিও তখন সমগ্র দেশে কোন সজীবতা আনতে বা কোন জাতির প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয় নি। বস্তুতঃ সেদিন সর্বভারতীয় দৃষ্টি বা আদর্শ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে নি। এমতাবস্থায় শিকাগো ধর্মমহাসভার কয়েক বৎসরের মধ্যে স্বামীজী সকল সম্প্রদায়ের আপামর জনসাধারণকে নিয়ে ভারতে প্রকৃত জাতীয়তাবাদের সূচনা করেন। জগৎসভায় হিন্দুধর্মের গৌরব প্রতিষ্ঠার ফলে ভারতীয় হিন্দুদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও গৌরববোধের মাধ্যমে এক ঐক্য গড়ে ওঠে।। তাঁকে অনেকে "হিন্দু জাগরণের নেতা" বলে অভিহিত করে থাকেন—কিন্তু স্বামীজীর মতে 'হিন্দু' কোন বিশেষ ধর্মীয় শব্দ নয়। তাঁর কার্যকলাপে হিন্দুদের মধ্যে জাগরণ দেখা দিলেও, তাঁর আহ্বান কেবলমাত্র হিন্দুদের জন্য ছিল না। তিনি সর্বদাই 'ভারত' শব্দ ব্যবহার করতেন এবং ভারতীয় জনসংখ্যার হিসেব দিতে গেলে মুসলিম বা খ্রীষ্টানদের বাদ দিতেন না।। তাঁর মধ্যে জাতি বা ধর্মভেদের কোন সংকীর্ণতা ছিল না, মুসলিম গৃহে

বাস বা আহারেও তাঁর কোন আপত্তি ছিল না। পরিব্রাজক জীবনে বহুবার তিনি মুসলিম গৃহে আশ্রয় নিয়েছেন ও মুসলিমদের দেয় আহার্য গ্রহণ করেছেন। শ্রীনগরে তিনি মুসলমান মাঝির শিশুকন্যাকে উমা-রূপে পূজা করেছেন। হজরত মহম্মদ তাঁর কাছে মহাপুরুষ—প্রফেট। ইসলামের সাম্য ও ঐক্যের আদর্শের প্রশংসায় তিনি মুখর ছিলেন। মুঘল বাদশা—বিশেষতঃ আকবরের প্রশংসায় তিনি পঞ্চমুখ। এছাড়া স্বামীজী প্রচারিত 'নব বেদান্ত' বিশেষ কোন ধর্মমত নয়—এই 'সর্বাবয়ব' বেদান্তের দ্বারা তিনি মানবধর্ম প্রচার করে বিশ্ববাসীকে কর্মযজ্ঞে উদ্বুদ্ধ করেছেন। অধিকন্তু, ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জুন মহম্মদ সর্ফরাজ হোসেনকে লিখিত "বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীয় দেহ"-র পরিকল্পনা সম্বলিত পত্রটি জাতীয়তাবাদী বিবেকানন্দের স্বদেশ-দ্যোতনার আর এক চিহ্ন এবং এরই মধ্যে হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের সূত্রও নিহিত আছে। তিনি লিখছেন—"আমরা মানব জাতিকে সেই স্থানে লইয়া যাইতে চাই—যেখানে বেদও নাই, বাইবেলও নাই, কোরানও নাই; অথচ বেদ, বাইবেল ও কোরানের সমন্বয় দ্বারাই ইহা করিতে হইবে।... আমাদের নিজেদের মাতৃভূমির পক্ষে হিন্দু ও ইসলাম ধর্মরূপ এই দুই মহান্ মতের সমন্বয়ই—বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীয় দেহ—একমাত্র আশা। আমি মানস চক্ষে দেখিতেছি, এই বিবাদ-বিশৃঙ্খলা ভেদপূর্বক ভবিষ্যৎ পূর্ণাঙ্গ ভারত বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীয় দেহ লইয়া মহা মহিমায় ও অপরাজেয় শক্তিতে জাগিয়া উঠিতেছে।" (৮।৩৯)। অধ্যাপক শঙ্করী প্রসাদ বসুর কালজয়ী-সৃষ্টি 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ' গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ড থেকে জানা যায় যে, স্বামীজীর দেহত্যাগের পর ১৯-এ সেপ্টেম্বর, ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দ কলকাতা টাউন হলে যে স্মৃতিসভা অনুষ্ঠিত হয় তাতে আবদুল সাত্তার নামে জনৈক শিক্ষিত মুসলিম যুবক স্বামীজীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন যে, স্বামীজী তাঁর "বড় প্রিয়, একেবারে প্রাণের একজন মানুষ।"

ভারতীয় জাতীয় জাগরণে স্বামীজীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ঐতিহাসিকেরও দৃষ্টি এড়ায় নি। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁকে 'আধুনিক ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জনক' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ঐতিহাসিক আর. জি. প্রধানের মতে, ভারতীয় জাতীয়তাবাদ বহুলাংশে স্বামীজীরই সৃষ্টি এবং তার উচ্চতর ও মহত্তর চেতনাগুলি তাঁর জীবনে প্রতিফলিত হয়েছে। সর্দার

কে. এম. পানিক্কর বলছেন যে, বিদেশী শাসানাধীনে থাকার ফলে যে-রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদের জন্ম হয়, তা কখনই ভারতকে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করতে পারত না। দীর্ঘ চারশ' বছর অটোম্যান তুর্কীদের অধীনে থাকা সত্ত্বেও ভারতের চেয়ে অনেক ক্ষুদ্র এলাকা বলকান অঞ্চল উনিশ শতকে আর অখণ্ড রইল না। ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে গতিশীল করে শেষ পর্যন্ত, অন্ততঃ তার বৃহৎ অংশকে এক রাষ্ট্রীয় পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ করে হিন্দুদের মধ্যে অখণ্ডতাবোধ জাগ্রত করা—বহুলাংশে স্বামী বিবেকানন্দের সৃষ্টি। এই নব-শঙ্করাচার্য সমগ্র ভারত ভ্রমণ করে হিন্দু আদর্শগুলিকে একসূত্রে গ্রথিত করেছেন। তিনি কেবলমাত্র হিন্দুচেতনারই উদ্বোধন ঘটান নি, নব্য-হিন্দু পুনর্জাগরণের পটভূমিকায় বেদান্তের সার্বজনীন সত্যকে উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর পূর্ববর্তী হিন্দু সংস্কার আন্দোলনগুলি স্থানীয় ও সাম্প্রদায়িক—সর্ব-ভারতীয় ক্ষেত্রে সেগুলির কোন প্রভাব ছিল না। আর্য সমাজ, ব্রাহ্ম সমাজ, দেব সমাজ ও অন্যান্য আন্দোলনগুলি নিজ নিজ ক্ষেত্রে যথেষ্ট মূল্যবান হলেও সংস্কার আন্দোলনের প্রাদেশিক চরিত্রের ওপরেই গুরুত্ব আরোপ করে। বিবেকানন্দই প্রথম হিন্দু-আন্দোলনকে তার জাতীয়তার চেতনা দিলেন এবং পরবর্তী সকল আন্দোলনের মধ্যে সর্বভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী সঞ্চারিত করেন।

'ভারতীয় জাতীয়তার জনক' এই সর্বত্যাগী যুবা সন্ন্যাসীর আহ্বান যুবকদের কাছে—"আমরা সিদ্ধিলাভ করবই করব। শত শত লোক এই চেষ্টায় প্রাণত্যাগ করবে, আবার শত শত লোক উঠবে। বিশ্বাস, বিশ্বাস, সহানুভূতি। অগ্নিময় বিশ্বাস, অগ্নিময় সহানুভূতি। তুচ্ছ জীবন, তুচ্ছ মরণ, তুচ্ছ ক্ষুধা, তুচ্ছ শীত। এগিয়ে যাও; প্রভু আমাদের নেতা। কে পড়ল, ফিরে দেখো না। এগিয়ে যাও, বীরহৃদয় যুবকবৃন্দ, এগিয়ে যাও, সামনে এগিয়ে যাও।"

৪

যুবকদের প্রতি স্বামীজীর আহ্বান

স্বৈরাচারী ইংরেজ শাসনে পরপদানত ও হৃতসর্বস্ব, অশিক্ষা কুশিক্ষা ও কুসংস্কারে নিমজ্জিত, দারিদ্র্য ও হতাশাক্লিষ্ট ক্ষীয়মান মুমূর্ষু জাতির কাছে স্বামী বিবেকানন্দ হলেন মুক্তিদাতা মহাপুরুষ—তাঁর বাণী হল সঞ্জীবনী-সুধা। গৈরিকধারী ত্যাগী সন্ন্যাসী হয়ে নিজে সকল সাংসারিক বন্ধন ছিন্ন করলেও সমস্যা-কণ্টকিত ও পাপকলুষিত জগতকে তিনি ত্যাগ করতে পারেন নি। জগৎ তাঁর কাছে মিথ্যা মায়া নয়—সর্বভূতে তিনি সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের আনন্দঘন অস্তিত্ব অনুভব করেছেন। অদ্বৈত দর্শন ও ব্যবহারিক বেদান্তের প্রবক্তা স্বামী বিবেকানন্দ নির্যাতিত নিপীড়িত নরের মধ্যেই দেখেছেন নারায়ণকে, বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন—মঠ মন্দির মসজিদ গীর্জা বা গহন অরণ্যে ঈশ্বর অন্বেষণের প্রয়োজন নেই—মানুষই দেবতা—মানুষের মধ্যেই দেবত্ব আছে—মানুষই ইতিহাসের নায়ক। আত্মমুক্তি নয়—সমস্যা-প্রপীড়িত দেশ ও দেশবাসীর মুক্তিই ছিল তাঁর ঈশ্বর উপাসানা—ভারতভূমিই ছিল তাঁর ঈশ্বর। ভারতের দুঃখ-দারিদ্র্য ও হতাশাব্যঞ্জক অবস্থা বিচলিত করেছে এই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর হৃদয়। সারাজীবন ধরে তিনি চেষ্টা করেছেন ভারতভূমিকে তাঁর এই হৃতসর্বস্ব অবস্থা থেকে মুক্ত করতে। তিনি দেশপ্রেমিক—দেশকে ভাল-বেসেছেন প্রাণভরে। কৈশোরের দিনগুলোয় পরম উৎসাহভরে পাঠ করেছেন সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের অমরসৃষ্টি জাতীয়তাবাদের মহাকাব্য 'আনন্দমঠ', ভীড় করেছেন 'ন্যাশনাল' নবগোপাল মিত্রের 'হিন্দুমেলায়', প্রবল উৎসাহের সংগে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দমোহন বসুর বক্তৃতা শুনে দেশপ্রেমের পাঠ নিয়েছেন 'স্টুডেন্টস্ অ্যাসোসিয়েশনের' সভায়। পরবর্তীকালে শ্রীরামকৃষ্ণের কল্যাণ-স্পর্শে এই দেশপ্রেম পরিণত হয়েছে মানব-কল্যাণ ও জগৎ-হিতৈষণায়। এসত্ত্বেও বিবেকানন্দ দেশপ্রেমের জাগ্রত প্রতিমূর্তি—এক জাতীয়তাবাদী সন্ন্যাসী। মনে-প্রাণে তিনি খাঁটি ভারতীয় এবং এই 'ভারতীয়বাদ'-ই হল তাঁর ধর্ম।

আজীবন তিনি বিভোর ছিলেন ভারতের কল্যাণে। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা যাত্রার পূর্বে নানা স্থানে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর সেই ভারতপ্রেম।

অনেকেই সেদিন সেই সর্বত্যাগী সর্ববন্ধনমুক্ত সন্ন্যাসীর একটি মাত্র বন্ধন এবং তাঁর আনন্দ ও বিষাদের একটি মাত্র কারণ দেখেছিলেন—তা হল তাঁর দেশ ভারতবর্ষ। ইওরোপ-আমেরিকায় চরম সাফল্যের প্রবল আনন্দোচ্ছ্বাসের মধ্যেও তিনি তাঁর দেশকে ভোলেন নি। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজীর সহপাঠী যোগেশচন্দ্র দত্ত স্বামীজীর মধ্যে দেখেছিলেন 'একজন যথার্থ দেশপ্রেমিক'-কে। এ সম্পর্কে তিনি লেখেন—"জীবনে সে দৃশ্য আমি কখনো ভুলব না। তিনি (স্বামীজী) সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী ছিলেন, কিন্তু তাঁর হৃদয়ের সবটা জুড়েই ছিল ভারতবর্ষ। ভারতই তাঁর ধ্যান, জ্ঞান। ভারতের কথাই তিনি ভাবতেন, ভারতের জন্য তিনি কাঁদতেন এবং ভারতের জন্যই তিনি জীবন উৎসর্গ করেছেন। তাঁর চোখের প্রতি স্পন্দনে, ধমনীর প্রতি শোণিত বিন্দুতে ভারতের চিন্তা ছাড়া অন্য কোন চিন্তা ছিল না।" ভগিনী নিবেদিতার কথায়, ভারত ছিল তাঁর আরাধনার দেবী—"The queen of his adoration," ভারতের চিন্তা ছিল তাঁর কাছে প্রতি মুহূর্তের নিঃশ্বাসবায়ু—"the air he breathed," ভারত ছিল তাঁর দিনের চিন্তা, রাত্রির স্বপ্ন—"India was his day-dream, India was his nightmare."—ভারতের সমাজ ছিল তাঁর শিশুশয্যা, যৌবনের উপবন, বার্ধক্যের বারাণসী, এবং অতি শৈশবকাল থেকেই তিনি পরাধীনতার নাগপাশে জর্জরিতা ভারতমাতার সর্বাত্মক মুক্তির স্বপ্ন দেখতেন। ভগিনী নিবেদিতা লিখছেন—"যে মুহূর্তে আমি তাঁহার সহিত ভারতবর্ষে পদার্পণ করিলাম, সেই মুহূর্ত হইতে তাঁহার মৃত্যুদিন পর্যন্ত আমার গুরুদেবের মধ্যে .....এক অগ্নির নিরন্তর দহন-জ্বালা লক্ষ্য করিয়াছি; সে কোন তত্ত্ব, কোন আধ্যাত্মিক সত্যের উপাসনা বা উন্মাদনা নয়—দেশ ও জাতির দুর্দশা-নিবারণের প্রাণান্ত প্রয়াস, ও তাহার নিষ্ফলতার জন্য মর্মান্তিক যাতনাভোগ।" (বীর-সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ, মোহিতলাল মজুমদার, ১৩৭০, পৃঃ ৯০-এ উদ্ধৃত)। স্বদেশী বাংলার বিখ্যাত জাতীয়তাবাদী সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ-বন্ধু ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় বলছেন—"তাহার সকরুণ একাগ্রতা দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, লোকটার হৃদয় বেদনাময়-ব্যথায় প্রপীড়িত।......দেশের জন্য বেদনা, দেশের জন্য ব্যথা।......বিবেকানন্দের হৃদয়ে ইহার যন্ত্রণাময় সাড়া পড়িয়াছিল।......ঐ ব্যথার কথা ভাবি—বেদনার কথা চিন্তা করি—আর জিজ্ঞাসা করি—বিবেকানন্দ কে! দেশের জন্য ব্যথা কি কখন শরীরিণী হয়?

যদি হয় ত বিবেকানন্দকে বুঝা যাইতে পারে।" (বিশ্ববিবেক, সম্পাদনা—অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শঙ্করীপ্রসাদ বসু, শংকর, ১৯০১, ৯৩)।

স্বামীজীর কাছে ভারত ছিল 'পুণ্যভূমি' 'দেবভূমি', 'সভ্যতা ও সংস্কৃতির পীঠস্থান', 'প্রাচ্যের সংস্কৃতি-ভূমি' এবং তিনি বিশ্বাস করতেন যে, ভারতীয় সংস্কৃতিই হল পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। ভারতের সুমহান সভ্যতা সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে তিনি প্রগাঢ় শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। পরপদানত হীনম্মন্য দেশবাসীকে তিনি জানান যে, ভারতের অতীত ছিল গৌরবোজ্জ্বল এবং ভবিষ্যৎ হবে অধিকতর গৌরবোজ্জ্বল। আধুনিক বিশ্বের জড়বাদী সভ্যতাকে দান করার মত সম্পদ ভারতের আছে এবং তা হল ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা—এই আধ্যাত্মিকতাই একদিন পৃথিবী জয় করবে। বিবেকানন্দ-ভ্রাতা বিপ্লবী ভূপেন্দ্রনাথ বলছেন যে, স্বামীজীর প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল জাতীয়তাবাদ। তাঁর লক্ষ্য ছিল আনন্দমঠে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবাদী আদর্শের অনুরূপ। তাঁদের দৃষ্টিতে ভবিষ্যৎ ভারতমাতা ছিলেন দানবদলনী দশপ্রহরণ-ধারিণী, বরাভয়দায়িনী দুর্গা। (স্বামী বিবেকানন্দ, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ১৩৭৩ ২০৫)। বঙ্কিমচন্দ্রের মতই স্বামীজী দেখেছিলেন ভবিষ্যৎ ভারত-মাতার এক সর্বাঙ্গ-সুন্দরী ষড়ৈশ্বর্যশালিনী মূর্তি। মাদ্রাজে এক বক্তৃতায় যুবসমাজের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন—"ভারত প্রাচীনকালে যতদূর উচ্চ গৌরব-শিখরে আরূঢ় ছিল, তাহাকে তদপেক্ষা উচ্চতর, উজ্জ্বলতর, মহত্তর, অধিকতর মহিমামণ্ডিত করিবার চেষ্টা কর।" (৫:১৮২)।

(স্বামীজী জানতেন যে, পরশাসনাধীনে বাস করে দেশমাতাকে তাঁর হৃতগৌরবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয়। এজন্য দরকার স্বাধীনতা—রাজনৈতিক স্বাধীনতা। কেবলমাত্র অতীন্দ্রিয় মোক্ষ বা মায়ার বন্ধন মোচনই নয়, প্রয়োজন মানুষের বৈষয়িক ও সামাজিক মুক্তি। তাঁর মতে—"উন্নতির মুখ্য সহায়-স্বাধীনতা। যেমন মানুষের চিন্তা করিবার ও উহা ব্যক্ত করিবার স্বাধীনতা আবশ্যক, তদ্রূপ তাহার খাওয়া-দাওয়া, পোষাক, বিবাহ ও অন্যান্য সকল বিষয়েই স্বাধীনতা আবশ্যক—যতক্ষণ না তাহার দ্বারা অপর কাহারও অনিষ্ট হয়।" তিনি বলেন—"সর্ববিষয়ে স্বাধীনতা, অর্থাৎ মুক্তির দিকে অগ্রসর হওয়াই পুরুষার্থ।" রাজনৈতিক স্বাধীনতা ব্যতীত অন্যান্য স্বাধীনতা অর্থহীন, তাই তিনি মনে করতেন যে, রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রয়োজন

সর্বাগ্রে। ১৯০১ সালে ঢাকায় তিনি বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষকে বলেছিলেন যে, রাজনৈতিক দিক থেকে ভারতকে মুক্ত হতে হবে সর্বাগ্রে—"India should be freed politically first". ভারতীয় জাতীয় জাগরণের অন্যতম ঋত্বিক সাহিত্য সম্রাট প্রবীণ বঙ্কিমচন্দ্র মনে করতেন যে, স্বজাতির কুশাসন অপেক্ষা পরজাতির সুশাসন বাঞ্ছনীয়। যুবক বিবেকানন্দ কিন্তু সর্বপ্রকার পরশাসনের বিরুদ্ধে ছিলেন। "তবু স্বাধীনতা এক জিনিস, গোলামী আর এক; পরে যদি জোর করে করায় তো অতি ভাল কাজও করতে ইচ্ছা যায় না।...... স্বর্ণ-শৃঙ্খলযুক্ত গোলামির চেয়ে একপেটা ছেঁড়া ন্যাকড়া-পরা স্বাধীনতা লক্ষগুণে শ্রেয়ঃ। গোলামের ইহলোকেও নরক। পরলোকেও তাই।" (৬।১৩৫)।

স্বৈরাচারী ইংরেজ শাসনের স্বরূপ সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত সচেতন ছিলেন এবং তিনি জানতেন যে, ইংরেজের অপশাসন ও শোষণের ফলেই স্বর্ণপ্রসূ ভারত হীনবীর্য ও তমসাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের তিনি নিষ্ঠুর সমালোচক ছিলেন—চিঠিপত্র ও নানা কথাবার্তাতে তিনি কঠোরভাবে ইংরেজ শাসনের সমালোচনা করেছেন। ১৮৯৫ সালে আমেরিকায় প্রদত্ত এক বক্তৃতায় তিনি বলেন—"ইংরেজ শাসনের উপাদান হল তিনটি 'ব'- বাইবেল, বেয়নেট ও ব্রাণ্ডি। এরই নাম সভ্যতা। এই সভ্যতাকে এতদূর পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়েছে যে, একজন হিন্দুর গড়ে মাসিক আয় ৫০ সেণ্টে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।" ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩০-এ অক্টোবর মিস মেরী হেলকে লিখিত এক পত্রে স্বামীজী ভারতে ইংরেজ সরকারের নিষ্ঠুর দমননীতি, চরম অপদার্থতা এবং ঘৃণ্য ও স্বার্থান্বেষী অর্থনৈতিক অপশোষণের মর্মন্তুদ চিত্র তুলে ধরে ভারতে ইংরেজ শাসনের প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটিত করেছেন। ছত্রে ছত্রে পরাধীনতার জ্বালা আর হতাশা—"মেরী, আমাদের কোন আশা নেই, যদি না সত্যি......ভগবান থাকেন।" তিনি লিখছেন—"রক্তশোষণই যেখানে মূল উদ্দেশ্য সেখানে মঙ্গলকর কিছু হতে পারে না। মোটের উপর, পুরানো শাসন জনগণের পক্ষে এর চেয়ে ভাল ছিল, কারণ তা তাদের সর্বস্ব লুঠ করে নেয়নি এবং সেখানে অন্ততঃ কিছু সুবিচার—কিছু স্বাধীনতা ছিল।......

"শিক্ষাবিস্তারও বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা অপহৃত, (অবশ্য আমাদের নিরস্ত্র করা হয়েছে অনেক আগেই) যেটুকু স্বায়ত্তশাসন কয়েক বছরের জন্য দেওয়া হয়েছিল, অবিলম্বে তা কেড়ে নেওয়া হয়েছে।

দেখছি, আরও কী আসে! কয়েকছত্র সমালোচনার জন্য লোককে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে, বাকীরা বিনা বিচারে জেলে। কেউ জানে না, কখন কার ঘাড় থেকে মাথা উড়িয়ে দেওয়া হবে।

"ভারতবর্ষে কয়েক বছর ধরে চলেছে ত্রাসের রাজত্ব। বৃটিশ সৈন্য আমাদের পুরুষদের খুন করেছে, মেয়েদের মর্যাদা নষ্ট করেছে, বিনিময়ে আমাদেরই পয়সায় জাহাজে চড়ে দেশে ফিরেছে পেনসন ভোগ করতে। ভয়াবহ নৈরাশ্যে আমরা ডুবে আছি। কোথায় সেই ভগবান? মেরী, তুমি আশাবাদী হতে পার, কিন্তু আমি কি পারি? ধর, এই চিঠিখানাই যদি তুমি প্রকাশ করে দাও — ভারতের নূতন কানুনের জোরে ইংরেজ সরকার আমাকে এখান থেকে সোজা ভারতে টেনে নিয়ে যাবে এবং বিনা বিচারে আমাকে হত্যা করবে।" (সমগ্র পত্রটির জন্য বাণী ও রচনা, ৮ম, ৭০-৭২ দ্রষ্টব্য)।

ভারত-ইতিহাসের সংগে পরিচিত ব্যক্তিমাত্রই বুঝতে পারবেন যে, স্বামীজীর এই চিঠির মধ্যে বিন্দুমাত্র অতিশয়োক্তি নেই। প্রেস অ্যাক্ট, আর্মস্ অ্যাক্ট, পুণা-প্লেগ দমনে সরকারী অত্যাচার ও নারীর শ্লীলতাহানি, তিলকের কারাবরণ, লর্ড কার্জনের শিক্ষা-সঙ্কোচন নীতি ও কলকাতা কর্পোরেশন আইন, ১৭৫৭-এর পর থেকে ভারতের বিভিন্ন অংশের দুর্ভিক্ষ, বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর প্রতি সরকারী নীতি—এ সবের বিরুদ্ধেই ক্ষোভ প্রকাশিত হয়েছে স্বামীজীর চিঠিতে।

পরাধীনতার এই জ্বালা থেকে মুক্তির উপায় কি? (১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত সর্বভারতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কি পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করে মানুষকে প্রকৃত সর্বাঙ্গীন মুক্তির স্বর্গরাজ্যে পৌঁছে দিতে পারবে? ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে এক প্রশ্নের উত্তরে স্বামীজী বলেন যে, কংগ্রেস "আন্দোলন দ্বারা ভবিষ্যতে বিশেষ শুভফল লাভের সম্ভাবনা আছে মনে করি এবং অন্তরের সহিত উহার সিদ্ধি কামনা করি।" বস্তুতঃ, কংগ্রেস তখন ছিল নরমপন্থীদের (Moderates) হাতে। ইংরেজী শিক্ষিত ধনিকশ্রেণী পরিচালিত ও ধনিক স্বার্থেই নিয়ন্ত্রিত কংগ্রেসের সংগে দেশের খেটে-খাওয়া বিরাট সংখ্যক সাধারণ মানুষের কোন সম্পর্কই ছিল না। তখন কংগ্রেসের লক্ষ্য ছিল কিছু শাসনতান্ত্রিক সুবিধা লাভ, এর সদস্য ছিল নবগঠিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় এবং কর্মপদ্ধতি ছিল আবেদন নিবেদন। বলা বাহুল্য, কংগ্রেসের

এই লক্ষ্য, গঠনতন্ত্র ও কর্মপদ্ধতি ছিল ভ্রান্ত, অবৈধ ও নিন্দনীয়। তরুণ অরবিন্দ ঘোষ সেদিন 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস'-কে 'ইণ্ডিয়ান আন্-ন্যাশনাল কংগ্রেস' বলে অভিহিত করেছিলেন।

স্বামীজীও কংগ্রেসের দুর্বল পথ মত ও নীতিকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছেন। আবেদন-নিবেদন নয়—তিনি চান বলিষ্ঠ নীতি, জনগণকে উপেক্ষা করা নয়—তিনি চান গণমুখী সংগঠন, ভিক্ষা নয়—তিনি চান দাবি ও সংগ্রাম। তিনি বলছেন—বেনিয়ার কাছে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে গিয়ে কোন লাভ নেই—"ভারতের লোকগুলো কংগ্রেস কংগ্রেস করে মিছামিছি হৈ-চৈ করছে কেন? কতকগুলো হাউড়ো লোক এক জায়গায় জুটে কেবল গলা-বাজি করলেই কি কাজ হয়? চেপে বসুক, নিজেদের Independent বলে declare করুক, হেঁকে বলুক 'আজ থেকে আমরা স্বাধীন হলাম', আর সমস্ত স্বাধীন Government-কে নিজেদের declaration-পত্র পাঠিয়ে দিক; তখন একটা হৈ চৈ উঠবে। ......কেবল গলা-বাজিতে কাজ হয়? বেপরোয়া হয়ে কাজ করতে হবে। বিধিমতে কাজ করে যাব, তাতে যদি গুলি বুকে পড়ে, প্রথমে আমার বুকে পড়ুক।......পড়ুক গুলি আমার বুকে; আমেরিকা, ইউরোপ একবার কি রকম কেঁপে উঠবে! ......কংগ্রেস জোর-গলায় নিজেদের স্বাধীনতা declare করুক, শুধু মাগীদের মতন বসে বসে কাঁদুনি গাইলে কি হবে?" (লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ, মহেন্দ্রনাথ দত্ত, ১ম খণ্ড, ১৩৬০, ১৯০-৯১)।

ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের রচনা থেকে জানা যায় যে, রাজনৈতিক মতাদর্শে স্বামীজী 'বিপ্লববাদী' ছিলেন এবং সন্ন্যাস-জীবনের প্রথমপর্বে বিদেশী শাসনের কবল থেকে তিনি দেশকে মুক্ত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন—অবশ্য এ সম্পর্কে ভূপেন্দ্রনাথের কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল না। স্বামীজীর শিষ্যা ভগিনী ক্রিশ্চিনের কাছ থেকে তিনি এ সম্পর্কে শুনেছিলেন। স্বামীজী ভগিনী ক্রিশ্চিনকে নাকি বলেছিলেন যে, বিদেশী শাসন উচ্ছেদ করার উদ্দেশ্যে তিনি ভারতীয় রাজন্যবর্গকে নিয়ে একটি শক্তিজোট গঠন করতে চেয়েছিলেন, এই উদ্দেশ্যেই তিনি হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত ভ্রমণ করেন এবং বন্দুক-নির্মাতা স্যার হিরাম ম্যাক্সিমের সংগে বন্ধুত্ব করেন। দেশের কাছ থেকে তিনি তখন কোন সাড়া পান নি। তিনি দেখেন যে, দেশ মৃত—তাই তিনি জাতি গঠনের কাজে হাত দিলেন। বিপ্লবী দল গড়ার কাজে স্বামীজী আর কি

করেছিলেন তাও তিনি ভগিনী ক্রিস্টিনকে বলেন, কিন্তু মন্ত্রগুপ্তির কারণে তিনি তা ভূপেন্দ্রনাথকে বলেন নি। দেশীয় রাজন্যবর্গের সংগে স্বামীজীর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল ঠিকই—তাদের সংগে গোপনে বিপ্লবসংক্রান্ত কিছু আলোচনাও অসম্ভব নয়। সরকারী নথিপত্র থেকে জানা যায় যে, আমেরিকা যাত্রার পূর্বে এবং নয়-এর দশকের প্রথমভাগে পশ্চিমভারতীয় রাজন্যবর্গের সংগে স্বামীজীর ঘনিষ্ঠতা তৎকালীন ভারতীয় গোয়েন্দা বিভাগের প্রধানেরও দৃষ্টি এড়ায় নি। (চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ গ্রন্থে জীবন মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ, পৃঃ ১৩০-৩১ দ্রষ্টব্য)। দেশীয় রাজন্যবর্গের সংগে এই ঘনিষ্ঠতা প্রসংগে স্বামীজী বলেছেন যে, শাসক সম্প্রদায়ের মনে "প্রজারঞ্জনের বীজ" উপ্ত করার জন্যই তিনি রাজদ্বারে ঘুরেছিলেন। কেবলমাত্র এ সময়েই নয়, পরবর্তীকালেও সর্বদাই স্বামীজীর ওপর পুলিশের তীক্ষ্ম দৃষ্টি ছিল। এ সম্পর্কে বহু নজির আছে—এমনকি তাঁর চিঠিও খোলা হত।

(বাংলার প্রথম যুগের বিপ্লবীদের কাছে স্বামীজী বিপ্লবীরূপেই প্রতিভাত ছিলেন। বিপ্লবী-নায়ক অরবিন্দ ঘোষ বলছেন—"সন্ন্যাসী হয়েও তিনি দেশের স্বাধীনতার কথা ভাবতেন ;···প্রত্যক্ষভাবে যে কাজ নিজে করেননি, তাঁর শিষ্যাকে তিনি সে কাজের ভার দিয়ে যান।" (পুরোধা, জুলাই, ১৯৬৭, পৃঃ ১৭)। ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের মতে, বাংলার প্রথম যুগের বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ স্বামীজীর বৈপ্লবিক কর্মপ্রয়াস সম্পর্কে অবহিত ছিলেন এবং বিপ্লবকর্মী সখারাম গণেশ দেউস্করের কাছে স্বামীজী নিজেই নাকি সে কাহিনী বিবৃত করেছিলেন। স্বামীজী তাঁকে বলেছিলেন—"সমস্ত দেশটা বারুদখানায় পরিণত হয়েছে। একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গই একে প্রজ্বলিত করে দিতে পারে ; আমার জীবদ্দশাতেই বিপ্লব প্রত্যক্ষ করে যাবো।" আগামী দিনে বিপ্লবের প্রকৃতি কি হবে এবং ভারতীয়রা বৈদেশিক সাহায্য নেবে কিনা—এ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে স্বামীজী বলেন, "না, ভারতবাসী চতুর্থবার এ ভুল আর করবে না।") (স্বামী বিবেকানন্দ, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, পৃঃ ৩)। মহাসমাধির কিছুদিন পূর্বে ১৯০২ সালে ছাত্র কামাখ্যানাথ মিত্রকে (পরে বিহার ন্যাশনাল কলেজ ও পাটনা ল' কলেজের অধ্যাপক) বলেন যে, 'এখন ভারতের প্রয়োজন হচ্ছে বোমা'—'What India needs today is bomb'। (ঐ, পৃঃ ১১২)। বলা বাহুল্য, এর কয়েক বছর বাদেই ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশে বোমার আবির্ভাব ঘটে এবং

স্বামীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত মৃত্যুভয়হীন একদল যুবক বোমা হাতে স্বৈরাচারী ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। ভূপেন্দ্রনাথের বক্তব্যগুলি সম্পর্কে কোন প্রমাণ আমাদের হাতে নেই—এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি আবিষ্কৃত হলে স্বামীজীর জাতীয়তাবাদী চরিত্রের এক নূতন দিক উদ্ঘাটিত হবে।)

ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের বিবরণ অনুসারে বিপ্লব-প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে স্বামীজী যখন দেখলেন যে দেশ প্রস্তুত নয়—'দেশের সর্বাঙ্গে আজ পচন ধরেছে'—তখন তিনি জাতিসংগঠনের কাজে নামলেন। বলা বাহুল্য, স্বামীজী নিজে সর্বপ্রকার রাজনৈতিক যোগাযোগের কথা অস্বীকার করেন এবং তাঁর কোন বক্তব্যের ওপর রাজনীতি আরোপকেও তিনি সরাসরি নিন্দা করেছেন। (৬।৪৯২)

(স্বাভাবিকভাবেই মনে প্রশ্ন জাগে যে, নিজে পূর্ণ স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষী এবং জনজীবনে স্বাধীনতার পূর্ণ প্রেরণাস্বরূপ হওয়া সত্ত্বেও, কেন তিনি প্রকাশ্য রাজনীতিতে যোগ দিলেন না? প্রথমতঃ, তিনি সন্ন্যাসী, তাঁর কাছে ঈশ্বরই সত্য—আধ্যাত্মিক আলোকে মানুষের মনের অজ্ঞানতা দূর করাই তাঁর কাম্য। দ্বিতীয়তঃ, তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র হল 'Man-making'—মানুষ তৈরী করা। তাঁর মতে দেশের ভালমন্দ, স্বাধীনতা-পরাধীনতা সবই দেশবাসীর ওপর নির্ভরশীল এবং জনসাধারণ যে শাসনব্যবস্থার উপযুক্ত, দেশে সেই শাসনব্যবস্থাই প্রতিষ্ঠিত হয়। উদাহরণ হিসেবে তিনি চীনের রাজনৈতিক ব্যবস্থা ধ্বংসের কথা বলেছেন, কারণ "চীন তাহার সামাজিক প্রথা অনুযায়ী মানুষ তৈয়ার করিতে পারিল না।" সুতরাং সর্বাগ্রে দরকার মানুষ। প্রকাশ্য রাজনীতিতে যোগ দিয়ে কারারুদ্ধ হয়ে বৃথা সময় ও শক্তি ক্ষয় করা অপেক্ষা 'মানুষ' তৈরী করে জাতিগঠন করা অধিকতর ফলপ্রসূ। এ কারণে স্বামীজী নেমেছিলেন জাতিগঠনের কাজে—দেশ গঠন হলে, জাতিগঠন হলে দেশের উন্নতি হবেই হবে। এ কারণে স্বামীজী দেশের সামনে একটি পরিকল্পনা রাখেন এবং সেই পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার দায়িত্ব তিনি অর্পণ করেছেন যুবকদের ওপর।)

কেমন যুবক চাই

স্বামীজী তাঁর কাজের জন্য একদল যুবক চেয়েছিলেন। এই যুবকদেরই সন্ধান করেছেন তিনি চিরকাল। নানা স্থানে নানাজনের কাছে তিনি সেই সব আদর্শ যুবকদের কথা বলেছেন।' মিনমিনে-পিনপিনে যুবক নয়—"আমি চাই a band of young Bangal (একদল যুবক বাঙালী); এরাই দেশের আশ্রয় আশা-ভরসাস্থল। চরিত্রবান্, বুদ্ধিবান্, পরার্থে সর্বত্যাগী এবং আজ্ঞানুবর্তী যুবকগণের উপরেই আমার ভবিষ্যৎ ভরসা—আমার idea (ভাব) গুলি যারা work out (কাজে পরিণত) করে নিজেদের ও দেশের কল্যাণে জীবনপাত করতে পারবে। নতুবা দলে দলে কত ছেলে আসছে ও আসবে। তাদের মুখের ভাব তমোপূর্ণ, হৃদয় উদ্যমশূন্য, শরীর অপটু, মন সাহসশূন্য। এদের দিয়ে কি কাজ হয়? নচিকেতার মতো শ্রদ্ধাবান্ দশ-বারটি ছেলে পেলে আমি দেশের চিন্তা ও চেষ্টা নূতন পথে চালনা করে দিতে পারি।" (৯।২১৭)।।

আরেকদিন তিনি বলেন—"উৎসাহী ও অনুরাগী কতকগুলি যুবক পেলে আমি দেশটাকে তোলপাড় করে দেব। মাদ্রাজে জন-কতক আছে। কিন্তু বাঙলায় আমার আশা বেশী। এমন পরিষ্কার মাথা অন্য কোথাও প্রায় জন্মে না। কিন্তু এদের muscles-এ (মাংসপেশীতে) শক্তি নেই। Brain and muscles (মস্তিষ্ক ও মাংসপেশী) সমানভাবে developed (সুগঠিত, পরিপুষ্ট) হওয়া চাই। Iron nerves with a well intelligent brain and the whole world is at your feet (লোহার মত শক্ত স্নায়ু ও তীক্ষ্ন বুদ্ধি থাকলে সমগ্র জগৎ পদানত হয়)।" (৯।১৭)।

'হিন্দু বয়েজ স্কুল' নামে একটি ছোটখাট স্কুলের মালিক চণ্ডীচরণ বর্ধনের কাছে স্বামীজী কয়েকটি ছেলে চেয়েছিলেন। "আমি চাই বেশ সুস্থ-শরীর, কর্মঠ, সৎপ্রকৃতি কতকগুলি ছেলে, তাদের trained করতে চাই, যাতে তারা নিজেদের মুক্তিসাধনের জন্য ও জগতের কল্যাণ সাধনের জন্য প্রস্তুত হতে পারে।" (৯।৩৯১)।

বাল্যবন্ধু প্রিয়নাথ সিংহকে বলেছিলেন যে, "কতকগুলো ছেলে চাই, যারা সব ছেড়েছুড়ে দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করবে। তাদের life আগে তয়ের করে দিতে হবে, তবে কাজ হবে।" (৯।৩৯১)।'

। কথাপ্রসঙ্গে একদিন স্বামীজী তাঁকে বলেন যে, বাংলায় শিশুপাঠ্য কোন ভাল

বই নেই। প্রিয়নাথ সিংহ এ সম্পর্কে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বইগুলির কথা বললে স্বামীজী উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠে বলেন—"ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্য-স্বরূপ', 'গোপাল অতি সুবোধ বালক'—ওতে কোন কাজ হবে না। ওতে মন্দ বই ভাল হবে না।" (৯।৪০৫)। একবার মিনমিনে ভিজে-বেড়াল গোছের একটি ছেলে মঠে এসে স্বামীজীর কাছে জানাল যে, সে সাধু হতে চায়। স্বামীজী তার পা-থেকে মাথা পর্যন্ত একবার দেখে বললেন —"ওহে সাধু হওয়া অত সহজ নয়। আগে চুরি ডাকাতি করো গে যাও, তারপর সাধু।" (স্বামীজীর স্মৃতি সঞ্চয়ন, স্বামী নির্লেপানন্দ, ১৯০১, পৃ ৬৭)।

স্বামীজীর বাল্যবন্ধু প্রখ্যাত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় একবার একটি মেধাবী ভাল ছেলের সংগে স্বামীজীর পরিচয় করিয়ে দেবার ইচ্ছে প্রকাশ করলে স্বামীজী জিজ্ঞাসা করেন—"Is he a fanatic?" সতীশচন্দ্র বলেন—No। তখন স্বামীজী উত্তর দেন—"Then I have no need of him"—তাকে আমার প্রয়োজন নেই। 'ফ্যানাটিক' অর্থে এখানে তেজীয়ান—ধর্মের বা দেশের জন্য সে সর্বস্ব বলি দিতে প্রস্তুত কিনা, এমন যুবক। স্বামীজী এই ধরণের fanatic-ই চেয়েছিলেন। সতীশচন্দ্রের 'ডন সোসাইটি'-র অন্যতম সদস্য প্রখ্যাত বিনয়কুমার সরকার বলছেন—"বিবেকানন্দ চায় কেবল "ইন্‌স্পায়ার্ড ফ্যানাটিক" (এক বগ্‌গা পাগল) লোক। যারা কোন কিছুর জন্য ক্ষেপে না উঠে তাদের দ্বারা বিবেকানন্দ'র মতে কোন কাজ হয় না।......চাই একবগ্‌গা ক্ষ্যাপা।...... একটা নতুন দর্শন সন্দেহ নেই। মামুলি লোক দিয়ে বড় কিছু ঘটানো সম্ভব নয়।...একবগ্‌গা ক্ষ্যাপামির ভেতরই পাওয়া যায় যে-কোনো কর্মক্ষেত্রের জন্য জীবন ঘুরাবার চাবি।" (বিনয় সরকারের বৈঠকে, ১ম ভাগ, পৃঃ ২৫৬-৫৮)। উৎসাহী যুবক চাই—বারংবার নানা বক্তৃতায় তিনি সেই উৎসাহের কথাই বলেছেন। যুবকদের তিনি আহ্বান করে বলেছেন যে, তাদের হৃদয়ের উৎসাহাগ্নি যেন চিরপ্রজ্জ্বলিত থাকে।

তিনি চান নির্ভীক ভয়হীন বীর যুবক। যারা সর্বদা হতাশচিত্ত তাদের দিয়ে কোন কাজ হয় না। "বীরভোগ্যা বসুন্ধরা'—বীরই বসুন্ধরা ভোগ করে। বীর হ—সর্বদা বল্ 'অভীঃ অভীঃ'। সকলকে শোনা 'মাভৈঃ মাভৈঃ'—ভয়ই মৃত্যু, ভয়ই পাপ, ভয়ই নরক, ভয়ই অধর্ম, ভয়ই ব্যভিচার। জগতে যত কিছু Negative thoughts (নেতিবাচক ভাব) আছে, সে-

সকলই এই ভয়রূপ শয়তান থেকে বেরিয়েছে।" আমেরিকা থেকে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখছেন কাপুরুষত্বের চেয়ে পাপ নেই। তাদের উদ্ধার হয় না। এক ঘা খেয়ে দশ ঘা তেড়ে মারতে হবে, তবেই মানুষ। স্বামীজী নিজেকে 'শাক্ত মায়ের ছেলে' বলছেন। তাঁর মতে 'মিনমিনে, ভিনভিনে ছেঁড়া ন্যাতা তমোগুণ আর নরককুণ্ড' দুই-ই এক। ভাগবানের কাছে তাঁর প্রার্থনা তাঁকে যেন কাপুরুষ হয়ে মরতে না হয়। (৮।১০)।।

স্বামীজী চান আত্মবিশ্বাস যুবক। আত্মবিশ্বাস চাই। তিনি বলেছেন যে, যে নিজেকে বিশ্বাস করে না, সে নাস্তিক। প্রাচীন ধর্ম বলত—যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, সে নাস্তিক; কিন্তু নূতন ধর্ম বলছে—যে নিজেকে বিশ্বাস করে না, সেই নাস্তিক। (২।৩০)। তাঁর মতে পৃথিবীর ইতিহাস হল কয়েকজন আত্মবিশ্বাসী মানুষের ইতিহাস। সেই বিশ্বাই ভেতরের দেবত্ব জাগ্রত করে। মানুষই সবকিছু করতে পারে। মানুষ সেই অনন্ত শক্তিকে বিকশিত করতে উপযুক্ত চেষ্টা করে না বলেই বিফল হয়।। যখনই কোন ব্যক্তি বা জাতি আত্মবিশ্বাস হারায়, তখনই তাঁর বিনাশ হয়। (১।১৭২)। আত্মবিশ্বাস—অদৃষ্টে বিশ্বাস নয়। দুর্বল ব্যক্তিরাই জ্যোতিষ, ইন্দ্রজাল, দৈব, গুপ্তবিদ্যা, রহস্যবিদ্যা এবং ভুতুড়ে কাণ্ডর আশ্রয় নেয় (৫।১১৪) স্বামীজী বলছেন যে, তাঁর প্রিয় যুবকরা বরং নাস্তিক হোক, কিন্তু তারা যেন কুসংস্কার-গ্রস্ত নির্বোধ না হয়। (৫।১৭৩)।

তিনি আরও চাইতেন আজ্ঞাবহতা—সৈনিকের মত আজ্ঞাবহতা। স্বামী ব্রহ্মানন্দকে এক পত্রে তিনি লিখছেন—"আমি চাই তোমরা (কাজ করতে করতে) মরেও যাও, তবু তোমাদের লড়তে হবে। সৈন্যের মতো আজ্ঞাপালন করে মরে যাও এবং নির্বাণ লাভ কর, কিন্তু কোন প্রকার ভীরুতা চলবে না। (৮৮১)।" মঠে তরুণ সন্ন্যাসী ও শিষ্যদের উদ্দেশ্যে এক ভাষণে স্বামীজী বলেন—আজ্ঞাবহতা অতি প্রয়োজনীয়। মঠাধ্যক্ষ যদি নদীতে ঝাঁপ দিয়ে কুমীর ধরতে বলেন তবে তাও করতে হবে—কোন প্রতিবাদ চলবে না। আদেশ যদি অন্যায়ও হয় তবে প্রথমে কাজ করতে হবে, তারপর দরকার হলে প্রতিবাদ—আগে নয়। (৫।৩৫৭)।

স্বামীজী এই আজ্ঞাবহতার ওপর খুব জোর দিতেন। একবার কয়েকজন ব্রহ্মচারীকে সন্ন্যাসদানের পূর্বে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন—"তোমরা কি আমার

আদেশ অম্লানবদনে মানতে পারবে? আমি যদি তোমাদের বাঘের সামনে বা বিষধর সাপের সামনে যেতে বলি, যদি বলি গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়ে কুমীর ধরে আন, যদি বাকি জীবন আসামের চা-বাগানে কুলী হিসাবে কাজ করার জন্য বেচে দিই, অথবা যদি না খেয়ে মরতে বলি বা তুষানলে পুড়ে মরতে বলি—এই ভেবে যে এতে তোমাদের মঙ্গল হবে—তবে তোমরা আমার কথা তখনি মানতে রাজী আছ কি?" ব্রহ্মচারীরা অবনতমস্তক স্বামীজীর কথায় স্বীকৃতি জানালেন। তারপর তিনি তাঁদের সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষা দেন। 'স্বামী-শিষ্য সংবাদ' রচয়িতা শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে মন্ত্রদীক্ষা দানকালে স্বামীজী অনুরূপ প্রশ্ন করেছিলেন। স্বামীজীর মতে স্বাধীনচিন্তা ও আজ্ঞাবহতা—পরস্পর-বিরোধী বলে মনে হতে পারে, কিন্তু এই দুটি অবশ্যই চাই।

তিনি চান শিক্ষিত যুবক—ইংরেজী লেখাপড়া জানা যুবক। শিক্ষিত কর্মী হলে সব দিকেই সুবিধা। তারা কাজ, কাজের আদর্শ এবং মানুষের প্রয়োজন ঠিক ঠিক ভাবে বুঝতে পারবে। তিনি আলাসিঙ্গাকে লিখছেন—"শিক্ষিত যুবকগণের মধ্যে কার্য কর, তাহাদিগকে একত্র করিয়া সংঘবদ্ধ কর।" (৬।৪৩০)। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখছেন—"ইংরেজী লেখাপড়া-জানা youngmen (যুবক)-দের ভিতর কার্য করতে হবে" (৬।৪৯০)। যুবকরা হবে নচিকেতার মত শ্রদ্ধাবান, সাহসী, বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ও বৈরাগ্য-পরায়ণ। (৯।১৪)। সেই সংগে তারা হবে "সব দিকে Practical (কাজের লোক)।" (৯।৯৫)।

তাহলে দেখা যাচ্ছে: স্বামীজী চান এমন একদল শিক্ষিত, চরিত্রবান, বুদ্ধিমান, শ্রদ্ধাবান, সর্বত্যাগী, উৎসাহী, আজ্ঞানুবর্তী, নির্ভীক, শক্তসামর্থ ও বাস্তব জ্ঞানসম্পন্ন যুবক—যারা অবিচল শ্রদ্ধা ও অটুট বিশ্বাসে একটি উচ্চ আদর্শের জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত। লৌহকঠিন ইস্পাতনির্মিত স্নায়ু, বজ্রদীপ্ত উপাদানে গঠিত মন এবং ক্ষাত্রবীর্য ও মনুষ্যত্বকে সম্বল করে এই যুবকরাই নূতনভাবে রচনা করবে দেশ ও জাতির ইতিহাস।

তৈত্তিরীয় উপনিষদের কথা উদ্ধৃত করে স্বামীজী বলছেন যে, "আশিষ্ঠো দ্রঢ়িষ্ঠো বলিষ্ঠো মেধাবী" যুবকদের দ্বারাই তাঁর কার্য সম্পন্ন হবে (৫।২০২, ২৯৫)। তৈত্তিরীয় উপনিষদ বলছে—'যুবা স্যাৎ সাধু যুবাধ্যায়কঃ। আশিষ্ঠো দ্রঢ়িষ্ঠো বলিষ্ঠঃ। তস্যেয়ং পৃথিবী সর্বা বিত্তস্য পূর্ণা স্যাৎ। স একো মানুষ

আনন্দঃ। তে যে শতং মনুষ্যা আনন্দাঃ" (২।৮।২)।—যদি কোন যুবা সাধুচিত্ত, বেদজ্ঞ, সর্বোত্তম শাসক, দৃঢ় শরীরযুক্ত ও অতি বলবান হয়, তাহলে সমগ্র পৃথিবী সকল ঐশ্বর্যসহ তার কাছে ধরা দেবে এবং সেখানে সর্বোত্তম আনন্দ বিরাজ করবে। (সুতরাং স্বামীজী চান যে, তাঁর মনের মানুষ যুবকেরা হবে—সাধুচিত্ত, অধ্যয়নশীল, দক্ষ, দৃঢ়দেহী ও বলবান।)

নানাস্থানে নানা বক্তৃতায় স্বামীজী বলেছেন—"মানুষ চাই, মানুষ চাই; আর সব হইয়া যাইবে।" (৫।১১৩)। যুবকদের তিনি আহ্বান জানিয়েছেন—"এস, মানুষ হও।" (৬।৩৫৮)। তিনি বলছেন—"ভারতমাতা অন্ততঃ সহস্র যুবক বলি চান। মনে রেখো—মানুষ চাই, পশু নয়।" (৬।৩৫৯)। মা জগদম্বার কাছে তিনি নিজেও প্রার্থনা জানিয়েছেন—"মা আমায় মানুষ কর।" শিষ্যদের তিনি বলেছেন, "Be and Make"—নিজে মানুষ হও এবং অন্যকে মানুষ করো। "Man-making is my mission"—মানুষ তৈরীই আমার জীবনের ব্রত। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, যার মান এবং হুঁস—দুই-ই আছে, সেই মানুষ। মান অর্থাৎ সম্মান, আত্মসম্মান, আত্মবিশ্বাস। 'হুঁস' কথার অর্থ হল বোধ, চেতনা, বিবেক, ভাল-মন্দ জ্ঞান। এই মান এবং হুঁসই মানুষকে পশু থেকে পৃথক করেছে। মানুষের আত্মসম্মান আছে, আত্মবিশ্বাস আছে, বিবেক আছে, হৃদয় আছে, চেতনা এবং ভাল-মন্দ বোধ আছে—এজন্যই সে মানুষ—পশু নয়। (৫।৩৫৬-৫৭)। এ ধরণের মানুষই তিনি চেয়েছিলেন।

এখানে স্বামীজীর আত্মসম্মান বা আত্মমর্যাদাবোধের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। এই আত্মমর্যাদার জন্যই তিনি কখনই কোথাও মাথা নত করেন নি—রাজদ্বার থেকে ধনীর প্রাসাদ সর্বত্রই তাঁর মাথা চির-উন্নত। এই আত্মসম্মানবোধই তাঁকে প্রণোদিত করেছিল নিন্দুক মিশনারীর জামার কলার ধরে তাকে জাহাজ থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেবার ভয় দেখাতে। তিনি স্বীকার করতেন যে, ভারতের সমাজ ও ধর্মে নানা দোষ আছে, এগুলি সংশোধন করা ভারতীয়দের সর্বতোভাবে কর্তব্য, কিন্তু সংবাদপত্রে এসব ঘোষণার মাধ্যমে ইংরেজদের কাছে এগুলির প্রচার তিনি নিন্দনীয় বলে মনে করতেন। তিনি বলতেন যে, ঘরের গলদ যে বাইরে দেখায়, তার মত গর্দভ আর কে আছে!

আরেকটি ঘটনা। প্রথমবার আমেরিকা যাত্রার প্রাক্কালে স্বামীজী আবু রোড স্টেশনে ট্রেনে উঠে বসেছেন। এক বাঙালী ভক্ত স্বামীজীকে বিদায় জানাতে

এসে ট্রেনে বসে তাঁর সংগে কথাবার্তা বলছেন। এ সময় এক ইংরেজ টিকিট পরীক্ষক এসে ঐ বাঙালী ভদ্রলোককে নেমে যেতে বললেন। ভদ্রলোক রেলের চাকুরে, তাই চেকারের বক্তব্যে আমল দিলেন না, বরং তার সংগে তর্ক জুড়ে দিলেন। স্বামীজী নিরুপায় হয়ে তাঁদের ঝগড়া থামাতে গেলে সাহেব চেকার প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে পড়েন এবং স্বামীজীকে সাধারণ সন্ন্যাসী মনে করে রূঢ় ভাষায় হিন্দীতে ধমক দেন—"তুম কাহে বাত করতে হো ?

স্বামীজীও সংগে সংগে ইংরেজীতে গর্জে উঠলেন—"তুম্, তুম্, করছ কাকে ? উচ্চশ্রেণীর যাত্রীর সংগে কি করে কথা বলতে হয় জান না ? 'আপ' বলতে পার না ?"

সাহেব বেগতিক দেখে স্বামীজীকে বললেন—"অন্যায় হয়েছে। আমি হিন্দী ভাষাটা ভাল জানি না। আমি শুধু ও লোকটাকে··· ।"

স্বামীজীর আর সহ্য হল না। কথা শেষ করতে না দিয়েই তিনি তীব্রকণ্ঠে বলে উঠলেন—"তুমি এই বললে হিন্দী ভাষা জান না। এখন দেখছি, তুমি তোমার নিজের ভাষাও জান না। 'লোকটা' কি ? 'ভদ্রলোক' বলতে পার না ? তোমার নাম ও নম্বর দাও, আমি ওপরওয়ালাকে জানাব।"

ইতিমধ্যে চারিদিকে ভীড় জমে গেছে। সাহেবও পালাতে পারলে বাঁচেন। স্বামীজী তাও চীৎকার করে বললেন—"এই শেষবার বলছি, হয় তোমার নম্বর দাও —না হয় লোকে দেখুক তোমার মত কাপুরুষ দুনিয়ায় নেই।"

প্রবল প্রতিরোধের মুখে সাহেবের অবস্থা শোচনীয়। বস্তুতঃ ভারতীয়দের কাছ থেকে এ ধরনের প্রতিরোধ পেতে ইউরোপীয়রা অভ্যস্ত নয়। সাহেব কোন ক্রমে পালিয়ে বাঁচলেন। সাহেব চলে গেলে খেতরী-রাজের প্রাইভেট সেক্রেটারী মুন্সী জগমোহনের দিকে তাকিয়ে স্বামীজী বললেন—"ইওরোপীয়দের সংগে ব্যবহার করতে গেলে আমাদের কি চাই দেখছ ? এই আত্মসম্মানজ্ঞান। আমরা কে, কি দরের লোক না বুঝে ব্যবহার করাতেই লোকে আমাদের ঘাড়ে চড়তে চায়। অন্যের কাছে নিজেদের মর্যাদা বজায় রাখা চাই। তা না হলেই তারা আমাদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও অপমান করে—এতে দুর্নীতির প্রশ্রয় দেওয়া হয়। শিক্ষা ও সভ্যতায় হিন্দু জগতের কোন জাতির চেয়ে হীন নয় ; কিন্তু তারা নিজেদের হীন মনে করে বলেই একটা সামান্য বিদেশীও আমাদের লাথি ঝাঁটা মারে—আর আমরা চুপ করে তা হজম করি।"

স্বামীজী তাঁর শিষ্য 'স্বামী-শিষ্য-সংবাদ' রচয়িতা শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে আশীর্বাদ করে বলেন—"শ্রদ্ধাবান্ হ, বীর্যবান্ হ, আত্মজ্ঞান লাভ কর, আর 'পরহিতায়' জীবনপাত কর;—এই আমার ইচ্ছা ও আশীর্বাদ।" (৯।২৫৭)। বলা বাহুল্য, এই কথাগুলি কেবলমাত্র শরচ্চন্দ্রের উদ্দেশ্যেই উচ্চারিত হয় নি—সমগ্র যুবসমাজ—এমনকি সকল মানুষের প্রতিই এই হল স্বামীজীর উপদেশ। এই সামান্য ক'টি কথার মধ্যেই স্বামীজীর সকল আদর্শ ব্যক্ত হয়েছে। এই কথাক'টির মর্ম হৃদয়ঙ্গম করতে পারলেই স্বামীজীকে বোঝা যাবে।

স্বামীজীর মতে 'শ্রদ্ধা' কথার অর্থ হল বিশ্বাস—নিজের প্রতি—আত্মবিশ্বাস এবং অন্যের প্রতিও। 'শ্রদ্ধা' মানে সম্মান—নিজের প্রতি ও অন্যের প্রতি। তিনি বলেন যে, শ্রদ্ধাহীনতা অর্থাৎ আত্মবিশ্বাসের অভাবেই ভারতের দুর্দশা—অথচ যে কোন ব্যক্তি এবং জাতির জীবনে এটি একটি অবশ্য প্রয়োজনীয় গুণ। মানুষে মানুষে এবং জাতিতে জাতিতে তারতম্য এই শ্রদ্ধা বা আত্মবিশ্বাসের ফলেই। শ্রদ্ধার ফলেই পাশ্চাত্য জাতি আজ জড় জগতের ওপর আধিপত্য লাভ করেছে, কঠোপনিষদের নচিকেতার মধ্যে শ্রদ্ধার অনুপ্রবেশ হয়েছিল বলেই সে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করে মৃত্যুদেবতার সামনে হাজির হয়ে আত্মতত্ত্ব লাভে সক্ষম হয়েছিল। (৫।২১৬-১৭)। এই শ্রদ্ধাই প্রবল প্রতিরোধের মধ্যে মাথা তুলে দাঁড়াতে সাহস দেয় এবং মানুষকে দেয় বিশ্বজয়ের প্রেরণা। স্বামীজী তাই বলছেন—বীর হও, শ্রদ্ধাসম্পন্ন হও—আর সব তা হলে এমনিই আসবে। (৫।২১৭)। তিনি বলছেন—'মানুষ' তৈরী করতে গেলেও শ্রদ্ধা চাই। শ্রদ্ধা না থাকলে 'মানুষ' তৈরী হবে না (৯।৪২০।

স্বামীজী 'বীর্যবান' হতে বলছেন, সাহসী হতে বলছেন, সবল হতে বলছেন—চাইছেন সুস্থ শরীর-দেহ-মন। কোন প্রকার হীনত্বজ্ঞাপক চিন্তা বা মতবাদ নয়—মানুষের ভেতরেই দেবত্ব ও শক্তি বিদ্যমান। এই শক্তিকে জাগরিত করতে হবে, ভয় ত্যাগ করতে হবে—তেজস্বিতার সাধনা করতে হবে। এ জন্য প্রয়োজন লৌহদৃঢ় পেশী, ইস্পাত কঠিন স্নায়ু, এবং বজ্রদৃঢ় ইচ্ছাশক্তি—মানুষই তাঁর অদৃষ্টের সৃষ্টিকর্তা, সমস্ত শক্তি মানুষের ভেতরেই আছে। তাকে শুধু জাগরিত করতে হবে। স্বামীজীর মতে, শারীরিক দৌর্বল্যই সকল অনিষ্টের মূল। তাঁর মতে বীর্যলাভের প্রধান উপায় হল উপনিষদে বিশ্বাসী

হওয়া এবং নিজেকে সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান চিন্তা করা। তিনি বলছেন যে, উপনিষদের মূল কথা হল শক্তি—উপনিষদই শক্তির আকর। উপনিষদ যে শক্তি সঞ্চার করে তাতে সমগ্র জগৎ তেজস্বী, পুনরুজ্জীবিত, শক্তিমান ও বীর্যশালী হতে পারে—এর দ্বারাই সকল জাতির, সম্প্রদায়ের ও মতের দারিদ্র্যক্লিষ্ট ও নিপীড়িত মানুষ স্বাবলম্বী হতে পারে। (৫।১৩০)। দুর্বল, শারীরিক দিক থেকে অক্ষম, মিনমিনে লোকদের দিয়ে কাজ হবে না—চাই তেজস্বিতা ও বীর্যবত্তা, আর নিজের ওপর বিশ্বাসই শক্তিশালী ও বীর্যবান হবার উপায়। (৫।৩১৪)।

স্বামীজী "আত্মজ্ঞান" লাভ করতে বলেছেন। আমি কে, আমি কি—এ সম্পর্কে জ্ঞানলাভই হল আত্মজ্ঞান। আত্মজ্ঞান লাভ হলেই মানুষ জেগে ওঠে, আত্মার স্বরূপ সম্পর্কে সচেতন হয়, বুঝতে পারে আত্মা অবিনশ্বর—নিজের প্রতি বিশ্বাস জন্মায়। প্রত্যেক মানুষই ঈশ্বরের সন্তান, অমৃতের অধিকারী, সকলেই ব্রহ্মস্বরূপ। স্বামীজীর মতে, প্রত্যেক আত্মাই মেঘে ঢাকা, সূর্য। একজনের সংগে অন্যের তফাৎ কেবল এই যে—কোথাও সূর্যের ওপর মেঘের আবরণ ঘন, আর কোথাও একটু পাতলা। মানুষই ব্রহ্ম, ঈশ্বর, অনন্ত শক্তিমান। এই তত্ত্ব যে ব্যক্তির মধ্যে যত বেশী পরিমাণে প্রকাশিত তিনি তত মহৎ। মানুষই সৎ, মানুষই চিৎ, মানুষই আনন্দ—সচ্চিদানন্দ। এই বোধই আত্মজ্ঞান—এই বোধই মানুষকে শক্তিশালী আত্মবিশ্বাসী ও মহৎ করে এবং কেবলমাত্র শক্তিশালী ব্যক্তিরাই আত্মজ্ঞান লাভ করে।

স্বামীজী 'পরহিতে জীবনপাত' করতে বলছেন—অর্থাৎ তিনি মানুষের সেবা করতে বলছেন। দুঃখ-দারিদ্র্য ব্যথা-বেদনা অত্যাচার-বঞ্চনা অশিক্ষা-কুশিক্ষা কুসংস্কার ও শত শত শতাব্দীর দাসত্বে মানুষ পশুত্বের স্তরে নেমে এসেছে। শিক্ষা-স্বাস্থ্য-সম্পদ কিছুই নেই, রোগ-মহামারী-দুর্ভিক্ষে তাদের পাশে দাঁড়াবার মতও কেউ নেই। সামাজিক ও রাজনৈতিক অনাচারের চাপে তাদের মনুষ্যত্ব অবলুপ্ত। এই বিরাট সংখ্যক মানুষকে জাগাতে হবে—তাদের লুপ্ত মনুষ্যত্ব ফিরিয়ে দিতে হবে, তাদের শিক্ষা স্বাস্থ্য-সম্পদ দিতে হবে, রোগ-দুর্ভিক্ষ-মহামারীতে তাদের পাশে দাঁড়াতে হবে। এই সেবাই হল উপাসনা—বিরাটের উপাসনা। দয়া নয়—সেবা। শিবজ্ঞানে জীবের সেবা করতে হবে—জীবে প্রেমই ঈশ্বর সেবা। মঠ মন্দির গীর্জায় ঈশ্বর অন্বেষণের কোন

প্রয়োজন নেই—লাঞ্ছিত মানবাত্মাই ঈশ্বর—তাদের সেবাই ঈশ্বর উপাসনা। ঈশ্বরজ্ঞানে লাঞ্ছিত দরিদ্র মানুষের সেবা করতে হবে। এজন্য প্রয়োজন 'আত্মজ্ঞান'। যথার্থ আত্মজ্ঞানের উন্মেষ হলেই 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' সম্ভব।

তাহলে দেখা যাচ্ছে—স্বামীজী 'মানুষ' চেয়েছিলেন। শ্রদ্ধাবান, বীর্যবান, আত্মজ্ঞানসম্পন্ন এবং পরহিতে জীবন উৎসর্গীকৃত ব্যক্তিই স্বামীজী কথিত 'মানুষ'। স্বামীজী চেয়েছিলেন যে, তাঁর কাঙ্ক্ষিত যুবকরা 'মানুষ' হোক। তাঁর কাজ করার জন্য তিনি এই 'মানুষ' নামধারী যুবকদেরই চেয়েছিলেন। বস্তুতঃ তাঁর শ্রদ্ধা, বীর্য, আত্মবিশ্বাস, আজ্ঞাবহত্ব, চরিত্র, আত্মজ্ঞান, পরহিতব্রত, বিবেক, মানুষ—সব কথাগুলির মধ্যে একই ভাব বা দ্যোতনা বিদ্যমান। স্বামীজী কথিত 'মানুষ' পদবাচ্য এই যুবকরাই দেশ ও জাতির উন্নতির জন্য কর্মসমুদ্রে ঝাঁপ দেবে। তারাই হবে আগামী দিনের দেশসেবক ও দেশনায়ক।

দেশপ্রেমিক হওয়ার তিনটি শর্ত

স্বামীজী পরিকল্পিত কার্যক্রম দেশসেবার অংগ—দেশপ্রেম। তিনি স্বদেশহিতৈষণার আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন এবং এ সম্পর্কে তাঁর একটি নিজস্ব আদর্শ ছিল। স্বামীজীর স্বদেশহিতৈষণা পশ্চিমের আমদানি করা স্বদেশপ্রেম নয় বা তৎকালীন কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মত তিনদিনের জন্য দেশপ্রেমিক সাজার তামাশাও নয়। তাঁর মতে দেশপ্রেমিক হতে গেলে চাই তিনটি জিনিস—হৃদয়, পরিকল্পনা ও দৃঢ়তা।

ভাবীকালের দেশপ্রেমিক ও সমাজসংস্কারকদের উদ্দেশ্যে তিনি বললেন—"প্রথমতঃ হৃদয়বত্তা—আন্তরিকতা আবশ্যক।... তোমরা হৃদয়বান্ হও, প্রেমিক হও। তোমরা কি প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ যে, কোটি কোটি দেব ও ঋষির বংশধর পশুপ্রায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে? তোমরা কি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছ—কোটি কোটি লোক অনাহারে মরিতেছে, কোটি কোটি লোক শত-শতাব্দী ধরিয়া অর্ধাশনে কাটাইতেছে? তোমরা কি প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ—অজ্ঞানের কৃষ্ণমেঘ সমগ্র ভারতগগনকে আচ্ছন্ন করিয়াছে? তোমরা কি এইসকল ভাবিয়া অস্থির হইয়াছ? এই ভাবনায় নিদ্রা কি তোমাদিগকে পরিত্যাগ

করিয়াছে ? এই ভাবনা কি তোমাদের রক্তের সহিত মিশিয়া তোমাদের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইয়াছে—তোমাদের হৃদয়ের প্রতি স্পন্দনের সহিত কি এই ভাবনা মিশিয়া গিয়াছে ? এই ভাবনা কি তোমাদিগকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে ? দেশের দুর্দশার চিন্তা কি তোমাদের একমাত্র ধ্যানের বিষয় হইয়াছে এবং ঐ চিন্তায় বিভোর হইয়া তোমরা কি তোমাদের নামযশ, স্ত্রীপুত্র, বিষয়সম্পত্তি, এমন কি শরীর পর্যন্ত ভুলিয়াছ ? তোমাদের এরূপ হইয়াছে কি ? যদি হইয়া থাকে, তবে বুঝিও তোমরা প্রথম সোপানে—স্বদেশহিতৈষী হইবার প্রথম সোপানে মাত্র পদার্পণ করিয়াছ।"

দ্বিতীয়তঃ—স্বামীজী বলছেন যে, কেবলমাত্র দেশের জন্য প্রাণ কাঁদলেই হবে না—দেশের দুর্দশা দূর করার জন্য একটি সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত কর্ম-পন্থাও স্থির করতে হবে। তিনি জিজ্ঞাসা করছেন, এই দুর্দশা প্রতিকারের কোন উপায় স্থির করা হয়েছে কি ? বৃথাবাক্যে শক্তিক্ষয় না করে কোন পরিকল্পনা নির্ধারণ করা হয়েছে কি ? দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের বৃথা নিন্দা না করে বা তাদের গালাগালি না করে তাদের প্রকৃতই কি কোন সাহায্য করতে কেউ প্রস্তুত ? এটা হলে সে ব্যক্তি দেশপ্রেমিক হবার দ্বিতীয় ধাপে উঠেছে মাত্র। কিন্তু এটাই সব নয়।

তৃতীয়তঃ—তিনি চান দৃঢ়তা। তিনি বলছেন—"তোমরা কি পর্বতপ্রায় বাধাবিঘ্নকে তুচ্ছ করিয়া কাজ করিতে প্রস্তুত আছ ? যদি সমগ্র জগৎ তরবারি হস্তে তোমাদের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হয়, তথাপি তোমরা যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছ, তাহাই করিয়া যাইতে পারো কি ? যদি তোমাদের স্ত্রী-পুত্র তোমাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়, যদি তোমাদের ধন-মান সব যায়, তথাপি কি তোমরা উহা ধরিয়া থাকিতে পারো ?...... নিজ পথ হইতে বিচলিত না হইয়া তোমরা কি তোমাদের লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হইতে পারো ? তোমাদের কি এইরূপ দৃঢ়তা আছে ? যদি এই তিনটি জিনিস তোমাদের থাকে, তবে তোমরা প্রত্যেকেই অলৌকিক কার্য সাধন করিতে পারো।" (৫।১১৬-১৭)।

স্বামীজী-কল্পিত এ ধরণের দেশপ্রেমিক সত্যিই মেলা ভার। স্বামীজীর কালে—এমনকি আজও ভারতে দেশপ্রেমিকের অভাব নেই। পথে-ঘাটে মাঠে-ময়দানে আজ অনেক দেশপ্রেমিক, কিন্তু প্রকৃত হৃদয়বান এবং দৃঢ়চরিত্র ক'জন ? কোটিতে গুটিকও মেলে না।

একবার এক যুবক এসে স্বামীজীকে জানাল যে, সে শান্তি পাচ্ছে না। শান্তির অন্বেষণে ইতিপূর্বে সে নানা ধর্ম-সম্প্রদায়ে ঘোরাঘুরি করেছে। নানা জনের পরামর্শে নানা ভাবে সে ঈশ্বরের পূজার্চনা করেছে। বর্তমানে একজনের পরামর্শে দীর্ঘদিন ধরে যতক্ষণ সম্ভব ততক্ষণ সে ঘরের দরজা বন্ধ করে ঘরে বসে থাকে, কিন্তু কিছুতেই শান্তি মিলছে না। স্বামীজীর কাছে তার প্রশ্ন, কি করে সে শান্তি পাবে?

স্বামীজী তাঁর সংগে স্নেহপূর্ণভাবেই কথাবার্তা বলছিলেন। স্নেহের সুরেই তিনি বললেন যে, শান্তি পেতে গেলে ঘরের দরজাটি বন্ধ করা চলবে না—আগে তা খুলে দিতে হবে। বাড়ীর কাছে, পাড়ার কাছে অভাবগ্রস্ত মানুষদের যথাসাধ্য সাহায্য করতে হবে। পীড়িতকে ওষুধ, ক্ষুধার্তকে খাদ্য, মূর্খকে লেখাপড়া শেখাতে হবে। এভাবে মানুষের সেবা করলেই মনে শান্তি মিলবে।

যুবকটি বলল যে, রোগীর সেবা করতে গিয়ে রাত জেগে, সময়ে না খেয়ে, শরীরের ওপর অত্যাচার করে সে নিজেই তো রোগে পড়ে যাবে।

স্বামীজী এবার যুবকটির ওপর যথেষ্ট বিরক্ত হলেন এবং যুবকটির সংগে আর বিশেষ কথাবার্তা বললেন না। (৯।৩৩৫-৩৬)।

স্বামীজী এ ধরণের দুর্বলচিত্ত আত্মসর্বস্ব যুবক চান নি—বরং এমন ঘটনাও ঘটেছে যে, কোন যুবকের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও কেবলমাত্র তার হৃদয়বত্তার জন্য স্বামীজী তাকে কাছে টেনে নিয়েছেন। প্রথমবার পাশ্চাত্য-ভ্রমণের পর চারজন যুবক স্বামীজীর কাছে সন্ন্যাস গ্রহণ করে। এসময় একজনের বিরুদ্ধে বিশেষ কয়েকটি অভিযোগ করে তাকে যাতে কোন মতেই সন্ন্যাস দেওয়া না হয়—সেজন্য গুরুভাইরা স্বামীজীকে বারংবার অনুরোধ করেন। উত্তরে স্বামীজী বলেছিলেন যে, তাঁরা যদি পাপী-তাপী দীন-দুঃখী ও পতিতের উদ্ধারে পেছিয়ে আসেন, তাহলে তাদের কে দেখবে! গুরুভাইদের তিনি আপত্তি করেত নিষেধ করেন।.(৯'৪৭)। তিনি আরও বলেন যে, যুবকটি যখন মঠে আশ্রয় নিয়েছে তখন এটা স্পষ্ট যে তার মন বদলে গেছে। গুরুভাইদের তিনি বলেন যে,—তাঁরা যদি অসৎ ব্যক্তিকে সৎ করতে না পারেন, তাহলে তাঁদের গেরুয়া ধারণের কোন সার্থকতা নেই।[1]

কিন্তু স্বামীজী-কল্পিত সেই চরিত্রবান, হৃদয়বান, শ্রদ্ধাবান, বীর্যবান,

লৌহদৃঢ় পেশী ও ইস্পাতকঠিন স্নায়ু-সমন্বিত ত্যাগী যুবক কই? না— স্বামীজী তাঁর কাঙ্ক্ষিত বিবেকানন্দ-তুল্য বীরহৃদয় যুবক পান নি—এজন্য তিনি দুঃখও করেছেন বহুবার। তাঁর কাছে বহু যুবকের আনাগোনা, কিন্তু তাদের মুখের ভাব তমোপূর্ণ, হৃদয় উদ্যমশূন্য, শরীর অপটু, মন সাহসশূন্য—তাদের দিয়ে হবে না। যাদের ভাল আধার বলে মনে হয়, তাদের অনেকেই হয় বিবাহিত, না হয় শরীরে অপটু বা মান-যশ-উপার্জনের চেষ্টায় বিকিয়ে গেছে। আর "বাকী অধিকাংশই উচ্চ ভাব নিতে অক্ষম।" (৯।২১৭-১৮)। স্বামীজী বলছেন, এই সব কারণে তাঁর মনে বড়ই আক্ষেপ—' অবশ্য এখনও একেবারে **হতাশ হই নি, কারণ ঠাকুরের ইচ্ছা হলে এই সব ছেলেদের ভেতর থেকেই কালে মহা মহা ধর্মবীর বেরুতে পারে—যারা ভবিষ্যতে আমার idea (ভাব) নিয়ে কাজ করবে।"** (৯।২১৮)।

আদর্শ যুবক তৈরীর উপায়ঃ শিক্ষা

হতাশ হয়ে বসে থাকলে চলবে না। ঘরে বসে থাকার মানুষ স্বামীজী নন। তিনি জানতেন যে, অন্ধকার ঘরে বসে 'অন্ধকার' 'অন্ধকার' বলে চীৎকার করলে 'অন্ধকার' দূর হবে না—আলো আনতে হবে। আলো আনলে তবেই 'অন্ধকার' দূর হবে (৫।৪৬৪-৬৫)। স্বামীজী তাই হতাশ হন নি—তিনি জানতেন "তাদের (যুবকদের) life আগে তয়ের ক'রে দিতে হবে, তবে কাজ হবে।" (৯।৩৯১)। তিনি বলছেন—"তয়ের ক'রে নিতে হবে। তাই তো বলি কতকগুলি স্বদেশানুরাগী ত্যাগী ছেলে চাই। ত্যাগীরা যত শীঘ্র এক-একটা বিষয় চূড়ান্ত রকমে শিখে নিতে পারবে, তেমন তো আর কেউ পারবে না।" (৯।৪০৫)।

শিক্ষার উদ্দেশ্য—মানুষ তৈরি ঃ স্বামীজী তাঁর কাজের জন্য যুবকদের তৈরী করে নিতে চেয়েছিলেন। শিক্ষা দিয়ে তাদের উপযুক্ত করে নিতে হবে। তিনি ত্যাগী ছেলে অর্থাৎ সন্ন্যাসী চান। এখানে মনে রাখতে হবে যে, দেশশুদ্ধ সব যুবকই সন্ন্যাসী হোক তা তিনি চাননি। ভগবান বুদ্ধদেব দেশশুদ্ধ মানুষকে সন্ন্যাসী করে নেড়া-নেড়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি করেছিলেন বলে স্বামীজী

তাঁর তীব্র সমালোচনা করেছেন। তিনি চান সন্ন্যাসী যুবক—আবার গৃহী যুবকও। উপযুক্ত শিক্ষালাভ করে এই যুবকরা দেশ ও দশের কাজে আত্মনিয়োগ করবে। দেশশুদ্ধ মানুষ সবাই যে দীন-দরিদ্রের সেবা বা ধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করবে তা নয়। তাঁর মতে—'স্বধর্ম' অনুসারে যে-যার কাজ করে যাবে—সব কাজই ঈশ্বর উপাসনা, দেশের কাজ, কিন্তু সকলকেই 'মানুষ' হতে হবে। এই 'মানুষ' তৈরী করতে গেলে শিক্ষা দরকার।

স্বামীজীর মতে সব শিক্ষারই উদ্দেশ্য হল 'মানুষ' তৈরী করা—"The ideal of all education, all training should be man-making". শিক্ষা অর্থে স্বামীজী কেবলমাত্র কিছু ইংরেজী বই মুখস্থ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী লাভ বোঝেন নি, তাঁর কাছে শিক্ষার অর্থ হল 'মানুষ' তৈরী—জীবনের উন্নয়ন, চরিত্রগঠন—ছাত্রের অন্তর্নিহিত আত্মা শক্তি মনীষা ও চিন্তাশক্তির বিকাশ—দৈহিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি। তিনি চান সেই শিক্ষা যা মানুষকে স্বাবলম্বী করে, জীবন সংগ্রামে সমর্থ করে, চরিত্র গঠন করে এবং প্রবল প্রতিকূলতার সম্মুখে সিংহসাহসিকতা এনে দেয়।

ভারতে প্রচলিত পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থাকে স্বামীজী মেনে নিতে পারেন নি কারণ তাঁর মতে তা ছিল নৈরাশ্যবাদী ও নেতিবাচক। ভারতীয় সংস্কৃতির সংগে সম্পর্কহীন এই শিক্ষাব্যবস্থায় স্বাবলম্বী হওয়া বা শিক্ষার্থীর আত্মবিকাশের কোন সুযোগ ছিল না। তাঁর মতে তৎকালীন শিক্ষার "প্রায় সবই দোষ, কেবল চূড়ান্ত কেরানি-গড়া কল বই তো নয়। কেবল তাই হলেও বাঁচতুম। মানুষগুলো একেবারে শ্রদ্ধা-বিশ্বাসবর্জিত হচ্ছে। গীতাকে প্রক্ষিপ্ত বলবে; বেদকে চাষার গান বলবে। ভারতের বাইরে যা কিছু আছে, তার নাড়ী-নক্ষত্রের খবর রাখে, নিজের কিন্তু সাত চুলোয় যাক—তিন পুরুষের নামও জানে না।" (৯।৪০১)। সারা ভারত এবং ইওরোপ-আমেরিকা ভ্রমণ করে স্বামীজী বুঝেছিলেন যে, একমাত্র শিক্ষাই হল পাশ্চাত্য-জাতির উন্নতির কারণ এবং শিক্ষাহীনতাই হল ভারতের সর্বপ্রকার সর্বনাশের মূল। ভারতে শিক্ষা চাই—এই শিক্ষাই জাতিকে 'মানুষে' পরিণত করবে এবং দেশের উন্নতি হবে। "কেবল শিক্ষা, শিক্ষা, শিক্ষা!......শিক্ষাবলে আত্মপ্রত্যয়, আত্মপ্রত্যয় বলে অন্তর্নিহিত ব্রহ্ম জাগিয়া উঠিতেছেন।" (৭।৩২৬-২৭)।

সন্ন্যাসী, সাধারণ যুবক, দরিদ্র জনসাধারণ ও নারী সমাজ—সবার জন্যই

স্বামীজী শিক্ষার কথা বলেছেন। এই সব বিভিন্ন মানুষের জন্য শিক্ষার পদ্ধতি ও পাঠ্যসূচীতে যথেষ্ট পার্থক্য থাকলেও, তাদের মূল উদ্দেশ্য একই। তিনি একটি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় তৈরী করতে চেয়েছিলেন, যেখানে প্রাচীন ও আধুনিক, ধর্ম ও বিজ্ঞান—সর্ববিষয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রচারকেরা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিদ্যা ও ধর্মপ্রচার করবে। (৬।৩৯০)। স্বামীজীর ইচ্ছে ছিল অভিভাবকেরা শিক্ষার জন্য ছেলেদের বেলুড় মঠে পাঠাবেন। মঠে তারা পাবে বিশেষ ধরনের শিক্ষা এবং শিক্ষা সমাপ্তির পর বিবাহ করা বা সন্ন্যাসী হওয়া তাদের ইচ্ছাধীন। এ ধরনের কিছু বালক মঠে ছিল এবং সাধারণ শিক্ষার জন্য তারা বালি বা কলকাতার স্কুলে যেত। (স্বামীজী স্মৃতি সঞ্চয়ন, স্বামী নির্লেপানন্দ, ১৩৮২, পৃঃ ৪৩ এবং ৯।১২৫)। মঠে সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীরা কেবলমাত্র যে সাধন-ভজন-ধ্যান ও শাস্ত্রালোচনায় কালাতিপাত করতেন তা নয়। 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' তাঁদের কাজ। তাঁরা কর্মী—তাঁদের লক্ষ্য নিজে 'মানুষ' হয়ে অন্যকে 'মানুষ' করা। আদর্শ শিক্ষক বিবেকানন্দ মনে করতেন যে, সকলে সর্ববিষয়েই পারদর্শী হবে—'জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ' পর্যন্ত সব কাজের জন্য সাধুরা মন ও শিক্ষার দিক থেকে তৈরী থাকবেন। রান্না, পশুপালন, সংগীত, বাগান তৈরী, বক্তৃতা করা, আর্তের সেবা, শরীরচর্চা এবং বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে সব বিষয়ে তাঁরা দক্ষ হবেন। তিনি বলতেন যে, যে-কাজই হোক না কেন, তা খুব মন দিয়ে করা চাই। তিনি চাইতেন আত্মবিশ্বাস, একাগ্রতা, নিষ্ঠা, আজ্ঞাবহতা, চিত্তসংযম, ব্রহ্মচর্য এবং মজবুত শক্ত শরীর। তিনি বলতেন—"সন্ন্যাসীদের পক্ষে কৃচ্ছ্রসাধন ভাল বটে, কিন্তু কর্মীদের পক্ষে প্রয়োজন সুগঠিত দেহ—লৌহবৎ দৃঢ় পেশী ও ইস্পাতের মতো শক্ত স্নায়ু।"

শরীরচর্চা : স্বামীজী-প্রবর্তিত সন্ন্যাসী সংঘ নিছক পরপিণ্ডভোজীদের বিশ্রামাগার নয়। সন্ন্যাসীরা কর্মী। তাই সুস্থ শরীর ও মন এখানে অপরিহার্য। বহু বাধা বিপত্তির বিরুদ্ধে লড়তে হবে—আত্মবিশ্বাস চাই। দুর্বলের আত্মবিশ্বাস থাকে না—"The physically weak are unfit for the realisation of the self". স্বামীজী বহুস্থানে বারংবার এই সুস্থ শরীরের কথা বলেছেন, বলেছেন শরীরচর্চার প্রয়োজনীয়তার কথা—কেবলমাত্র সন্ন্যাসীদের জন্যই নয়—সব যুবকেরই তা দরকার। স্বামীজী নিজে

ছিলেন সুস্থ সবল দেহের অধিকারী। কেবলমাত্র বাল্য ও কৈশোরেই নয়—সারা জীবন শরীরচর্চা করেছেন তিনি।¹ দার্জিলিং ও আলমোড়ায় তিনি পাহাড়ী হরিণের মতো পাহাড় থেকে পাহাড়ে লাফিয়ে বেড়িয়েছেন, ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছুটিয়ে পাহাড়ী রাস্তায় চড়াই উতরাই অতিক্রম করেছেন (৭।৩৩৩)। কুড়ি-ত্রিশ মাইল এক নাগাড়ে ঘোড়ার পিঠে দৌড়েও তিনি ক্লান্ত হন নি। (৭।৩৫৬) খাড়া পাহাড়ের ওপর দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পাহাড়ী ঘোড়া ছুটিয়ে তিনি চলেছেন। মাইলের পর মাইল চড়াই, মাইলের পর মাইল উতরাই—রাস্তাটা কয়েক ফুট মাত্র চওড়া, খাড়া পাহাড়ের গায়ে যেন ঝুলে আছে, আর বহু সহস্র ফুট নীচে খাদ।" (৭।৩৬৯)। এই দুঃসাহস, এই কর্মশক্তি, এই উৎসাহের নামই বিবেকানন্দ!

শুধু কি এই? বিদেশের মাটিতেও তিনি ব্যায়াম করেছেন, ডন-বৈঠক দিয়েছেন, জিমন্যাস্টিক করেছেন—এমনকি সমুদ্রে সাঁতারও কেটেছেন। মঠে তিনি নিয়মিত ডন ও ডাম্বেল কষতেন এবং অন্যান্যদের জন্যও ব্যায়ামচর্চা বাধ্যতামূলক করেছিলেন।² দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য ভ্রমণের পর ৯ই ডিসেম্বর ১৯০০-তে সন্ধ্যার বেশ কিছু পরে যে ভাবে তিনি মঠের খাবার-ঘরে হাজির হন তাও তাঁর পুষ্ট শরীরের স্বাক্ষর বহন করে। মঠের গেট বন্ধ। খাওয়ার ঘণ্টা পড়েছে। মালী এসে মঠের সকলকে খাওয়ার ঘরে খবর দিল যে এক সাহেব এসেছে। তাকে চাবি দেওয়া হল। কিন্তু ইতিমধ্যে সাহেব খাবার-ঘরে গিয়ে হাজির। সাহেব স্পষ্ট বাংলাতেই বললেন—"বাইরে থেকে খাবার ঘণ্টা শুনে ভাবলুম যে যদি তাড়াতাড়ি না যাই, তাহলে রাত্রে আর খেতে পাব না। তাই পাঁচিল টপকে এসে পড়লুম। বড় খিদে পেয়েছে, আমায় খেতে দাও।"

ছেলেদের চিরকাল তিনি খেলাধুলায় উৎসাহ দিতেন এবং শক্ত-সমর্থ ছেলেদের পছন্দ করতেন। ছোট জাগুলিয়ায় স্বামীজীর এক বোনের বাড়ী। স্বামীজী সেখানে গেছেন। ছেলেমেয়েরা পুকুরে সাঁতার কাটছে—পাড়ে দাঁড়িয়ে প্রদীপ্ত মুখে বরেণ্য সন্ন্যাসী সকলকে উৎসাহ দিচ্ছেন।³ আবার, মঠে একবার একটি ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সারাক্ষণ সেখানে হাজির থেকে সকলকে উৎসাহ দিলেন। এক ভারতীয় খ্রীষ্টান যুবক সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব দেখাল—স্বামীজী তাকে আশীর্বাদ করেন। (স্বামীজীর স্মৃতি সঞ্চয়ন, স্বামী নির্লেপানন্দ, পৃঃ ৬৬-৬৭)। তিনি বলছেন—"শরীরটাকে খুব মজবুত করতে

তোকে শিখতে হবে ও সকলকে শেখাতে হবে। দেখছিস্‌নে এখনও রোজ আমি ডামবেল কষি। রোজ সকাল সন্ধ্যায় বেড়াবি; শারীরিক পরিশ্রম করবি। Body and mind must run parallel (দেহ ও মন সবার সমানভাবে চলবে)। সব বিষয়ে পরের ওপর নির্ভর করলে চলবে কেন? শরীরটা সবল করার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারলে নিজেরাই তখন ঐ বিষয়ে যত্ন করবে। সেই প্রয়োজনীয়তা-বোধের জন্যই এখন education-এর (শিক্ষার) দরকার।" (৯।১৭৭)।

শরীরচর্চা সবার জন্য চাই—গৃহী-সাধু সব যুবকের জন্যই। সুস্থ শরীরই দেবে চরিত্রবল এবং আত্মবিশ্বাস। এজন্যই তিনি বলেন যে, গীতাপাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলা বেশী প্রয়োজনীয়।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত কংগ্রেস নেতা বরিশালের মুকুটহীন রাজা ও শিক্ষাবিদ অশ্বিনীকুমার দত্তের সংগে আলমোড়ায় স্বামীজীর সাক্ষাৎ হয়। নানা কথার মধ্যে স্বামীজী তাঁকে বলেন—"শুনেছি, আপনি শিক্ষাদান নিয়ে আছেন। সেটাই আসল কাজ। আপনার মধ্যে বিরাট শক্তি কাজ করছে, আর জ্ঞানদানের চেয়ে বড় কি আছে! কিন্তু দেখবেন, জনসাধারণ যেন মানুষ-গড়ার শিক্ষা পায়। তারপর প্রয়োজন চরিত্রের। **আপনার ছাত্রদের চরিত্রকে বজ্রের মত শক্তিশালী করে গড়ে তুলুন। বাঙালী যুবকদের হাড় থেকে তৈরী বজ্রে ভারতের দাসত্ব চূর্ণ হবে। আপনি আমাকে কয়েকটা তৈরী ছেলে দিতে পারেন? তাহলে পৃথিবীকে একটি নাড়া দিয়ে যেতে পারি।**" (বিশ্ববিবেক পৃঃ ১৪৮-৪৯)।

স্বামীজী চান যে, শক্তিবৃদ্ধির জন্য ছেলেরা মাছ-মাংস খাবে—এতে কোন পাপ নেই। ঘাসপাতা খেয়ে পেটরোগা 'বাবাজীর দলে দেশ ছেয়ে' গেছে—তার দরকার নেই। এখন দরকার রজোগুণের এবং একারণেই মাছ-মাংস খেতে হবে। (৯।১৫০-৫২)। 'ভারতী' সম্পাদিকা সরলাদেবী চৌধুরাণীকে তিনি লেখেন—জীবহত্যা পাপ সন্দেহ নেই কিন্তু দু-দশটা ছাগল হত্যা করা অপেক্ষা মাংসাহার না করে দুর্বল হয়ে নিজ স্ত্রী-কন্যার মর্যাদা রক্ষায় অক্ষম হওয়া—আরও বেশী পাপ। মহারাজ অশোক দশ-বিশ লক্ষ পশুর প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন, কিন্তু বিনিময়ে ভারত পেয়েছিল হাজার বছরের দাসত্ব। (বলা বাহুল্য মহারাজ অশোক সাম্রাজ্যে ভক্ষণযোগ্য পশুদের হত্যা একেবারে নিষিদ্ধ করেন

নি, রাজকীয় রসুইখানার মাংসাহার চলত। তিনি কয়েকটি বিশেষ পশু এবং বিশেষ বিশেষ দিনে তা হত্যা নিষিদ্ধ করেছিলেন মাত্র। দ্রঃ Asoka and the Decline of the Mauryas, Romila Thapar, 1973, P. 202)।

স্বামীজী বলেন যে, উচ্চশ্রেণীর লোক যাঁরা পরিশ্রম কম করেন, তাদের মাংসাহারের দরকার নেই, কিন্তু যারা দিবারাত্রি পরিশ্রম করে খাদ্য সংগ্রহ করে তাদের জন্য মাংসাহার অপরিহার্য। (৭।৩৩০)। তাঁর মতে, মাছ-মাংস, তাজা তরকারি খেতে হবে। বেশী তেল-চর্বি খাওয়া ভাল নয়। লুচির চেয়ে রুটি ভাল। (৯।১৮)।

শিক্ষার ভিত্তি—ধর্ম : স্বামীজীর মতে শিক্ষার ভিত্তি হবে ধর্ম, যাকে বাদ দিয়ে ভারতে কিছু করা সম্ভব নয়। মানুষের মধ্যে যে পূর্ণতা বা দেবত্ব আছে তার বিকাশ সাধনই শিক্ষা। ধর্মের উদ্দেশ্যও তাই—মানুষের দেবত্বকে বিকাশ করা। স্বামীজীর এই ধর্ম কোন সম্প্রদায়িক ধর্ম নয়—সার্বজনীন ধর্ম যার ভিত্তি হল ঔপনিষদিক বেদান্ত। এখানে মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে বা বিভিন্ন কাজের মধ্যেও কোন ভেদাভেদ নেই। মনুষ্যত্বের বিকাশই হল তার লক্ষ্য। এই ধর্মই মানুষকে আত্মবিশ্বাসী, শ্রদ্ধাবান, বীর্যবান, সৎ, সুন্দর ও অসাম্প্রদায়িক করে তোলে।

জাতীয়তাবোধ : বিদেশীর অনুকরণে জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বর্জিত শিক্ষার দ্বারা কাজ হবে না। শিক্ষার দ্বারা মানুষ যদি তার জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠতে না পারে, তবে সে শিক্ষা অর্থহীন। তাই স্বামীজীর মতে, শিক্ষার ভিত্তি হল জাতীয়তাবোধ। তিনি বলেন—যে বিদ্যালাভে জাতীয়তা লোপ পায়, তাতে উন্নতি হয় না—অধঃপাতেই সূচনা হয়। (৯।২৫৫)। কেবলমাত্র শিক্ষাই নয়—পোশাক-পরিচ্ছদ ও আচার-আচরণের ক্ষেত্রেও তিনি বিদেশী অনুকরণের নিন্দা করতেন। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে প্রত্যাবর্তনের সময় কলম্বোতে অনুষ্ঠিত এক সভায় বহু মানুষকে বিদেশী পোশাক পরিহিত দেখে তিনি তীব্রভাবে তার নিন্দা করেন এবং বলেন যে, ইওরোপীয় পরিচ্ছদে ভারতীয়দের মানায় না—এ ধরণের দাসোচিত অনুকরণ লজ্জার বিষয়। পরবর্তীকালে (১৯০২) মঠে বলেছিলেন যে, জাতীয় আহার, পোষাক ও আচার-আচরণ পরিত্যাগ করলে জাতীয়ত্ব লোপ পায়। অফিসে যাওয়ার সময় দরকারে ইওরোপীয় পোশাক পরা যেতে

পারে, কিন্তু "ঘরে গিয়ে ঠিক বাঙালী বাবু" হতে হবে—"সেই কোঁচা-ঝুলানো, কামিজ গায়, চাদর কাঁধে।" ইংগ-বঙ্গ পোশাকের সংমিশ্রণও তিনি পছন্দ করেন নি। (৯।২৫৫)।

নেতিবাচক শিক্ষা নয়ঃ ছাত্র যুবক সাধারণ মানুষ সকলকে ইতিবাচক শিক্ষা দিতে হবে—নেতিবাচক নয়। ছেলেদের দিনরাত 'এটার কিছু হবে না, বোকা গাধা' বললে তারা সত্যিই সে রকম হয়ে যায়। 'তোমরা কিছু নও'—এ ধরনের শিক্ষা মনে দুর্বলতা, শ্রদ্ধাহীনতা ও অবিশ্বাসই এনে দেয়। ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেমন, জাতির ক্ষেত্রেও তেমনি। হাজার হাজার বছর ধরে নিজেদের দুর্বল এবং হীন ভাবতে ভাবতে দেশবাসী হীন হয়ে পড়েছে। এ ধরনের শিক্ষা দেওয়া চলবে না। শিক্ষা হবে ইতিবাচক—ছাত্রের মতই জাতিকে বলতে হবে তারাই সব, তাদের মধ্যেই অনন্ত শক্তি ও উৎসাহ আছে। এভাবেই ছাত্র যুবক ও জাতির প্রাণে শক্তি ও আত্মবিশ্বাস জেগে উঠবে। (৯।১২,১৭৬,৪১০)।

শিল্প ও বিজ্ঞানচর্চাঃ মার্কণ্ডেয় পুরাণে বিদ্যাকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে—পরা ও অপরা বিদ্যা। জাগতিক জ্ঞান, বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প—এগুলো হল অপরাবিদ্যা এবং আধ্যাত্মিকজ্ঞান হল পরাবিদ্যা। প্রকৃত শিক্ষা পেতে গেলে দু' ধরনের বিদ্যাই দরকার। প্রাচীন ভারতীয় বিদ্যা এবং আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমন্বয় চাই। ধর্ম ও বিজ্ঞান, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, প্রাচীন ও নবীন, আধ্যাত্মিকতা ও জড়বাদের সমন্বয়ে গঠিত হবে নতুন ভারত। শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য, চারুকলা—সর্ববিষয়েই উন্নতি চাই। তিনি চান স্বদেশীয় বিদ্যার সংগে ইংরেজী ও বিজ্ঞান পড়ানো—চান কারিগরী শিক্ষা। (৯।৪০৩)। তিনি প্রত্যেক শহর ও গ্রামে একটি করে মঠ স্থাপন করতে চেয়েছিলেন, যেখানে একজন করে সুশিক্ষিত সন্ন্যাসীর অধীনে practical science (ব্যবহারিক বিজ্ঞান) ও সব রকম art (কলাকৌশল) শেখবার জন্য প্রত্যেক বিভাগে একজন করে বিশেষজ্ঞ থাকবে (৯।৪০৫)। তিনি চান পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে দেশবাসী নিজেদের অন্নবস্ত্রের সমস্যা সমাধান করে সমস্ত ঐহিক অভাব দূর করুক। সন্ন্যাসী হয়েও তিনি চেয়েছিলেন মানুষের জাগতিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি। তাঁর আমেরিকা যাত্রার প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল, সে দেশে শিল্প শিক্ষা করা। আমেরিকার পথে জাহাজে স্বামীজী জামসেদজী টাটার সংগে আলোচনাকালে শিল্প শিক্ষাদানে সমর্থ একটি সন্ন্যাসী সঙ্ঘ গঠনের ইচ্ছা

প্রকাশ করেছিলেন। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠাকালে মিশনের উদ্দেশ্য বলতে গিয়ে "শিল্প ও শ্রমোপজীবিকার উৎসাহ বর্ধন"-এর কথাও বলা হয়েছে। হাজারীবাগ ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে তিনি একটি শিল্প বিদ্যালয় ও কারখানা খুলতে চেয়েছিলেন—এমনকি শিল্পশিক্ষা গ্রহণের জন্য ভারতীয় যুবকদের বিদেশে শিক্ষানবীশ হিসেবে পাঠানোর ব্যাপারেও তাঁর অসীম উৎসাহ ছিল।

কলাবিদ্যা: শিল্পশিক্ষার সংগে তিনি চেয়েছিলেন কলাবিদ্যা—বিশেষ করে চারুকলার। স্বামীজীর মতে জাতির মহত্বের উৎস হল তার শিল্পকলা, যা তাঁর কাছে ধর্মেরই অংগ। গ্রীক ও মধ্যযুগীয় পাশ্চাত্য শিল্পের তিনি প্রশংসা করতে পারেন নি। মানবতাবাদী বিবেকানন্দের কাছে ভারতের বৌদ্ধশিল্প ও লোকশিল্প অপরূপ, কারণ এতে সাধারণ মানুষের হৃদয়ের আশা-আকাঙ্ক্ষা পরিস্ফুট হয়েছে। শিল্পের ব্যাপারে জাপান তাঁর কাছে ছিল খুব বড়। পাশ্চাত্যের 'ইউটিলিটির' দ্বারা নিয়ন্ত্রিত আর্টের সংগে ভারতের সাধারণ জীবনে প্রচলিত আর্টের এক সুষ্ঠু সমন্বয় চেয়েছিলেন তিনি। ভারতীয় চিত্রশিল্পের ভাবময় দিকটা—এর পবিত্রতা, গাম্ভীর্য এবং হৃদয়াবেগ তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। তৎকালীন ভারতের বিভিন্ন চারুকলা বিদ্যালয়ে অনুসৃত ভ্রান্ত আদর্শের অনুকরণকে তিনি তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছেন, সমালোচনা করেছেন রবিবর্মার মত বিখ্যাত শিল্পীর। আর্ট কলেজের অধ্যাপক রণদাপ্রসাদ দাশগুপ্ত স্বামীজীকে বলতে বাধ্য হয়েছিলেন— "আমি আপনাকে নূতন কথা কি শোনাব, আপনিই ঐ বিষয়ে (আর্ট সম্পর্কে) আমার চোখ ফুটিয়ে দিলেন। শিল্প সম্বন্ধে এমন জ্ঞানগর্ভ কথা এ জীবনে আর কখনো শুনি নি। আশীর্বাদ করুন, আপনার নিকট যে সকল ভাব পেলাম, তা যেন কাজে পরিণত করতে পারি।" (৯।১৯২)।

ইতিহাসচর্চা: স্বামীজী ইতিহাসচর্চার ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ভারতের স্কুল-কলেজে বিদেশীর লেখা জাতীয়তানাশক কুপাঠ্য ইতিহাস পড়ান হয়। ভারতীয়দের মধ্যে ইতিহাস রচনার উদ্যম ও পরিশ্রম করার ইচ্ছা নেই। এসব কারণে তিনি ক্ষুব্ধ ছিলেন। একথা তিনি জানতেন যে, ইতিহাস একটি জাতিকে তার ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলে। ইতিহাস পাঠেই জাতীয়তাবোধ জাগে, জাগে দেশপ্রেম। পরিব্রাজকরূপে

রাজপুতানার আলোয়ার ভ্রমণকালে সেখানে একদল যুবক সর্বদা তাঁকে ঘিরে থাকত। তিনি তাদের বলেন—"পড় আর খাট, যাতে করে আমাদের দেশের ইতিহাসকে বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তিতে নূতন করে গড়তে পার। এখন তো আমাদের ইতিহাসের মাথা-মুণ্ড নেই; এতে কোন ঘটনাপারম্পর্যও সুবিন্যস্ত হয় নাই। ইংরেজরা আমাদের দেশের যে ইতিহাস লিখেছে, তাতে আমাদের মনে দুর্বলতা না এসে যায় না; কেন না তারা শুধু আমাদের অবনতির কথাই বলে। যে সব বিদেশীরা আমাদের রীতিনীতির, আমাদের ধর্ম ও দর্শনের সঙ্গে অতি অল্পই পরিচিত, তারা কেমন করে বিশ্বস্ত ও নিরপেক্ষভাবে ভারতের ইতিহাস লিখবে?... ..এখন বেদ, পুরাণ এবং ভারতের প্রাচীন ইতিবৃত্ত অধ্যয়নের জন্য কি করে ভারতীয় ইতিহাসের গবেষণাক্ষেত্রে আমাদের একটা নিজস্ব স্বাধীন পথ গড়ে তুলতে হবে, এবং সেগুলিকে অবলম্বন করে সহানুভূতিসম্পন্ন অথচ উদ্দীপনাময় ভাষায় এই ভূমির ইতিহাস-সঙ্কলনকে নিজ জীবনের সাধনা-রূপে গ্রহণ করতে হবে—সেসব হচ্ছে আমাদের নিজেদের দায়িত্ব। ভারতের ইতিহাস ভারতীয়গণকে রচনা করতে হবে। অতএব বিস্মৃতি-সাগর থেকে আমাদের লুপ্ত ও গুপ্ত রত্নরাজী উদ্ধারের জন্য বদ্ধপরিকর হও। কারো ছেলে হারিয়ে গেলে সে যেমন তাকে না পাওয়া পর্যন্ত শান্ত হতে পারে না, তেমনি যতক্ষণ ভারতের গৌরবময় অতীতকে জনমনে পুনরুজ্জীবিত না করতে পাচ্ছ ততক্ষণ তোমরা থেমো না। তাই হবে প্রকৃত জাতীয় শিক্ষা এবং এ শিক্ষার সংগে সংগে প্রকৃত জাতীয়তাবোধ জেগে উঠবে।"[৭] স্বামীজীর মতে—"যাদের দেশের ইতিহাস নেই, তাদের কিছুই নেই।" (৯।৪০১)।

সংস্কৃত শিক্ষা: সংস্কৃত ভাষার ওপর স্বামীজী খুব গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর মতে সংস্কৃত ভাষাতেই ভারতের সব জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থাদি রচিত। সেগুলিকে মুষ্টিমেয় মানুষের কুক্ষিগত করে রাখা ঠিক নয়। সংস্কৃত শব্দ উচ্চারণ মাত্রই ভারতীয়দের মধ্যে একটি শক্তি ও গৌরবের ভাব জেগে ওঠে। ভারতের তথাকথিত নিম্ন জাতিদের উদ্দেশ্যে স্বামীজী বলছেন যে, তাদের অবস্থার উন্নতি করার একমাত্র উপায় সংস্কৃতভাষা শিক্ষা করা। তাঁর মতে—জাতিভেদ উঠিয়ে দেওয়া এবং সাম্যভাব আনার উপায় হল উচ্চবর্ণের মানুষদের শিক্ষা—যার ফলে তাদের তেজ ও গৌরব, তা অর্জন করা। রামানুজ, ভগবান বুদ্ধদেব প্রভৃতি সংস্কারকগণ সংস্কৃতকে অবহেলা করে মানুষের কথ্য ভাষায়

তাঁদের উপদেশ প্রদান করে জাতির অবনতি ঘটিয়েছেন বলে স্বামীজী অভিযোগ করেছেন। বিদেশ থেকে তিনি গুরুভাইদের বারবার সংস্কৃত শিক্ষার ওপর জোর দিয়ে চিঠি লিখেছেন। স্বামী অখণ্ডানন্দকে লিখছেন যাতে তিনি গুণনিধি ভট্টাচার্যকে আনিয়ে সংস্কৃত শিক্ষা করেন। আলাসিঙ্গাকে লিখছেন—"সংস্কৃত ভাষা বিশেষতঃ বেদান্তের তিনটি ভাষ্য অধ্যয়ন কর।" বিদেশে প্রচারকার্যের যোগ্যতা সম্পর্কে লিখছেন—"উত্তম সংস্কৃত এবং ইংরেজী জানা সন্ন্যাসীর এখানে প্রয়োজন।" পরিব্রাজক জীবনে তিনি আলোয়ারের কিছু যুবককে সংস্কৃত শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করেছিলেন এবং মাঝে মাঝে তিনি নিজে তাদের সংস্কৃত শেখাতেন। তাদের বলতেন—"সংস্কৃত পড় এবং সংগে সংগে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের চর্চা কর; আর সব জিনিসটা যথাযথ ভাবে দেখতে ও বলতে শেখ।"।

স্বামীজী চেয়েছিলেন যে, যুব-কর্মীরা সর্ববিদ্যাতেই পারদর্শী হোক, কারণ তারা কর্মী—দেশের নানা জটিল সমস্যা এবং নানা বিষয়ে তাদের কাজ করতে হবে।

"মেয়ে-মদ্দ দুই চাই"

দেশের কাজের জন্য কেবলমাত্র পুরুষ হলেই চলবে না—নারীও চাই। শুধু যুবক নয়—যুবতীও চাই। গুরুভাইদের উদ্দেশ্যে তিনি লিখছেন—"মেয়ে-মদ্দ-দুই চাই।......হাজার হাজার পুরুষ চাই, স্ত্রী চাই—যারা আগুনের মত হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী—উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু, দুনিয়াময় ছড়িয়ে পড়বে। ছেলেখেলার কাজ নেই—ছেলেখেলার সময় নেই—যারা ছেলেখেলা করতে চায়, তফাত হও এই বেলা; নইলে মহা আপদ তাদের।" (৭।৫০)। আরেকটি চিঠিতে লিখছেন—"কতকগুলো চেলা চাই—fiery youngmen (অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত যুবক)।......Intelligent and brave (বুদ্ধিমান ও সাহসী), যমের মুখে যেতে পারে, সাঁতার দিয়ে সাগর পারে যেতে প্রস্তুত,......Hundreds (শত শত) ঐ রকম চাই, মেয়ে মদ্দ both (দুই)।" (৬।৪৫৫)। "দু হাজার, দশ হাজার, বিশ হাজার সন্ন্যাসী চাই, মেয়ে মদ্দ।......young educated men—not fools (শিক্ষিত যুবক—আহাম্মক নয়)। (৬।৪৫৬)।

স্বামীজীর কালে নারী সমাজ 'Manufacturing Machine' বা 'সন্তান-প্রজনন যন্ত্র' ছাড়া অন্য কিছু ছিল না। রান্নাঘর এবং আতুর ঘরের বাইরে যে একটি বিরাট জগৎ আছে, সে সম্পর্কে তাঁদের কোন ধারনাই ছিল না। প্রাচীন ভারতে ঋক্-বৈদিক যুগে সমাজে নারীর মর্যাদা ছিল খুবই উচ্চ—সেদিন যথার্থভাবেই তাঁরা ছিলেন সহধর্মিনী। স্বামীর সংগে একত্রে তাঁরা ধর্মাচরণ করতেন, রাজনীতিতে অংশ নিতেন, পুরুষের সংগে প্রকাশ্য সভায় তর্ক-যুদ্ধে অবতীর্ণ হতেন, বৈদিক স্তোত্র রচনা করতেন, আচার্য হিসেবে শিক্ষাদান করতেন, এমনকি যুদ্ধেও যোগদান করতেন। ঋক্-বেদের পরের যুগ থেকে নারীর মর্যাদা খর্ব হতে থাকে। পরবর্তী শাস্ত্রগ্রন্থসমূহে নারীকে আপদ—এমনকি মদ ও জুয়ার মত ঘৃণ্য বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, বলা হয়েছে দুশ্চরিত্র পুরুষ অপেক্ষাও নারী হীন।

'স্বামীজী মনে করতেন যে, "The living image of Shakti' নারী জাতির প্রতি অবহেলাই ভারতের পতনের মূল কারণ। তাঁর মতে নারী জাতির অভ্যুদয় না হলে ভারতের কল্যাণ নেই, কারণ একটি পাখার সাহায্যে পাখীর পক্ষে আকাশে ওড়া সম্ভব নয়।' আদি পিতা মনু বলছেন যে, 'যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতা'—নারী যেখানে পূজিতা, দেবতাগণ সেখানে আনন্দ লাভ করেন। স্বামীজী পাশ্চাত্যে নারী-স্বাধীনতা ও নারী মহিমা দেখেছেন এবং বেদান্তের সমতার ভিত্তিতে অনুপ্রাণিত হয়ে সমাজে তিনি নারী-পুরুষ উভয়ের সমানাধিকার দাবী করেছেন।

বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছেন যে, এটা পাপ এবং পৈশাচিক। শুনলে আশ্চর্য লাগে, সরকার বাল্যবিবাহ নিরোধকল্পে আইন তৈরী করলে স্বামীজীর সমকালে এবং পরবর্তীকালে দেশের উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি-বর্গ প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিলেন।

'স্বামীজীকে বারংবার প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, নারীদের সমস্যা তিনি কি করে সমাধান করবেন! স্বামীজী তার উত্তরে বলেছিলেন—"Am I a woman that I should solve the problems of women? They can solve their own problems." (Reminiscences এবং ৫।১৩৮)—আমি কি নারী যে আমি নারী সমস্যার সমাধান করব? তারা নিজেরাই তাদের সমস্যার সমাধান করতে পারে। স্বামীজী মনে করতেন যে, উপযুক্ত শিক্ষা পেলে

মেয়েরা নিজেরাই তাদের সমস্যা মিটিয়ে নেবে। তাঁর মতে, সতীত্ব ও মাতৃত্বের আদর্শকে অবিকৃত রেখে তখনই নারীর পক্ষে জাগা সম্ভব যখন তাদের মধ্যে প্রকৃত শিক্ষার বিস্তার ঘটবে। কেবলমাত্র শিক্ষাদান ব্যতীত পুরুষরা তাদের কোন কাজে হস্তক্ষেপ করবে না এবং ঠিক ঠিক শিক্ষা পেলে ভারতীয় মেয়েরা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মেয়েদের সমকক্ষ হয়ে উঠবে। (৯।৪৭৯)।[২]

: মেয়েদের কি ধরণের শিক্ষা দরকার? তাঁদের ইতিবাচক এমন কিছু শেখান দরকার যাতে চরিত্র গঠন হয়, মনের শক্তি বাড়ে, বুদ্ধির বিকাশ হয় এবং তারা নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারে। (৯'৪২৬)। শুধু এই নয়—'প্যানপেনে' কান্নার ভাব ত্যাগ করে 'বীরত্বের ভাব' শিখতে হবে। 'Self-defence' বা আত্মরক্ষা শিখতে হবে—হতে হবে ঝাঁসির রাণীর মত। (৯'৪২৬)। স্বামীজী সম্পূর্ণ নারী-শাসিত একটি নারীমঠ স্থাপনের পরিকল্পনা করেছিলেন, যার সংগে পুরুষদের কোন সম্পর্ক থাকবে না। মঠে কুমারী, বিধবা এবং ব্রহ্মচারিণীরা থাকবে। সেখানে তারা ধর্মশাস্ত্র, সাহিত্য, ব্যাকরণ, কিছু ইংরেজী, সেলাইয়ের কাজ, রান্না, গৃহকর্মের যাবতীয় কাজ, শিশুপালন প্রভৃতি শিক্ষা করবে। জপ-ধ্যান-পূজা তো আছেই। পাঁচ-সাত বছর শিক্ষার পর মেয়েরা ইচ্ছে করলে বিবাহ করতে পারে বা ব্রহ্মচারিণী হতে পারে। ব্রহ্মচারিণীরা আবার গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে কেন্দ্র খুলে নারীশিক্ষা বিস্তার করবে। যুবকরাও যাবে নারীশিক্ষা বিস্তারের কাজে। বিবাহিতা মেয়েরা স্বামী-পুত্রের মধ্যে নিজ ভাব সঞ্চার করে বীর পুত্রের জননী হবে। (৯।২০২ ০৩)। স্বামীজী মনে করেন যে, এভাবেই দেশে সীতা, সাবিত্রী, গার্গী, মৈত্রেয়ী জন্মাবে।[১]

। স্বামীজী প্রশ্ন তুলেছেন যে, নারী স্বাধীনতার স্বরূপ কেমন হবে—আমেরিকার মত নারীর সামাজিক স্বাধীনতা, না সকল বিধি-নিষেধসহ ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থা? এর উত্তরে তিনি নারী সমাজকে বলেছেন যে, নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী—"All attempts must be based upon Sita, purer than purity, chaster than chastity, all patience, all suffering, the ideal of Indian Womanhood".[১]

[১]) ভগিনী ক্রিশ্চিন বলেছেন যে, যদি নারীশিক্ষার ব্যাপারে স্বামীজীর আদর্শ যথার্থভাবে মেনে চলা হয়, তাহলে এমন জাতির উৎপত্তি ঘটবে, যারা বিশ্ব ইতিহাসে এক চমকপ্রদ ভূমিকা গ্রহণ করবে। প্রাচীন গ্রীসের নারীরা যেমন

শারীরিক শক্তিতে অতুলনীয় ছিলেন, তেমনি এই নবোত্থিত জাতির নারীরা মানসিক ও আধ্যাত্মিক দিক থেকে হবেন তুলনারহিত—উদার, প্রেমপরায়ণ, শান্ত, কষ্টসহিষ্ণু, হৃদয় ও বুদ্ধির দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল এবং আধ্যাত্মিকতায় সর্বশ্রেষ্ঠ। (Reminiscences, P. 228)।

বীরত্বের আদর্শ চাই

স্বামীজী বলছেন যে, দীর্ঘদিনের দাসত্বের ফলে ভারতীয়রা ক্লীব ও স্ত্রীলোকের জাতিতে পরিণত হয়েছে। (৫।১১৮, ৭।১৩৩) এ থেকে মুক্ত হতে হবে। তিনি চান সিংহ-হৃদয় বীর কর্মী। কেবলমাত্র মুষ্টিমের যুবককে বীর হবার শিক্ষা দিলেই চলবে না—দেশের মধ্যে বীরত্বের একটি পরিবেশ বা আবহাওয়া সৃষ্টি করতে হবে, মানুষের মধ্যে কর্ম-প্রবণতা সৃষ্টি করতে হবে, দেশের সামনে তুলে ধরতে হবে বিভিন্ন বীর-চরিত্রকে। তাঁর মতে, এখন প্রয়োজন গীতারূপ সিংহনাদকারী শ্রীকৃষ্ণ, ধনুর্ধারী রাম, মহাবীর ও মা-কালীর পূজা। (৯।১৬)। "বাঁশী বাজিয়ে এখন আর দেশের কল্যাণ হবে না।" চাই মহাত্যাগ, মহানিষ্ঠা, মহাধৈর্য, মহাউদ্যম (৯।১৪৫)। স্বামীজী বলছেন—খোল-করতাল বাজিয়ে আর লম্ফঝম্ফ করে দেশটা উৎসন্ন গেল। ছেলেবেলা থেকে কীর্তন শুনে শুনে দেশটা মেয়েদের দেশে পরিণত হয়েছে। দেশে ঢাক-ঢোল, তুরীভেরী বাজাতে হবে, বাজবে ডমরু-শিঙা, ঢাকে ব্রহ্মরুদ্রতালের দুন্দুভিনাদ উঠবে, 'মহাবীর মহাবীর' ধ্বনি এবং 'হর হর ব্যোম্ ব্যোম্' শব্দে দিগ্‌দেশ কম্পিত করতে হবে। যে-সব গান-বাজনায় মানুষের কোমল ভাব উদ্দীপিত হয়, তা কিছুদিনের জন্য বন্ধ রাখতে হবে। খেয়াল-টপ্পা বন্ধ করে ধ্রুপদ গান শোনাতে হবে। বৈদিক ছন্দের মেঘমন্দ্রে দেশটার প্রাণসঞ্চার করতে হবে। সকল বিষয়ে বীরত্বের কঠোর মহাপ্রাণতা আনতে হবে। এই আদর্শেই এখন জীবের কল্যাণ, দেশের কল্যাণ। (৯।২২০-২১)।

বরিশালের বিখ্যাত জননায়ক অশ্বিনীকুমার দত্তকে তিনি বলেছিলেন—"যেখানে শুনবেন রাধাকৃষ্ণের কীর্তন চলছে সেখানেই ডাইনে বামে চাবকাবেন। সারা জাতটা পচে ধ্বসে গেল! যাদের এতটুকু আত্মসংযম নেই, তারা কি না এই সব গানে মাতে? উচ্চ আদর্শের পক্ষে সামান্যতম অপবিত্রতাও বিরাট

বাধা। ছেলেমি নাকি? অনেক নেচেছি কুঁদেছি, কিছু সময়ের জন্য তাতে থামা দিলে ক্ষতি নেই। এখন জাতটা শক্তি নিয়ে গড়ে উঠুক।" (বিশ্ববিবেক, পৃঃ ১৪৯)।

স্বামীজী দুর্বলের অহিংসাকে সমর্থন করেন নি। তাঁর মতে, কেউ এক চড় মারলে, তাকে দশ চড় ফিরিয়ে না দেওয়া গৃহস্থের পক্ষে পাপ। হত্যা করতে এসেছে এমন ব্রহ্মবধেও পাপ নেই। তিনি স্পষ্টই বলছেন যে, অন্যায় দেখলে তৎক্ষণাৎ তার প্রতিবিধান করতে হবে—গৃহস্থের পক্ষে অন্যায় সহ্য করা পাপ। (৬'১৫৩)। আলমোড়ার এক ভদ্রলোক স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, প্রবলের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিকারের উপায় কি! স্বামীজী তৎক্ষণাৎ দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিয়েছিলেন—"অত্যাচারীর গালে চড় লাগাও। তোমার সর্বদা বিদ্রোহ করার অধিকার আছে।" (The Master As I saw Him, Sister Nivedita, P. 152)।

এইভাবে সিংহহৃদয় স্বামীজী নির্বীর্য জাতির প্রাণে বীর্যবত্তা বা ক্ষাত্রশক্তি ও ব্রহ্মতেজের সঞ্চার করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। উপনিষদের নূতন ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন যে, 'অভয়ম্'-ই হল বেদ-বেদান্তের মর্মবাণী—গীতার মর্মও হল পুরুষার্থ ও শক্তির উন্মেষ। তাঁর জীবন রচনা ও সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য বিষয় হল বীররস। তাঁর কাছে 'মেঘনাদবধ' কাব্য হল 'বাঙলা ভাষার মুকুটমণি'—সমগ্র বাংলা সাহিত্যে তো বটেই 'সমগ্র ইওরোপেও অমন একখানা কাব্য ইদানীং পাওয়া দুর্লভ।' (৯।২১১)। রামচন্দ্র নন—তাঁর মতে রাবণই এই কাব্যের প্রধান চরিত্র। রামায়ণের হনুমান তাঁর কাছে মৃত্যুভয়হীন এক 'মহা জিতেন্দ্রিয়, মহা বুদ্ধিমান্' চরিত্র। লক্ষ্মণ চরিত্র তাঁর কাছে কাপুরুষ রূপে প্রতিভাত, স্বদেশদ্রোহী বিভীষণ তাঁর কাছে 'নেমকহারাম, traitor'। গীতার শ্রীকৃষ্ণ, রামায়ণের রামচন্দ্র ও মহাবীর হনুমান, প্যারাডাইস লস্টের শয়তান, মেঘনাদবধ কাব্যের রাবণ, ইতিহাসের বিজয় সিংহ, রাণা প্রতাপ, শিবাজী, গুরু গোবিন্দ সিং, ম্যাৎসিনী, নেপোলিয়ন, সীজার, চেঙ্গিজ খাঁ, ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ, উপনিষদের নচিকেতা প্রভৃতি বীর চরিত্রগুলি তাঁর শ্রদ্ধার পাত্র। জগৎ ও জীবন তাঁর কাছে রণক্ষেত্র—হীনবীর্য জাতিকে বহুবার বহুভাবে তিনি শক্তিমন্ত্রে উদ্দীপ্ত করেছেন, বলেছেন—'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'—জীবনসংগ্রামে জয়ী হতে গেলে প্রয়োজন শক্তির উপাসনা—লৌহদৃঢ়

পেশী, ইস্পাত কঠিন স্নায়ু এবং বজ্রদীপ্ত উপাদানে গঠিত মন। তিনি বলেছেন, সংগ্রামের পথ পিচ্ছিল—দুঃখ ও মৃত্যু এর নিত্যসংগী।

কত যুবক চাই ?

স্বামীজী পরিকল্পিত কর্মের জন্য কত যুবক চাই ? স্বামীজী নিজেই তার সংখ্যা দিয়েছেন, কিন্তু সেই সংখ্যার কথা বলতে গিয়ে বিভিন্ন সময় তিনি বিভিন্ন সংখ্যা পেশ করেছেন। কখনও বলছেন, লক্ষ লক্ষ, হাজার হাজার, দু'হাজার-দশ হাজার-বিশ হাজার, আবার কখনও বলছেন, হাজার, দু'হাজার একশ', কতকগুলি, দশ-বারোটি—আবার বলছেন, 'একটা খাঁটি লোক'। তাহলে ব্যাপারটা কি—প্রকৃতপক্ষে কত লোক তাহলে তাঁর প্রয়োজন ? ভারত বিশাল দেশ, তার সমস্যা আরও বিশাল। সুতরাং হাজার হাজার বা লক্ষ লক্ষ কর্মী সেখানে কিছুই নয়। আসলে তিনি চান তাঁর আদর্শ-অনুযায়ী গঠিত নিবেদিত-প্রাণ কিছু খাঁটি যুবক। সংখ্যা যত বেশী হয় ততই ভাল। তিনি বলছেন, দশ-বারোটা মনের মত যুবক পেলেই দেশের চেহারা পাল্টে দেবেন, আবার বলছেন 'একটা মানুষ তৈরী করতে' তিনি লক্ষবার জন্ম নিতেও প্রস্তুত। (৯।১৫৮)। আসলে সমস্যা সেই মানুষ-তৈরীর। বিবেকানন্দ-সদৃশ একটি মানুষও তিনি পান নি। একটি বিবেকানন্দই দেশ মাতিয়ে তুলেছিলেন—হাজার বছরের খোরাক তিনি দিয়ে গেছেন। বেশী নয়—অন্তত আরেকটি বিবেকানন্দ হলেই ভারত যে সমস্ত সমস্যা থেকে মুক্ত হত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। দেশই তাঁর ঈশ্বর। নিজের ঈশ্বর, নিজের দেশ—তাঁর উন্নতি, তাঁর জাঁকজমক কে না চায় ? ভারতে যতবেশী বিবেকানন্দের আবির্ভাব হবে, দেশ ও দেশবাসীর ততই উন্নতি। তাই এ-সংখ্যা এক, দশ-বারো, একশ', হাজার, লক্ষ লক্ষ—যত বেশী হয় ততই মঙ্গল। তিনি চাইতেন—"**I want each one of my children to be a hundred times greater than I could ever be. Everyone of you must be a giant—*must*, that is my word !**" —আমি চাই তোমাদের প্রত্যেকে, আমি যা হতে পারতাম, তারচেয়ে শতগুণে বড় হও। তোমাদের প্রত্যেককেই শক্তিমান হতে হবে—হতেই হবে, না হলে চলবে না। (৯।৩৪৬)।

যুবকদের জন্য প্রদত্ত কর্মসূচী

স্বামীজী তাঁর শুবেবীর যুবকদের জন্য কয়েকটি কর্মসূচী দিয়েছেন—জাতীয় জাগরণের কর্মসূচী, দেশ ও জাতিগঠনের কর্মসূচী। দেশের Mass বা সাধারণ মানুষকে জাগাতে হবে—তবেই দেশের কল্যাণ।

জনজাগরণ : 'স্বামীজী দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, কয়েক হাজার ডিগ্রীধারী ব্যক্তিদ্বারা একটি জাতি গঠিত হয় না বা মুষ্টিমেয় কয়েকটি ধনীও একটি জাতি নয়। (৭।৫)। তাঁর মতে দরিদ্রের কুটিরেই ভারতের জাতীয় জীবন স্পন্দিত হয়। যুগ যুগ ধরে এই শ্রমজীবী জনতাই সভ্যতার ইমারত গড়ে তুলেছে, কিন্তু সমাজের কাছ থেকে তারা শুধু বঞ্চনাই পেয়েছে, অস্পৃশ্য-জ্ঞানে তাঁদের দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে। দেশের কোটি কোটি মানুষ মহুয়ার ফুল খেয়ে জীবন ধারণ করে, আর পুরোহিত ও উচ্চবর্ণের মানুষরা তাদের রক্ত চুষে খায়। তিনি বলেন যে, উচ্চবর্ণের অত্যাচারেই ভারতের এক-পঞ্চমাংশ মানুষ মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করেছে। মুসলিমদের ভারত অধিকার দরিদ্র ও পদদলিতদের উদ্ধারের কারণ হয়েছিল। শিক্ষা স্বাস্থ্য সম্পদ ব্যক্তিত্ব আত্মমর্যাদা চেতনা সব হারিয়ে ভারতের দরিদ্র সাধারণ মানুষ পশুর স্তরে নেমে এসেছে। তিনি দৃঢ়তার সংগে ঘোষণা করেছেন "জনগণকে অবহেলা করাই ভারতের প্রবল জাতীয় পাপ এবং অবনতির অন্যতম প্রধান কারণ।" দরিদ্র জনসাধারণের উন্নতি না হলে দেশের উন্নতি হবে না—দেশ জাগবে না।' 'ভারতের প্রথম সমাজতন্ত্রী স্বামী বিবেকানন্দ তথাকথিত এই নিম্নবর্ণের জন্য সমানাধিকার দাবি করে বলেছেন—"একচেটিয়া অধিকারের—একচেটিয়া দাবির দিন চলিয়া গিয়াছে, ভারত হইতে চিরদিনের জন্য চলিয়া গিয়াছে।"' (৫।১৯১)। তিনি অস্বীকার করেছেন সর্বপ্রকার জন্মগত একচেটিয়া অধিকার ও বংশকৌলীন্যকে। নিম্নজাতির উন্নতি ঘটাতে হবে। এর মধ্যেই আছে জাতীয় উন্নয়নের চাবিকাঠি। তিনি স্বপ্ন দেখেছেন যে, অচিরেই উচ্চবর্ণেরা শূন্যে বিলীন হবে এবং জেগে উঠবে নূতন ভারত—এই নূতন ভারত বেরোবে লাঙল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ি, মুদির দোকান, ভুনাওয়ালার উনুন, কারখানা, হাট-বাজার থেকে—বেরোবে ঝোপ-জঙ্গল পাহাড়-পর্বত থেকে। কেবলমাত্র ভারতেই নয়—সমগ্র বিশ্বজুড়ে শ্রমজীবী সাধারণ মানুষ

জাগছে। 'স্বামীজী ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা করে দেখান যে, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের যুগ শেষ হয়েছে, বর্তমানে চলছে বৈশ্য যুগ এবং আগামী দিনে পৃথিবীর সর্বত্রই প্রতিষ্ঠিত হবে শূদ্র শাসন - "শূদ্র যুগ আসবেই আসবে, এ কেউ প্রতিরোধ করতে পারবে না।" (৭ ৩০২) তিনি ঘোষণা করেছিলেন শূদ্র যুগ প্রথম আসবে রাশিয়ায়, তারপর চীনে। ভারতের অভ্যুত্থান ঘটবে তারপরেই। স্বামীজীর মতে, শূদ্রশাসনে "মানুষের শারীরিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বিস্তার হবে, ... সাধারণ শিক্ষার পরিসর খুব বাড়বে বটে, কিন্তু সমাজে অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তির সংখ্যা ক্রমশই কমে যাবে।" তাই তিনি চেয়েছেন এমন এক রাষ্ট্র গঠন করতে যেখানে ব্রাহ্মণের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের সভ্যতা, বৈশ্যের সম্প্রসারণ-শক্তি এবং শূদ্রের সাম্যের আদর্শ—এই সবগুলি ঠিক ঠিক বজায় থাকবে অথচ এদের দোষগুলি থাকবে না। (৭।৩০১-০২)।'

অশিক্ষা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম : 'কেবলমাত্র এই নয়—ভারতে স্বামীজী দেখেছেন অশিক্ষা-কুশিক্ষা-কুসংস্কারে আচ্ছন্ন একটি জাতিকে, যেখানে নারী সমাজের অবস্থা অতি হীন, জাতির মধ্যে বিদ্যমান দুর্বলতা, তামসিকতা, অলসতা—শ্রদ্ধা উদ্যম মৌলিকতা ও সততার অভাব এবং অহেতুক ভীতি ও ইংরেজের অন্ধ অনুকরণ। এছাড়া রয়েছে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি, বাল্যবিবাহ, জাতিভেদ প্রথা, অন্ধবিশ্বাস এবং ইন্দ্রজালের প্রতি আস্থা স্বামীজীর মতে, ইংরেজ শাসন নয়—এ গুলিই হল ভারতের পতনের কারণ। তাঁর সংগ্রাম এগুলির বিরুদ্ধেই। এগুলি অপসারিত হলেই সোনার ভারত গড়ে উঠবে। আর এই সংগ্রামে সামিল হবার জন্য তিনি যুবসমাজকে আহ্বান জানিয়েছেন—নূতন ভারত গঠনে এই যুবশক্তিই তাঁর হাতিয়ার।'

যুবকরা দরিদ্রদের জন্য কেন কাজ করবে ?

১ স্বামীজী যুব-সম্প্রদায়কে দরিদ্র জনসাধারণের জন্য কাজ করতে বলেছেন। এতে দেশের উন্নতি হবে—কিন্তু কোন যুবক যদি জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলেও তো দেশের উন্নতি। কিছু যুবক যদি সিভিল সার্ভিসে ঢুকে উচ্চপদে চাকরী পায়, তাতেও তো দেশের উন্নতি। স্বামীজী বলছেন যে, গোটাকতক লোককে সিভিল সার্ভিসে ঢুকিয়ে দিলে কিছু হবে না, বরং বিলেত গিয়ে তারা

ইংরেজদের নকল করবে এবং দেশের কথা ভুলে যাবে। জাগাতে হবে দেশের সাধারণ মানুষকে।

প্রথমতঃ—ত্যাগ ও সেবাই হচ্ছে ভারতের জাতীয় আদর্শ। (৯।৪৭৮) দেশের জন্য নিজেকে ত্যাগ করতে হবে অনেক কিছু। ত্যাগ ছাড়া বড় কাজ হয় না। নিজের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ও জাগতিক নানা সুখ ত্যাগ করে দেশের সেবা করতে হবে। সেবা অর্থ দয়া নয়—ঈশ্বরের পূজা, উপাসনা, শিবজ্ঞানে জীবসেবা। দেবতাজ্ঞানে দরিদ্র মানুষের সেবা করতে হবে। কেবলমাত্র 'আত্মজ্ঞান' লাভ হলেই এ ধরণের সেবা সম্ভব। স্বামীজী তাই চেয়েছিলেন যুবকরা আত্মজ্ঞান লাভ করুক—ধর্মই হোক জাতীয় জীবনের ভিত্তি। তিনি বলছেন যে, আর 'মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব' নয়—এখন মন্ত্র হোক 'দরিদ্রদেবো ভব, মূর্খদেবো ভব'। দরিদ্র, মূর্খ, অজ্ঞানীরাই হল প্রকৃত দেবতা। (৭।৩০)। দেবতার অন্বেষণে আর মঠ-মন্দিরে যাবার দরকার নেই—দরিদ্র দুর্বল মানুষই দেবতা।

দ্বিতীয়তঃ—দরিদ্রের কুটিরেই জাতীয় জীবন স্পন্দিত হচ্ছে—তারাই সংখ্যাধিক। মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ধনী নয়—বিরাট সংখ্যক অসহায় দরিদ্রকে নিয়েই জাতি গঠিত। সুতরাং জাতিগঠন করতে হলে আগে দেশের এই নিম্ন সম্প্রদায়কে জাগাতে হবে। তারা জাগলেই দেশ জাগবে—তাদের মুক্তিই হল দেশের মুক্তি।

তৃতীয়তঃ—সাধারণ মানুষের প্রদত্ত করের মাধ্যমে অর্জিত অর্থের দ্বারাই সরকার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেন। লক্ষ লক্ষ দরিদ্র ও নিষ্পেষিত শ্রমজীবী মানুষের বুকের রক্ত জল করা পয়সায় শিক্ষিত হয়ে এবং বিলাসিতায় নিমজ্জিত থেকে যারা তাদের কথা একবারও চিন্তা করে না, স্বামীজী তাদের 'বিশ্বাসঘাতক' বলে অভিহিত করেছেন। (৭।৪)। যতদিন ভারতের কোটি কোটি লোক দারিদ্র্য ও অজ্ঞানতায় ডুবে থাকবে এবং তাদের পয়সায় শিক্ষিত ব্যক্তিরা তাদের জন্য কিছু করবে না, ততদিন শিক্ষিত মানুষদের তিনি 'দেশদ্রোহী' বলে মনে করেন। (৭।৫৮)। কোটি কোটি দরিদ্র মানুষকে শোষণ করে ধনী হয়ে যারা জাঁকজমক করছে, অথচ তাদের জন্য কিছু করছে না, তারা 'হতভাগা পামর'। (৭।৫৮)।

চতুর্থতঃ—স্বামীজী বলছেন যে, গরীবরাই দেশের মূল শক্তি—জাতির

মেরুদণ্ড। তাদের উদ্যম ও কর্মকুশলতাতেই সভ্যতা গড়ে উঠেছে, তারাই সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রেখেছে, তারাই অন্নবস্ত্র উৎপাদন করছে। দরিদ্র জনতার ওপর অনেক অত্যাচার হয়েছে, তারা এখন জাগছে—একদিন অত্যাচারের প্রতিশোধ তারা নেবেই। স্বতরাং "এখন ইতরজাতদের ন্যায্য অধিকার পেতে সাহায্য করলেই ভদ্র জাতদের কল্যাণ।" এখনই তাদের ঘুম ভাঙ্গাতে সাহায্য করা উচিত, কারণ জেগে উঠে "তখন তারাও তোদের উপকার বিস্মৃত হবে না, তোদের নিকট কৃতজ্ঞ হয়ে থাকবে।" (৯।১১০)। জাতীয় জীবনে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার উল্লেখ করে স্বামীজী এইভাবে যুবকদের দরিদ্র জনসাধারণের সেবায় ব্রতী হতে উৎসাহিত করেছেন।

সম্প্রতি দু-চারজন বিদগ্ধব্যক্তি চতুর্থ বক্তব্যটিকে বিকৃতভাবে উপস্থাপিত করে দেখাতে চান যে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক মতবাদের দিক থেকে স্বামীজী প্রতিক্রিয়াশীল ছিলেন এবং নিম্নশ্রেণীর বিপ্লবী ভূমিকা রোধ করার জন্যই জনসেবার আদর্শ প্রচারিত করেছেন। বলা বাহুল্য, বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যক্ত এই একদেশদর্শী মতবাদ কেবলমাত্র বিভ্রান্তিকরই নয়, স্বামীজীর জীবনদর্শন সম্পর্কে অজ্ঞতারও পরিচায়ক।

জনজাগরণের জন্য যুবকরা কি কাজ করবে?

নিপীড়িত জনতাকে জাগাতে গেলে সহানুভূতির সংগে তাদের পাশে দাঁড়াতে হবে। তাদের অন্ন-বস্ত্র-শিক্ষা-স্বাস্থ্য দিয়ে মানুষ করে তুলতে হবে। কটিমাত্র-বস্ত্রাবৃত হয়ে তাদের বলতে হবে—ভারতবাসী আমার ভাই—নীচজাতি মূর্খ দরিদ্র অজ্ঞ মুচি মেথর চণ্ডাল আমাদের রক্ত, আমাদের ভাই—কর্মীকে ভুললে চলবে না যে, তার সম্পদ জীবন ব্যক্তিগত সুখের জন্য নয়—জন্ম থেকেই সে দেশের জন্য বলিপ্রদত্ত। (৬।২৪৯)। ভারতীয় সমাজ সংস্কারকদের নিন্দা করে তিনি বলেছেন যে, দেশে সব কিছু নিয়েই সংঘ বা সমিতি গঠিত হয়েছে, নানা স্থানে বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে সভা-সমিতি অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু দরিদ্র জনসাধারণের সমস্যা প্রতিকারের জন্য কোন সংঘ স্থাপিত হয় নি—তাদের জন্য কোন সভা-সমিতিও অনুষ্ঠিত হয় না। তীব্র ধিক্কার দিয়ে তিনি বলেছেন যে, পাশ দিয়ে অমৃত নদী বয়ে গেলেও যুগ যুগ ধরে দরিদ্র জনতাকে নর্দমার জল

পান করতে বাধ্য করা হয়েছে, স্তরে স্তরে খাদ্য সাজিয়ে রেখে তাদের অনশনে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছে, মুখে অদ্বৈতবাদ এবং সর্বভূতে ব্রহ্মের বিকাশ বলেও প্রাণপণে তাদের ঘৃণা করা হয়েছে।

জাতীয় কংগ্রেসের সমালোচনা : ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, কিন্তু তার সংগে জনসাধারণের কোন সম্পর্কই নেই—কংগ্রেস তাদের সম্পর্কে কোন ব্যাপারেই আগ্রহী নয়। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে আলমোড়ায় তিনি কংগ্রেস নেতা অশ্বিনীকুমার দত্তকে বলেন—"বলতে পারেন, কংগ্রেস জনসাধারণের জন্য কি করেছে? আপনি কি মনে করেন, কয়েকটা প্রস্তাব পাশ করলেই স্বাধীনতা এসে যাবে? তাতে আমার বিশ্বাস নেই। প্রথমে জাগাতে হবে জনসাধারণকে। গোড়ায় তাদের পেটপুরে খেতে দেওয়া হোক, তাহলেই তারা নিজেদের মুক্তির পথ করে নেবে। যদি কংগ্রেস তাদের জন্য কিছু করে তবেই কংগ্রেস আমার সহানুভূতি পাবে। সেই সঙ্গে আমাদের ইংরেজদের গুণগুলোও আত্মসাৎ করতে হবে।" (বিশ্ববিবেক, পৃঃ ১৪৮)। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ সরকারের কাছে অধিক ক্ষমতার দাবি জানাচ্ছেন, কিন্তু তাঁরা দেশের সাধারণ মানুষকে স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত নন। এর বিরুদ্ধে স্বামীজীর ধিক্কার—"আমাদের নির্বোধ যুবকগণ ইংরেজগণের নিকট হইতে অধিক ক্ষমতা লাভের জন্য সভাসমিতি করিয়া থাকে—ইহাতে ইংরেজরা হাসে। যে অপরকে স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত নয়, সে কোনমতেই স্বাধীনতা পাইবার যোগ্য নহে। দাসের শক্তি চায় অপরকে দাস করিয়া রাখিবার জন্য।" (৭।১০)। কংগ্রেস নেতারা মনে করতেন যে, জনসাধারণের দুর্দশা বা অজ্ঞানতা দূর করার সময় এখনও আসে নি—ধনীদের মতো জ্ঞানার্জনের সমান সুযোগ পেলে তারা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়বে। স্বামীজী প্রশ্ন তুলেছেন—"তাঁহারা কি একথা সমাজ কল্যাণের জন্য বলেন অথবা স্বার্থে অন্ধ হইয়া বলেন?" (৮।২৪)। কংগ্রেস নেতাদের তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলছেন যে, কেবলমাত্র দিনরাত "এ দাও, ও দাও" বলে চীৎকার করলে কিছু হবে না, গোটা কতক লোককে সিভিল সার্ভিসে ঢুকিয়ে দিলে বা কিছু রাজনৈতিক অধিকারের দাবি করলে স্বাধীনতা আসবে না। "এই ঘোর দুর্ভিক্ষ, বন্যা, রোগ-মহামারীর দিনে কংগ্রেসওয়ালারা কে কোথায় বল? খালি 'আমাদের হাতে রাজ্যশাসনের ভার দাও' বললে কি চলে?" আগে জনসাধারণের দুঃখকষ্টের দিনে তাদের পাশে দাঁড়াতে হবে, সেবা করতে হবে—

তাদের 'মানুষ' করে গড়ে তুলতে হবে। তবেই ঘটবে দেশের মুক্তি। তিনি অশ্বিনীকুমার দত্তকে বলেছিলেন—"আপনারা যান অস্পৃশ্য, মুচি, মেথরদের কাছে; তাদের গিয়ে বলুন, তোমরাই জাতের প্রাণ, তোমাদের মধ্যে যে শক্তি আছে তা দুনিয়াকে ওলট-পালট করে দিতে পারবে। জাগ তোমরা, বাঁধন ছিঁড়ে ফেল, সারা জগৎ তোমাদের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকবে। তাদের জন্য স্কুল বসান, তাদের সকলের গলায় ব্রাহ্মণের পৈতে ঝুলিয়ে দিন।" (বিশ্ববিবেক, পৃঃ ১৪৯)।

শিক্ষাবিস্তার: যুবকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলছেন যে, গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, পল্লীতে পল্লীতে জাগরণী-বার্তা নিয়ে তাদের যেতে হবে। জনসাধারণকে বলতে হবে—ওঠ, জাগ, আর ঘুমিও না। সকল অভাব, সকল দুঃখ ঘোচাবার শক্তি তাদের মধ্যেই আছে। সকলকে বোঝাতে হবে যে, ধর্ম ও সকল জাগতিক বিষয়ে চণ্ডাল ও ব্রাহ্মণের একই অধিকার। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলকে জাগাতে হবে—সোজা কথায় তাদের শাস্ত্রের মহান সত্যগুলি এবং ব্যবসা-বাণিজ্য-কৃষি প্রভৃতি গৃহস্থজীবনের অত্যাবশ্যক বিষয়গুলি শেখাতে হবে। কেবলমাত্র এই নয়—ধর্মশিক্ষার সংগে সংগে সহজভাবে তাদের ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, সাহিত্য—সবই শেখাতে হবে। ম্যাপ, ক্যামেরা, গ্লোব ও ম্যাজিকলণ্ঠনের সাহায্যে মুখে মুখে গল্পচ্ছলে মাতৃভাষায় তাদের শিক্ষা দিতে হবে। এইভাবে দরিদ্র ও পদদলিত মানুষগুলির লুপ্ত ব্যক্তিত্ব ফিরিয়ে আনতে হবে—তাদের মধ্যে জাগাতে হবে আত্মবিশ্বাস। নিজেদের অধিকার ও ভালমন্দ সম্পর্কে তারা তখন নিজেরাই সচেতন হয়ে উঠবে। এইভাবে গড়ে উঠবে "অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত একদল যুবক"। "তোমাদের উৎসাহাগ্নি তাহাদের ভিতর জ্বালিয়া দাও।" (৬।৪৩২)।

ভারত দরিদ্র দেশ। স্বামীজী জানতেন যে, গ্রামে অবৈতনিক শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত করলেও জীবিকার্জনের তাগিদে দরিদ্র বালক চাষের কাজে সাহায্য করতে মাঠে যাবে—শিক্ষা নিতে আসবে না। সুতরাং "If the mountain does not come to Mahomet, the Mahomet must come to the mountain."—পর্বত যদি মহম্মদের কাছে না যায়, তবে মহম্মদ পর্বতের কাছে যাবেন—অর্থাৎ শিক্ষার্থী যদি শিক্ষার কাছে না আসে, তবে শিক্ষা যাবে দারিদ্রের কুটিরে, চাষীর লাঙলের কাছে, মজুরের কারখানায় এবং অন্যান্য সব

জায়গায়। সারাদিন কাজের পর গাছতলায় চাষীদের বিশ্রামের সময় বা সন্ধ্যে-বেলায় তাদের একত্রিত করে এই শিক্ষা দিতে হবে। আসলে তাদের মাথায় ভাবটা ঢুকিয়ে দিতে পারলেই হল—বাকিটা তারা নিজেরাই করে নেবে। (৬।৪৩৫-৩৬)। স্বামীজী লিখছেন—"কতকগুলো চাষার ছেলেমেয়েকে একটু লিখতে পড়তে শেখাও ও অনেকগুলো ভাব মাথায় ঢুকিয়ে দাও—তারপর গ্রামের চাষারা চাঁদা করে তাদের এক-একটাকে নিজেদের গ্রামে রাখবে। 'উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং' (নিজেই নিজেকে উদ্ধার করবে)—সকল বিষয়েই এই সত্য। We help them to help themselves (তারা যাতে নিজেই নিজেদের কাজ করতে পারে, এইজন্য আমরা তাদের সাহায্য করছি।)··· ওরা যখন বুঝতে পারবে নিজেদের অবস্থা, উপকার ও উন্নতির আবশ্যকতা, তখনই তোমার ঠিক কাজ হচ্ছে জানবে।" (৮.১০৩)।

এ সব কাজ ব্যয়সাপেক্ষ—যত কমই হোক কিছু খরচ তো আছেই। অর্থাভাবে কি করে কাজ হবে? স্বামীজী বলছেন—যতটুকু ক্ষমতা ততটুকুই হোক না কেন! পয়সার অভাবে কিছু যদি নাই হয়—দরিদ্র জনতাকে অন্ততঃ একটা মিষ্টি কথা বা দুটো সৎ উপদেশও তো দেওয়া যেতে পারে। তাতেও অনেক উপকার। (৯।১৩৬)।

স্বামীজী বলছেন—এই সব শিক্ষা পেয়ে দরিদ্র মানুষরা কিন্তু তাদের জাত-ব্যবসা ছাড়বে না—বরং শিক্ষা পেয়ে নিজেদের সহজাত কর্ম আরও উন্নততর করার চেষ্টা করবে। স্বামীজী বিশ্বাস করতেন যে, সাধারণ মানুষের মধ্যে লোকশিক্ষা বিস্তৃত হলে জনসাধারণ নিজেদের প্রয়োজন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হবে—গড়ে উঠবে জনমত বা লোকশক্তি এবং এই লোকশক্তিই সমাজসংস্কারের দাবি নিয়ে হাজির হবে। লোকশিক্ষা বিস্তারের জন্য স্বামীজী মঠে একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা গঠনে ইচ্ছুক ছিলেন। তিনি মনে করতেন যে, একমাত্র শিক্ষা-বিস্তার ও প্রচারকার্যের ফলেই জাতিভেদ প্রথা, অস্পৃশ্যতা, বাল্যবিবাহ প্রভৃতি নিরোধ করা যায়। ব্রাহ্মণেতর জাতিদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও সাম্যের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি তাদের উপনয়ন ও গায়ত্রী দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। (৯।৭৭-৭৮)। স্বামীজী সমাজে সাম্য চেয়েছিলেন। সাম্য মানে উচ্চবর্ণ বা ধনীকে টেনে নামান নয়—দরিদ্রকে ধনী করা, শূদ্রকে ব্রাহ্মণ্য গুণাবলীর অধিকারী করে ব্রাহ্মণত্বে পৌঁছে দেওয়া।

কাজের জন্য সঙ্ঘ চাই

যে কোন ভাল ও বড় কাজ করতে গেলে সঙ্ঘ অপরিহার্য। স্বামীজী তা জানতেন এবং এই কারণে প্রথমবার আমেরিকা গিয়ে সেখান থেকে বিভিন্ন চিঠিতে বারবার তিনি সঙ্ঘের গুরুত্ব সম্পর্কে আলাসিঙ্গা এবং গুরুভাইদের চিঠি লিখছেন। বলা বাহুল্য, স্বামীজীর এই সব পত্র ও অন্যান্য রচনাতে সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা, তার সমস্যা ও সমাধান সম্পর্কে যথেষ্ট আলোচনা আছে।

স্বামীজীর মতে, সঙ্ঘই শক্তি এবং এই কারণে বারবার তিনি কাজের জন্য সমিতি বা সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। তিনি বলছেন যে, ধনী ও গণ্যমান্যদের ওপর ভরসা করে লাভ নেই কারণ তাঁরা মৃতকল্প—যুব সম্প্রদায়ই একমাত্র আশা এবং এজন্য ধীর স্থির ও নিঃশব্দে তাদের মধ্যে কাজ করাই ভাল। (৭।৩২৬)। উপযুক্ত শিক্ষা বিস্তারের অভাবে ভারতে এখনও সাধারণের ভোট নিয়ে সমিতির কার্য পরিচালনার সময় আসে নি—সময় হলে অন্য কথা, তবে আপাততঃ সমিতিতে একজন Dictator বা পরিচালক থাকবে। সকলে তাঁর আদেশ মেনে চলবে। (৯।৬০-৬১)। স্বামীজীর মতে, সঙ্ঘই শক্তি এবং আজ্ঞাবহতাই হল তার গূঢ় রহস্য। (৭।২৫৩)।

কয়েকটি অবশ্য পালনীয় বিধি: সমিতির সকলকেই কাজের জন্য তৈরী থাকতে হবে, যাতে একজনের মৃত্যু হলে আরেকজন কাজটা ধরতে পারে। সমিতির কাজে সবার আগ্রহ থাকা চাই, কেননা আগ্রহ না থাকলে কেউ কাজ করে না। এ জন্য সকলকে দেখানো উচিত যে, সমিতির কাজে ও সম্পত্তিতে সবার অংশ এবং কার্যধারা সম্পর্কে সবার মত প্রকাশেরও অধিকার আছে। কাজের লোক তৈরী করার জন্য প্রত্যেককে পর্যায়ক্রমে দায়িত্বপূর্ণ পদ দিতে হবে। এতে কর্মী তৈরী হয় এবং সমিতি পরবর্তীকালেও টিঁকে থাকে। স্বামীজী বলছেন যে, ভারতে আমরা কারো সঙ্গে ক্ষমতা ভাগ করে নিতে চাই না এবং আমাদের পরে কি হবে তা চিন্তা করি না—এ কারণেই, ভারতে সমিতি টেঁকে না। (৮।৪২-৪৩)। তিনি স্পষ্টই বলছেন যে, সমিতির মধ্যে ঈর্ষা, দুর্নীতি, বদ মতলব, গুপ্ত বদমাশি, লুকোনো জুয়োচুরি, মাতব্বরি, নাম-যশের আকাঙ্ক্ষা, কপট, দাসভাবাপন্ন কাপুরুষ, নিছক জড়বাদী (৬।৪০২), নিষ্ঠুর, অলস, স্বার্থপর, (৭।৫৩) বেইমান, নিন্দাপরায়ণ ব্যক্তি (৭।১১-১২), প্রতারক ও হামবাগ (Humbug) (৮।২০) প্রভৃতির অনুপ্রবেশ

যেন না ঘটে। কাজের লোক চাই—"যাদের করবার ইচ্ছা নেই—'যাদু, এই বেলা পথ দেখ' তারা।" (৮।২০)। "একজন গোপনে অপরের নিন্দা করিতেছে, তাহা শুনিও না।" (৭।১১)। সর্বাঙ্গসুন্দর চরিত্রের মানুষ চাই—দশজন বা দু'জন হোক, ক্ষতি নেই, কিন্তু তারা হবে 'Perfect Charecters'। "যিনি পরস্পরের গুজুগুজু নিন্দা করবেন বা শুনবেন, তাকে সরিয়ে দেওয়া উচিত। ঐ গুজুগুজু সকল নষ্টের গোড়া।" (৭।২৮)।

কারো সংগে বিবাদ-বিসম্বাদ নয়, কারো মতকে 'দুঃ ছাই' করাও নয়—"তাতে লোক বড়ই চটে।" (৭'৫৩)। সবার সংগে মিলে মিশে চলতে হবে। "কারুর উৎসাহ ভঙ্গ করতে নাই। Criticism (বিরুদ্ধ সমালোচনা) একেবারে ত্যাগ করবে। যতদূর ভাল বোধ হয়, সকলকে সাহায্য করবে; যেখানটায় ভাল না বোধ হয়, ধীরে বুঝিয়ে দিবে। পরস্পরের Criticise (বিরুদ্ধ সমালোচনা) করাই সকল সর্বনাশের মূল। দল ভাঙবার ঐটি মূলমন্ত্র। 'ও কি জানে?' 'সে কি জানে?' 'তুই আবার কি করবি?' আর তার সঙ্গে ঐ একটু মুচকে হাসি, ঐগুলো হচ্ছে ঝগড়া-বিবাদের মূল সূত্র।" (৭।১১৬) কোন ব্যক্তি বা সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে কিছু বলা হবে না (৬।৪০২), গোঁড়াদের মত নিজের মত অন্যের ওপর চাপাবার জন্য পীড়াপীড়ি করা হবে না (৬।৪৩১)—"সকলকেই মিষ্টি বচন চটলে সব কাজ পণ্ড।" (৬।৪৪৮)। রাজনীতি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে তিনি বলছেন—"পলিটিক্যাল বিষয় তোমরা কেউ ছুঁয়ো না,……এখন পাবলিক ম্যান, অনর্থক শত্রু বাড়াবার দরকার নাই।" (৬।৪৮৭)। ভাল বুঝলে কিছু মান্য-গণ্য ও ধনী ব্যক্তিকে ধরে সমিতির কর্মকর্তারূপে তাঁদের নাম প্রকাশ করতে হবে—তাঁদের নামে অনেক কাজ হবে, যদিও আসল কাজ নিজেদেরই করতে হবে। (৬।৪৭৬)।

স্বামীজী বলছেন—পবিত্রতা সহিষ্ণুতা অধ্যবসায়—এবং সর্বোপরি প্রেমই হল সিদ্ধিলাভের উপায়। এ জন্য সকলকে পবিত্র ও অকপট হতে হবে (৭।১৬) —চরিত্রবান হতে হবে কারণ টাকা, বিদ্যা বা নামযশে কিছু হয় না—একমাত্র "চরিত্রই বাধাবিঘ্নে বজ্রদৃঢ় প্রাচীর ভেদ করতে পারে।" (৭।৫৩)। স্বামীজীর আহ্বান—"উঠে পড়ে লাগো! নাম, যশ বা অন্য কিছু তুচ্ছ জিনিষের জন্য পশ্চাতে চাহিও না।" (৬।৪৩০)।

অর্থ: সমিতির কাজের জন্য অর্থ চাই। টাকার হিসেব সম্পর্কে স্বামীজী

বারবার সতর্ক করে দিয়েছেন। "টাকাকড়ি সম্বন্ধে সাবধান হইবে। হিসাব তন্ন তন্ন রাখিবে ও টাকার জন্য আপনার বাপকেও বিশ্বাস নাই জানিবে।" (৮।২০)। খরচের ব্যাপারে কমিটির প্রত্যেকের মত ও সই নিতে হবে—তা না হলেই বদনাম। হিসেব সর্বদাই তৈরী থাকবে—এ ব্যাপারে "কুড়েমী করতে করতেই লোকে জোচ্চর হয়।" (৮।৬৩)। পরে ফিরিয়ে দেব মনে করে কোন অবস্থাতেই ফাণ্ডের টাকা নিজের কাজে ব্যবহার করা চলবে না। (৭।২৬৪)।

অর্থ সংগ্রহের উপায়: স্বামীজী জানতেন যে, কাজের জন্য এ দেশে কেউ টাকা দিতে চায় না এবং অর্থ-সমস্যা সঙ্ঘের একটি প্রধান সমস্যা। তিনি বলছেন যে, মানুষেই টাকা করে, টাকায় মানুষ করে না। মন-মুখ এক করতে পারলে জলের মত টাকা আপনা-আপনি এসে পায়ে পড়বে।' (৯।১৩)।

ছোট হারে কাজ শুরু করতে হবে: 'হয়তো দুর্ভিক্ষ বা খাদ্যাভাব চলছে। উৎসাহী কর্মীরা নিজেরা ভিক্ষা করে, নিজেরা রান্না করে ছোট হারে মুষ্টিমেয় দুঃস্থ মানুষের সেবা শুরু করল। খবর এমনিই ছড়িয়ে পড়বে, লোকে তখন অযাচিতভাবে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে—তখন আর টাকার অভাব হবে না। প্রথমে অন্নদান—বিদ্যাদান বা জ্ঞানদান অপেক্ষা অন্নদানেই বেশী মানুষকে আকৃষ্ট করা যায় এবং জন-সহানুভূতিও বেশী মেলে। এইভাবে অন্নদানের মাধ্যমে লোকদের আকৃষ্ট করে ধীরে ধীরে বিদ্যাদান শুরু করা যেতে পারে। (৯।১২৭)। ধীরে ধীরে কাজের পরিধি ও কেন্দ্রের সংখ্যাও বৃদ্ধি করতে হবে।

জাত-পাত ও অনাথ মেয়ের সমস্যা: স্বামীজী বলছেন যে, সেবাকার্যে জাত-পাত-ধর্ম প্রভৃতি নিয়ে বিচার করা চলবে না। হিন্দু, মুসলিম, খ্রীষ্টান সকলের জন্যই এ কাজ। (৭।৬৭)। স্বামী অখণ্ডানন্দকে তিনি লিখছেন যে, অনাথ আশ্রমে সব জাত ও ধর্মের ছেলে ও মেয়েদের নিতে হবে—"যা পাবে টেনে নেবে, এখন বাছ বিচার করো না।" (৮।১০২)। অনাথ মেয়ে হাতে পড়লে আগে তাদের নিতে হবে, না হলে খ্রীষ্টানরা তাদের নিয়ে যাবে (ঐ) —তবে মেয়ে-অনাথ আশ্রমের দায়িত্ব থাকবে মেয়ে সুপারিনটেনডেন্টের ওপর বা কোন বৃদ্ধা বিধবার ওপর। (৮।৭,১০২)। মুসলিম বালক পেলে অবশ্যই নিতে হবে তবে "তাহাদের ধর্ম নষ্ট করিবে না।" (৮।৭)। অনাথ আশ্রমের বালক-বালিকারা যাতে নীতিপরায়ণ, মনুষ্যত্বশালী, পরহিতব্রত হয়—এমন শিক্ষা তাদের দিতে হবে এবং সেই সংগে শেখাতে হবে ধর্মের সর্বজনীন ভাব। (ঐ)।

পত্রিকা প্রকাশ : সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হলে তার একটি মুখপত্রও দরকার। স্বামীজী আলাসিঙ্গাকে লিখছেন—"একটি ছোটখাট সমিতি প্রতিষ্ঠা কর, তার মুখপত্রস্বরূপ একখানা সাময়িক পত্র বার কর।" (৬।৫৭৩)। দূরের বন্ধু-বান্ধবরা গ্রাহক সংগ্রহ করে দেবে। (৬।৪৫৮)। তিনি লিখছেন, পত্রিকার প্রথম সংখ্যাটির "বাইরের চাকচিক্য যেন ভাল হয়।" ভাল ভাল লেখকদের ভাল ভাল প্রবন্ধ থাকবে। প্রচ্ছদপটে প্রবন্ধ ও লেখকদের নাম এবং চারধারে খুব ভাল প্রবন্ধ ও তার লেখকদের নাম থাকবে। (৭।১১৫-১৬)। গুরুগম্ভীর বিষয় যেন লঘুভাবে আলোচনা করা না হয়—সুর থাকবে উচ্চগ্রামে বাঁধা। (৬।১১৫)। সব লেখাই যে সকলকে বুঝতে হবে, তার কোন মানে নেই। (৭।২৬৪)। মলাট বেশী রংচঙে, চটকদার হবে না বা তাতে অনাবশ্যক একগাদা মূর্তি থাকবে না—"নকশা হওয়া চাই সাধাসিধে, ভাবদ্যোতক অথচ সংক্ষিপ্ত।" (৭।২৫৯,২৭৭)।

নেতৃত্ব : স্বামীজীর মতে "ভারতে সবাই নেতা হতে চায়, হুকুম তালিম করবার কেউ নেই।" (৯।৪৬৭)। নেতৃত্ব করার সময় সেবকভাবাপন্ন হতে হবে—তুমি মস্ত লোক তা দেখাতে গেলে অন্যের মনে হিংসার উদ্রেগ হবে—সঙ্ঘ ভেঙে যাবে। (৭।১১,১১৫)। কারো ওপরে হুকুম চালাবার চেষ্টা করা চলবে না—যে অন্যের সেবা করতে পারে সেই সর্দার। (৬।৩৪)। কাজ করতে হবে সেবক হিসেবে—সর্দার হিসেবে নয়। (৬।৪৭৪)। স্বামীজী বলছেন যে, শ্রেষ্ঠ নেতা তিনিই, যিনি শিশুর মত অন্যের ওপর নেতৃত্ব করেন। (৮।৩)। নেতা হতে গেলে ত্যাগ করতে হবে—"'শিরদার তো সরদার'; মাথা দিতে পারো তো নেতা হবে। আমরা সকলেই ফাঁকি দিয়ে নেতা হতে চাই; তাইতে কিছুই হয় না, কেউ মানে না!" (৬।৮১)। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে তিনি লিখছেন—"দাদা leader (নেতা) কি বনাতে পারা যায়? Leader জন্মায়।…… লিডারি করা আবার বড় শক্ত—দাসস্য দাসঃ, হাজারো লোকের মন যোগানো Jealousy, selfishness (ঈর্ষা, স্বার্থপরতা) আদপে থাকবে না—তবে leader. প্রথম by birth (জন্মগত), দ্বিতীয় unselfish (নিঃস্বার্থ), তবে leader." (৭।২৫)। তিনি বলছেন যে, হামবড়াই বা দলাদলি বা ঈর্ষা একেবারে জন্মের মত বিদায় করতে হবে। "পৃথিবীর ন্যায় সর্বংসহ হইতে হইবে; এইটি যদি পারো দুনিয়া তোমাদের পায়ের তলায়।" (৬।৪৯৯)।

বাধা-বিঘ্ন : কাজ করতে গেলে বাধা-বিঘ্ন, গুপ্ত শত্রুতা, নিন্দা, দুর্নাম

অনেক কিছুই আসবে—এসবে মন খারাপ করলে চলবে না, হতাশায় ভেঙে পড়লে হবে না, নিরাশ হওয়া যাবে না, ভয় পাওয়াও চলবে না। স্বামীজী বলছেন—ভয় পেয়ো না, কাজ সামান্য থেকেই বড় হয়। সাহস অবলম্বন কর (৬।৪৩২), যখনই তুমি সাহস হারাবে, তখনই তুমি শুধু নিজের অনিষ্ট করছ না, কাজেরও ক্ষতি করছ। অসীম বিশ্বাস ও ধৈর্যই সাফল্যের একমাত্র উপায়। (৭।৯৭)। ভরসায় বুক বাঁধো—নিরাশ হয়ো না। (৬।৪৯৪)। সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ও দৃঢ়চিত্ত হয়ে কাজ করে যাও। আমরা বড় বড় করব—ভয় পেও না। (৭।১১৫)। তিনি বলছেন, যে যা বলে বলুক, নিজের গোঁয়ে চলতে হবে—দুনিয়া এমনিতেই পায়ের তলায় আসবে—দরকার শুধু নিজের ওপর বিশ্বাস। (৬।৪৮৯)। ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখতে হবে, তাহলে "কেউ তোমার বিরুদ্ধে লেগে কিছু করতে পারবে না।" (৭।৫৭)। স্বামীজী বলছেন, নিন্দাকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনা চলবে না—এর একমাত্র জবাব চুপ করে থাকা। (৬।৪৯৩)। নতুন কিছু করতে গেলে নিন্দা-সমালোচনা হবেই। স্বামীজী বলতেন—"হাতী চলে বাজারমে, কুত্তা ভোঁকে হাজার। সাধুনকো দুর্ভাব নাহি, যব নিন্দে সংসার।" (৯।২২৪)। কাজে বাধা দেবার জন্য পুলিশও পেছনে লাগতে পারে। সেক্ষেত্রে স্বামীজীর বক্তব্য—"যদি পুলিশ-ফুলিশ পেছনে লাগে তোদের—'দাঁড়িয়ে জান্ দে'। ওরে বাপ, এমন দিন কি হবে যে, পরোপকারায় জান্ যাবে?" স্বামীজীর মতে বড় মানুষ তাঁরাই যাঁরা নিজের বুকের রক্ত দিয়ে রাস্তা তৈরী করেন। একজন নিজের শরীর দিয়ে সেতু বানায়, আর হাজার লোক তার উপর দিয়ে নদী পার হয়। (৬।৪৮৭)। স্বামীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত কর্মীদের নিরাশ হওয়া বা ভেঙে পড়ার কোন উপায় নেই—স্বামীজীর উদ্দীপনাময় বাণীই তাদের পথ দেখাবে, বিপদে বাধার মুখে মনে সাহস যোগাবে—"তোমরা যদি আমার সন্তান হও, তবে তোমরা কিছুই ভয় করবে না, কিছুতেই তোমাদের গতিরোধ করতে পারবে না। তোমরা সিংহতুল্য হবে। ভারতকে—সমগ্র জগৎকে জাগাতে হবে। এ না করলে চলবে না। কাপুরুষতা চলবে না—বুঝলে? মৃত্যু পর্যন্ত অবিচলিতভাবে লেগে পড়ে থেকে আমি যেমন দেখাচ্ছি, করে যেতে হবে—তবে তোমার সিদ্ধি নিশ্চিত।...এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও। এই তো সবে আরম্ভ।...আরও ভাল কর, তার চেয়ে ভাল কর—এইরূপে এগিয়ে চল, এগিয়ে চল।...ধৈর্য, পবিত্রতা ও অধ্যবসায়ের জয় হবে।" (৭।৩৫-৩৬)

কর্মীদের স্বাধীনতা : স্বামীজী মনে করতেন যে, কর্মীদের স্বাধীনতা দেওয়া দরকার। এতে তাদের দায়িত্ব বৃদ্ধি পাবে এবং ধীরে ধীরে নিজেরাই বড় কাজও করতে পারবে। মঠে যুবক-সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদের ওপর কাজের ভার ছিল। স্বামীজী বলতেন—"ওদেরও একটু স্বাধীনতা থাকা চাই, ওদেরও দায়িত্ববোধ হওয়া চাই; না হলে এর পরে বড় বড় কাজ করবে কি করে?" মাদ্রাজের যুবকদের বারবার তিনি লিখছেন যে, তারা যেন কারো ওপর ভরসা না করে—এমনকি তাঁর ওপরেও নয়—তারা নিজেরাই যেন নিজেদের পরিচালনা করে। (৬।৫০৪)।

যুবকদের পেশা কি হবে?

স্বামীজী এটা কখনই চান নি যে, দেশশুদ্ধ সব যুবকই সন্ন্যাসী হবে বা দরিদ্র জনগণের সেবায় আত্মনিয়োগ করবে। করার অন্য কাজ আরও আছে—স্বামীজীর মতে সব কাজই দেশ-সাধনা, সাধুর কুটির থেকে কৃষিক্ষেত্র কলকারখানা—সব স্থানই দেবমন্দিরের মত পবিত্র।

চাকরী নয় : জীবিকা নির্বাহের জন্য এই সব যুবকরা কি চাকরী করবে? বলা বাহুল্য, ভারতীয় যুবকদের চাকুরী-প্রীতিকে স্বামীজী বারংবার নানাভাবে ধিক্কার জানিয়েছেন। স্বামীজী ব্যঙ্গের সংগে মন্তব্য করেছেন যে, ভারতীয়দের বিদ্যাশিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য হল হয় কেরানী বা ডেপুটিগিরির চাকরী লাভ, না হয় একটা দুষ্ট উকিল হওয়া। তাঁর মতে, ইংরেজের অধীনে চাকরী করার অর্থ হল দাসত্ব—'গুখুড়ী'।

কৃষিকার্য : আলোয়ারে স্বামীজী তাঁর এক শিষ্যকে বলেন যে, চাকরীর পরিবর্তে কৃষিকার্যই ভাল। তিনি বলেন যে, প্রাচীনকালে রাজা ও মুনি-ঋষিরা চাষ করতেন, আমেরিকা চাষ করেই বড়—আর ভারতে অন্য চিত্র। দু-পাতা লেখাপড়া শিখেই চাষার ছেলে স্বধর্ম ত্যাগ করে শহরে ছোটে গোলামির আশায়। শিক্ষিত লোক গ্রামে বাস করে চাষবাস করলে আয়ু বাড়ে, রোগ হয় না, অনুন্নত গ্রামগুলো উন্নত হয়, বিজ্ঞানের সাহায্যে চাষ করলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, দরিদ্র চাষীরাও তা শেখে, তাদের লেখাপড়া শিখতে আগ্রহ হয়। শিক্ষিত ভদ্রলোক ও চাষীর মধ্যে মেলামেশা হলে দু-পক্ষের হৃদ্যতা বাড়ে এবং চাষীদের জ্ঞানবৃদ্ধি ঘটে। শিক্ষিত যুবক যদি সন্ধ্যে বেলায় নিজের বাড়ীতে

চাষীদের গল্পচ্ছলে শিক্ষা দেয়—"তাহলে রাজনৈতিক আন্দোলন করে হাজার বৎসরে যা না করতে পারা যাবে, তার শতগুণ বেশী ফল দশ বৎসরে হয়ে পড়বে।"

ব্যবসা: স্বামীজী তাঁর শিক্ষিত শিষ্যকে ব্যবসা করার পরামর্শ দিচ্ছেন। স্বামীজী বলছেন যে, টাকা না জুটলে জাহাজের খালাসী হয়ে বিদেশে গিয়ে ভারতের গামছা, কাপড়, কুলো, ঝাঁটা, বেনারসী ইওরোপ-আমেরিকার রাস্তায় ফেরী করলেই প্রচুর পয়সা পাওয়া যাবে। সে-দেশের বন্ধুদের বলে প্রথমটা তিনি চালিয়ে দেবেন। পরে বহু লোক তাদের অনুসরণ করবে—"তুই তখন মাল দিয়ে কুলিয়ে উঠতে পারবিনি।" (৯।১০৬)। বলা বাহুল্য, সেদিন শিষ্যের উদ্যমহীনতা ও সাহসের অভাব দেখে স্বামীজী ক্ষুব্ধ হয়ে বলেছিলেন—"একটা ছুঁচ গড়বার ক্ষমতা নেই, তোরা আবার ইংরেজদের criticise (দোষ গুণ-বিচার) করতে যাস—আহম্মক! ওদের পায়ে ধরে জীবনসংগ্রামোপযোগী বিদ্যা, শিল্পবিজ্ঞান, কর্মতৎপরতা শিখগে। যখন উপযুক্ত হবি, তখন তোদের আবার আদর করবে।" (৯।১০৬-০৭)।

শিল্প-কারখানা: তিনি চান যুবকরা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে দেশে শিল্পশালা, কারখানা প্রভৃতি গড়ে তুলুক। (৯।৪০২)। এজন্য তিনি দেশে কারিগরী শিক্ষা চান, চান যে শিক্ষিত যুবকেরা শিল্পশিক্ষার জন্য প্রতি বছর জাপানে যাক্। এর ফলে দেশের কল্যাণ হবে। বিদেশীর দাসত্ব করতে হবে না এবং দেশের লোকের কর্মসংস্থান হবে। (৯।৪০৩, ৪০৬)। সন্ন্যাসী হয়েও তিনি মানুষের জাগতিক উন্নতিকে উপেক্ষা করেন নি। তিনি দৃঢ়তার সংগে বলেছেন যে, জাগতিক উন্নতি ও বাহ্য সভ্যতা অবশ্য প্রয়োজনীয়। "বাহ্য সভ্যতা আবশ্যক, শুধু তাহাই নহে; প্রয়োজনের অতিরিক্ত বস্তুর ব্যবহারও আবশ্যক, যাহাতে গরীব লোকের জন্য নূতন নূতন কাজের সৃষ্টি হয়।...যে ভগবান এখানে আমাকে অন্ন দিতে পারেন না, তিনি যে আমাকে স্বর্গে অনন্ত সুখে রাখিবেন—ইহা আমি বিশ্বাস করি না।" (৭।১০)।

বিদেশ যাত্রা: স্বামীজী যুবকদের কূপমণ্ডূকতা ত্যাগ করে বিদেশ ভ্রমণের পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি যুবকদের বলছেন, সম্প্রসারণই জীবন, সংকীর্ণতাই মৃত্যু। নিজেদের সংকীর্ণ গর্ত থেকে বাইরে গেলে দেখা যাবে জগতের অন্যান্য জাতি কি রকম এগিয়ে চলেছে। তিনি চান যে, যুবকরা প্রতি বছর দলে দলে

চীন ও জাপানে যাক—জাপানে যাওয়া বিশেষ প্রয়োজনীয়। (৬৩৫৮)। জাপানীদের উন্নতি, আত্মপ্রত্যয়, সততা—বিশেষতঃ স্বদেশপ্রেম দেখে স্বামীজী মুগ্ধ হয়েছিলেন। "জাপানীরা তাদের দেশের জন্যে সব ত্যাগ করতে প্রস্তুত।" তাঁর মতে জাপানীদের উন্নতির মূল রহস্যটা হল "আত্মপ্রত্যয় আর তাদের স্বদেশের উপর ভালবাসা।" (৯।৪৬১)।

৯ স্বামীজী সন্ন্যাসী—কিন্তু সংসারে তাঁর একটি মাত্র বন্ধন, একটি মাত্র ভালবাসার বস্তু, তা হল তাঁর স্বদেশ। একবার স্বামীজীকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, সন্ন্যাসী তো দেশকালের ঊর্ধে—সন্ন্যাসীর তো উচিত নিজের দেশের মায়া ত্যাগ করে সকল দেশের ওপর সমদৃষ্টি স্থাপন করে সকল দেশের কল্যাণ চিন্তা করা।

স্বামীজী উত্তেজিত হয়ে উত্তর দিয়েছিলেন—"যে নিজের মাকে ভাত দেয় না, সে অন্যের মাকে আবার কি পুষবে?" (৯।৩৮০)।

এই সন্ন্যাসীর নাম বিবেকানন্দ—এমন জ্বলন্ত দেশপ্রেমের নাম বিবেকানন্দ, মানুষের প্রতি এমন ভালবাসার নাম বিবেকানন্দ, এমন তেজস্বিতার নাম বিবেকানন্দ, এমন আত্মবিশ্বাসের নাম বিবেকানন্দ। যুবকরা হল এই বিবেকানন্দের সৈনিক। সমকাল ও উত্তরকালে বিবেকানন্দের এই সেনাদল নূতন করে রচনা করেছিল দেশ ও জাতির ইতিহাস—তাদের পতাকায় লেখা ছিল —"জয় বিবেকানন্দের জয়।"

৫

যুবসমাজের ওপর স্বামীজীর প্রভাব

স্বামী বিবেকানন্দ এমন এক ব্যক্তিত্ব, যিনি তাঁর সমকাল এবং পরবর্তী-কালের এমন কোন সমস্যা নেই, যা সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত বক্তব্য পেশ না করেছেন। তিনি এমন এক ব্যক্তিত্ব যাঁকে একজন শিল্পী শিল্পী মনে করতে পারেন, কবি তাঁকে কবি মনে করতে পারেন, ধর্মপিপাসু মানুষ তাঁকে ধর্মনেতা মনে করতে পারেন, দেশপ্রেমিক তাঁকে দেশপ্রেমিক মনে করতে পারেন, রাজনীতিবিদ তাঁকে রাজনৈতিক নেতা মনে করতে পারেন। বিবেকানন্দ এমনই এক বিচিত্র ব্যক্তিত্ব। কবি শিল্পী দেশপ্রেমিক অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিবিদ, দেশপ্রেমিক, সন্ন্যাসী—যে ভাবেই তাঁকে দেখা হোক না কেন, সর্বক্ষেত্রেই তিনি সার্থক। স্বামীজীর সমকালের যুবকরা তাঁকে নিছক একজন প্রতিভাদীপ্ত সন্ন্যাসী হিসেবে দেখেননি—তাঁর মধ্যে তাঁরা দেখেছিলেন অসীম কর্মক্ষম গৈরিকধারী এক যুবনেতাকে। তাঁর জীবদ্দশায় হাজার হাজার যুবক তাঁকে কেন্দ্র করে মেতে উঠেছিল, পরবর্তীকালে তা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে—বর্তমানে দেশে-বিদেশে বিবেকানন্দ-অনুগামী যুবকের সংখ্যা অগণিত। বিবেকানন্দ কেবলমাত্র ভারতেরই নন—তিনি বিশ্বের। তাঁর আহ্বান সমগ্র দেশ-কালের ঊর্ধ্বে সারা বিশ্বের যুবসমাজের প্রতিই। আমাদের সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, সংগীত, শিক্ষা, সেবা, দেশচর্চা—সব কিছুর ওপরেই তাঁর প্রভাব ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী।

সেবাকার্য

যুবকদের সংগে স্বামীজীর প্রীতির সম্পর্ক ছিল। তিনি যেখানেই গেছেন তাঁর চারপাশে ভীড় করেছে যুবকরা। দলে দলে তারা মঠে আসত—স্বামীজী তাদের সংগে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা করে তাদের মনে দেশপ্রেম ও সমাজ সেবার বীজ বপন করতেন। যুবসমাজ তাঁর দ্বারা উদ্দীপ্ত হয়েছিল। স্বামী অখণ্ডানন্দ,

স্বামী স্বরূপানন্দ, কল্যাণানন্দ ও সুরেশ্বরানন্দের নেতৃত্বে মুর্শিদাবাদ, দিনাজপুর, বৈদ্যনাথ, মধ্যপ্রদেশ, ভাগলপুর প্রভৃতি স্থানে সেবাকার্য শুরু হলে তাঁরা সংগে বহু যুবক পেয়েছিলেন। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় প্লেগ শুরু হলে স্বামীজীর উদ্যোগে ও ভগিনী নিবেদিতার নেতৃত্বে যে ত্রাণকার্য শুরু হয়, তাতেও বহু ছাত্র ও যুবক যোগদান করে। স্বামীজী এ কাজে যুবকদেরই চেয়েছিলেন। ২২-এ এপ্রিল বিডন স্ট্রীটের ক্লাসিক থিয়েটারে স্বামীজীর সভাপতিত্বে ভগিনী নিবেদিতা 'প্লেগ ও ছাত্রদের কর্তব্য' সম্পর্কে এক দৃপ্ত ভাষণ দিয়ে ছাত্র সমাজের পৌরুষ জাগ্রত করতে প্রয়াসী হন। স্বামীজী তাঁর ভাষণে ত্রাণকার্যের কথা 'ছাত্রদের মনে গেঁথে দেন'। সভার পরেই কিছু তরুণ স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে নাম লেখায়। এই স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন পরবর্তীকালের বিখ্যাত 'বাঘা যতীন'। এই সব যুবকরা সেদিন সত্যিই 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'-য় অবতীর্ণ হয়েছিল। বলা বাহুল্য, এটিই হল বাংলার যুবকদের প্রথম সঙ্ঘবদ্ধ সেবাকার্য। ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকার সেদিন বাগবাজার পল্লীতে ঝাড়ুহাতে বহু যুবককে দেখেছিলেন। স্বামীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে কিছু যুবক ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে কাশীতে প্রতিষ্ঠিত করেন "দরিদ্র-দুঃখ-মোচন-সঙ্ঘ" ('Poormen's Relief Association')। এই যুবকরা হলেন শ্রীচারুচন্দ্র দাস, (যিনি পাশ্চাত্য-বিজয়ের পর স্বামীজীর কলকাতা আগমনের সময় অনেকের সংগে স্বামীজীর গাড়ীর ঘোড়া খুলে দিয়ে নিজেরাই গাড়ী টেনেছিলেন), হরিনাথ ওদেদার, কেদারনাথ মৌলিক এবং যামিনীরঞ্জন মজুমদার। যামিনীরঞ্জন স্বামীজীর 'সখার প্রতি' কবিতাটি পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন—সেখান থেকেই তিনি পেলেন দরিদ্র সেবার দীক্ষা—ঐ হল তাঁর জপমন্ত্র। তাঁরা প্রতিষ্ঠিত করলেন 'দরিদ্র-দুঃখ-মোচন সঙ্ঘ'। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজী কাশীতে এলে এই যুবকেরা তাঁর সংগে দেখা করে। স্বামীজী তাদের বলেন—"বৎসগণ, এই হচ্ছে প্রকৃত মানবধর্ম। তোমরা ঠিক পথই অনুসরণ করছ। আশীর্বাদ করি ভগবান তোমাদের সহায় হন। সাহসে বুক বেঁধে অগ্রসর হও। তোমরা দরিদ্র বলে হতাশ হয়ো না। টাকা আসবে। তোমাদের এই ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানের ভিত্তির উপর ভবিষ্যতে এত বড় কাজ হবে, যা তোমরা কল্পনাও করতে পার না।" বলা বাহুল্য, স্বামীজীর ভবিষ্যৎ বাণী ব্যর্থ হয় নি—পরবর্তীকালে এই প্রতিষ্ঠানটি "শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে' পরিণত

হয়। কালক্রমে চারুচন্দ্র দাস (স্বামী শুভানন্দ) কেদারনাথ মৌলিক (স্বামী অচলানন্দ) ও হরিনাথ ওদেদার (স্বামী সদাশিবানন্দ) রামকৃষ্ণ মিশনে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

এইভাবে যুবসমাজের অন্তরে মানুষের সেবার প্রতি আগ্রহ জেগে ওঠে। বাংলার নানাস্থানে যুবকেরা ত্রাণকার্য ও দরিদ্রদের সেবার জন্য সংঘ প্রতিষ্ঠা করতে থাকে—এমনকি বিপ্লবীরাও সেবাকার্যে অংশ গ্রহণ করতে থাকেন। মুর্শিদাবাদের বহরমপুর থেকে ছাত্ররা দলে দলে সারগাছি আশ্রমে যেতেন স্বামী অখণ্ডানন্দের কাছ থেকে স্বামীজীর দেশপ্রেম ও জনসেবার বাণী শোনার জন্য। বহরমপুরের যুবচরিত্র গঠনে সারগাছি আশ্রমের অবদান ছিল গভীর। নটগুরু গিরিশচন্দ্র ঘোষ বলেন যে, "বিবেকানন্দ একটি অতুল সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। ...তাঁহার সম্পত্তি—প্রেম। বঙ্গীয় যুবকবৃন্দকে সেই সম্পত্তির অধিকারী করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গীয় যুবকবৃন্দের উপর তাঁহার সম্পূর্ণ আশা-ভরসা ছিল; সেই নিমিত্ত তাঁহার এই অতুল সম্পত্তির অধিকারী তাঁহাদিগকেই করিয়াছিলেন।...বিবেকানন্দ ধনী বা বড়লোকের দ্বারাস্থ হন নাই, বিলাস হইতে শত হস্ত দূরে অবস্থান করিয়াছেন। এই নিমিত্ত বঙ্গীয় যুবকগণকে তাঁহার কার্যভার অর্পণ করিয়াছেন। তাঁহারা উদ্যমশীল, তাঁহারা মনুষ্য, তাঁহারাই বিবেকানন্দের কার্যভার গ্রহণে সক্ষম।" (উদ্বোধন, মাঘ, ১৩১৩)।

জাতীয় কংগ্রেসের ওপর স্বামীজীর প্রভাব

কেবলমাত্র সেবাকার্যই নয়—স্বামীজীর বাণী ও আদর্শ যুবসম্প্রদায়কে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আদর্শেও উদ্বুদ্ধ করেছিল। প্রাক্‌ স্বাধীনতা যুগে এমন মানুষ খুব কমই ছিলেন যাঁদের ওপর স্বামীজীর কোন প্রভাব ছিল না। তিলক অরবিন্দ, গান্ধী, সুভাষচন্দ্র, নেহেরু থেকে শুরু করে ছোট-বড় সর্বস্তরের নেতা ও কর্মী তাঁর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনকালে কংগ্রেসের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ স্বামীজীর দর্শনলাভের উদ্দেশ্যে পদব্রজে বেলুড় মঠে উপস্থিত হন। মঠের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে স্বামীজী তাঁদের সংগে নানা বিষয় নিয়ে প্রবল উৎসাহ ও আবেগভরে আলোচনা করেন। এ সম্পর্কে লক্ষ্ণৌ-এর 'অ্যাডভোকেট'

পত্রিকা লিখছে—"গত কংগ্রেসের সময়ে তাঁহার সহিত আমাদের দেখা হইয়াছিল। সেই দেখাই শেষ দেখা। তিনি উৎসাহপ্রদীপ্ত বদনে হিন্দীতে অনর্গল আমাদিগের সহিত ভারতের উন্নতিসাধন বিষয়ে আলোচনা করিয়াছিলেন। সে হিন্দী এরূপ বিশুদ্ধ ও শিষ্টজনসম্মত যে, কোন উত্তর-পশ্চিমবাসীর পক্ষেও তাহা গৌরবের কারণ হইত।" এ সময় চরমপন্থী নেতা বাল গঙ্গাধর তিলকও তাঁর সাক্ষাৎপ্রার্থী হন। তরুণ (মহাত্মা) গান্ধীজীও এ সময় একদিন প্রবল উৎসাহের সংগে পদব্রজে মঠে আসেন, কিন্তু স্বামীজী মঠে না থাকায় "অত্যন্ত নিরাশ ও দুঃখিত" হয়ে তিনি ফিরে যান। বলা বাহুল্য, কংগ্রেসী রাজনীতি নানাভাবে স্বামীজীর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। জনসাধারণের সংগে সম্পর্ক-হীনতার জন্য স্বামীজী কংগ্রেসের নিন্দা করতেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে আলমোড়ায় স্বামীজী এ সম্পর্কে অশ্বিনীকুমার দত্তের কাছে নিজ মত ব্যক্ত করেছিলেন। এর কয়েক মাস পরেই জাতীয় কংগ্রেসের অমরাবতী অধিবেশনে অশ্বিনীকুমার নরমপন্থী-নিয়ন্ত্রণাধীন কংগ্রেসের তীব্র সমালোচনা করে প্রকৃত গঠনমূলক কাজের দাবি জানান। পরবর্তীকালে স্বামীজীর আদর্শে কংগ্রেস জনজাগরণ, জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা, সেবা, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, নারীজাগরণ প্রভৃতির মাধ্যমে জাতি গঠনে নেমেছিল। কংগ্রেসের এক ইতিহাসকার লিখছেন—"Even without being connected with the Congress, he (স্বামীজী) largely shaped its policy and promoted its evolution."—কংগ্রেসের সংগে যুক্ত না হয়েও তিনি বহুলাংশে এর নীতি নির্ধারণ করে তার বিবর্তনে সাহায্য করেন। (Rise and growth of the Congress in India, C. F. Andrews)। এ সম্পর্কে গান্ধীজীর নাম স্মরণীয়।

গান্ধীজী : নিজের ওপর স্বামীজীর প্রভাবের কথা অকুণ্ঠচিত্তে স্মরণ করে গান্ধীজী বলেন—"আমি স্বামীজীর পুস্তকাবলী ভাল করিয়া ও সযত্নে পড়িয়াছি। তাহার ফলে পূর্বে দেশের প্রতি আমার যে ভালবাসা ছিল, তাহা আরও অনেক বাড়িয়াছে। যুবকদের কাছে আমার এই অনুরোধ স্বামী বিবেকানন্দ যেখানে বাস করিতেন এবং যেখানে দেহত্যাগ করিয়াছেন, সে-স্থানের ভাবধারা অন্ততঃ কিছুটা গ্রহণ না করিয়া শূন্যহাতে আজ ফিরিয়া যাইও না।"

জওহরলাল নেহরু বলেন—"যদি আমাকে বালক ও যুবকদের নিকট

একজন আদর্শ পুরুষের নামোল্লেখ করিতে হয় আমি প্রথমেই স্বামী বিবেকানন্দের নাম করিব। তিনি ছিলেন শক্তি ও তেজের প্রতীক।"

চক্রবর্তী শ্রীরাজাগোপালাচারী বলেন—"আমাদের আধুনিক ইতিহাসের দিকে ফিরিয়া তাকাইলে যে-কেহ স্পষ্ট দেখিতে পাইবে—স্বামী বিবেকানন্দের কাছে আমরা কত ঋণী! ভারতের আত্মমহিমার দিকে ভারতের নয়ন তিনি উন্মীলিত করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি রাজনীতির আধ্যাত্মিক ভিত্তি নির্মাণ করিয়াছিলেন। আমরা অন্ধ ছিলাম, তিনি আমাদের দৃষ্টি দিয়াছেন। তিনিই ভারতীয় স্বাধীনতার জনক,—আমাদের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার তিনি পিতা।"

ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান বলেন—"যখন আমরা তরুণ ছিলাম, তখন ঐ প্রকার (স্বামীজীর) মানবতা ও মানুষ তৈরী করিবার ধর্ম আমাদিগকে সাহস দিত। আমার ছাত্রাবস্থায় বিবেকানন্দের পত্রাবলী হাতে লিখিয়া আমাদের মধ্যে প্রচার করা হইত। ঐ লেখাগুলিতে আমরা একটা শিহরণ ও যাদুস্পর্শ অনুভব করিতাম।"

পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে কলেজের ছাত্রাবস্থায় স্বামীজীর ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হন। তিনি বলেন, "স্বামীজীর সমাজসংস্কার, দরিদ্রনারায়ণের সেবা ও উন্নয়নের কর্মসূচী আমাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে।" তাঁর মতে, গান্ধীজীর অস্পৃশ্যতা বর্জন, সাম্প্রদায়িক ঐক্য, ক্ষুদ্র-শিল্পের মাধ্যমে দরিদ্রদের আর্থিক উন্নয়ন ও মর্যাদা দান—সবই স্বামীজীর প্রভাবের ফল। (রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ : যুগের আলোকে, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রম, হাওড়া কর্তৃকপ্রকাশিত, ১৯০১, পৃঃ ৩৩)।

বিপ্লব আন্দোলনে স্বামীজীর প্রভাব

অনুশীলন সমিতি : কেবলমাত্র অহিংস আন্দোলনেই নয়, সহিংস বিপ্লবী আন্দোলনের ক্ষেত্রেও স্বামীজীর প্রভাব ছিল ব্যাপক। স্বামীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত তরুণ অরবিন্দ ঘোষ ১৯০২ খৃষ্টাব্দে বাংলায় বিপ্লববাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে বরোদা থেকে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে এবং পরে নিজ ভ্রাতা

বারীন্দ্রকুমারকে কলকাতায় পাঠান। এ সময় তাঁরা যে-সব ব্যক্তির সংগে সাক্ষাৎ করেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন স্বামী বিবেকানন্দ। এর ফলাফল কি হয়েছিল তা স্পষ্ট জানা না গেলেও এ সময় কলকাতা এবং মফঃস্বলে বেশ কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিপ্লবী-সমিতি গড়ে ওঠে, যাদের উদ্দেশ্য ছিল ভারতের স্বাধীনতা অর্জন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'অনুশীলন তত্ত্বের' অনুকরণে স্বামীজীর আদর্শ ও অগ্নিময়ী বাণীতে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বামীজীর জীবনকালেই প্রতিষ্ঠিত হয় (২৪-এ মার্চ, ১৯০২) বাংলার প্রথম উল্লেখযোগ্য বিপ্লবী কেন্দ্র 'অনুশীলন সমিতি'। বিপ্লবী যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় বলেন—"মূর্তি গড়া হয়েছিল, অভিষেক হয়েছিল বঙ্কিমবাবু ছাঁচে, প্রাণপ্রতিষ্ঠা হল বিবেকানন্দের অগ্নিমন্ত্রে।" (বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি, যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় ১৯০১, পৃঃ ২৬৯)। এই সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছাত্র সতীশচন্দ্র বসুর মতে, "স্বামীজীর স্বপ্ন ছিল জাগ্রত, সমুন্নত, একযোগে যুক্ত স্বাধীন ভারত।" (বিশ্ববিবেক, পৃঃ ২৬০)। তিনি বলেন যে, স্বামীজী দেশকে পরাধীনতার বন্ধন থেকে মুক্ত করার উৎসাহ দিতেন। মঠ-মিশনের তৎকালীন সম্পাদক স্বামী সারদানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা স্বামীজীর এই ভাবাদর্শের কথা জানতেন এবং এ ব্যাপারে সরাসরি উৎসাহ দিতেন। সতীশচন্দ্র বসু বলছেন যে স্বামী সারদানন্দ তাঁদের বলেন—"'স্বামীজী বলিয়া গিয়াছেন, যে-কার্য করিতেছ, তাহা করিবে, কখনও তাহা ছাড়িবে না।' তিনি আরও বলিয়া গিয়াছেন: একটা কাক দড়ি দিয়া বাঁধা থাকিলে যেমন মুক্তির জন্য ঝটপট করে, তেমনি তোমরাই-বা কেন মুক্তির জন্য জীবন দিবে না? সিস্টার নিবেদিতার কাছে যাহা বলিয়া গিয়াছি তাহা তোমরা ছাড়িবে না। তিনিই তোমাদের উপদেশ দিবেন। ভগিনী নিবেদিতা বলিলেন, 'তোমরা স্বামীজীর উপদেশ জান, বস্তীতে স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় কার্য করিবে, লাঠি ও মুগুর খেলা করিবে, শরীর চর্চা করিবে।'" (ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ১৯০১, পৃঃ ১৭৯)। ভগিনী নিবেদিতা 'অনুশীলন সমিতি'-তে আসা-যাওয়া করতেন এবং স্বামী সারদানন্দ সেখানে গীতা পড়াতেন। বিপ্লবী যাদুগোপালের মতে স্বামীজী সানন্দে এই তরুণের দলকে নানা উপদেশ দিতেন এবং সমিতির অনেকেই আগে থেকে মঠে যেতেন। সমিতির সদস্যদের নানা অবশ্য-পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে ছিল স্বামীজীর গ্রন্থাদি। তাঁরা সমবেতকণ্ঠে স্বামীজীর বাণী আবৃত্তি করতেন। স্বামীজীর আদর্শ অনুযায়ী 'অনুশীলন সমিতি'-রও

লক্ষ্য ছিল পূর্ণাঙ্গ 'মানুষ' তৈরী করা। তাঁরা শরীরচর্চা করতেন, সমাজসেবা করতেন, সান্ধ্য-স্কুল চালাতেন, মঠের উৎসবে স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করতেন, এবং দরিদ্র-নারায়ণের জন্য কাজ করতেন। তাঁদের অন্যতম আদর্শ ছিল—'LOVE ALL HATE NONE.' এককথায়, তাঁদের ওপর স্বামীজীর প্রভাব ছিল সর্বাত্মক। স্বামীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে তাঁরা বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। স্বামীজীর আদর্শেই ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে কিছু সংখ্যক তরুণ প্রতিষ্ঠিত করেছিল। 'বিবেকানন্দ সোসাইটি'। অনুশীলন সমিতির অনেকেই তার সদস্য ছিল।

অরবিন্দ ঘোষঃ বঙ্গীয় বিপ্লববাদের প্রধান পুরোহিত অরবিন্দ ঘোষ স্বামীজীর ভাবাদর্শে গভীরভাবে উদ্দীপ্ত হয়েছিলেন। তাঁর নানা রচনায় স্বামীজী ও তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বলছেন—"ভারতের জাতীয় আদর্শের বীজ বিবেকানন্দের ভিতর নিহিত ছিল। ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাহাই বারিসিঞ্চনে বর্ধিত করিয়াছিলেন।...... বিবেকানন্দই আমাদের জাতীয় জীবন গঠনকর্তা। তিনিই ইহার প্রধান নেতা। তাই কাল যাহা তাঁহার আদর্শ ছিল, আজ সেই আদর্শ লইয়া ভারতবাসী জীবন-পথে অগ্রসর হইয়াছে।"

বাঘা যতীনঃ বাংলার বিপ্লব-আন্দোলনের দ্বিতীয়-পর্বের 'সুপার লীডার' বাঘা যতীনের সংগে স্বামীজীর প্রীতির সম্পর্ক ছিল। স্বামী অখণ্ডানন্দ তাঁদের আলাপ করিয়ে দেন। অখণ্ডানন্দ লিখছেন—"যতীন্দ্রনাথের তখন বয়স অল্প, আঠার-উনিশ হবে, আমার সাথে খুবই বন্ধুত্ব। নরেনকে তার কথা মাঝে মাঝে বলতাম····· সে একদিন যতীনকে দেখতে চাইল। আমি নরেনের সাথে যতীনের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করি। সে সময়ে বাংলা সরকার স্বামীজীকে ভাল চোখে দেখত না। আমি যতীনকে নিয়ে এলাম। স্বামীজীর সাথে কালীমহারাজ ছিল। স্বামীজী একটা চৌকিতে আধশোয়া হয়ে তামাক খাচ্ছিলেন। যতীন ঘরে ঢুকতেই তিনি আলবোলার নলটা হাত থেকে নামিয়ে রাখলেন। চেয়ে রইলেন চোখের দিকে। সেদিন সেই সময় মনে হল যেন আগুন আগুনকে গিলে খাচ্ছে। আমাকে ঘর ছেড়ে বাইরে অপেক্ষা করতে বললেন। কালীও বেড়িয়ে এসেছিল। প্রায় ঘণ্টাখানেক তাঁদের কি যে কথা হল। স্বামীজী দরজা খুলে তাকে নিয়ে বাইরে এলেন। যতীনের কাঁধের ওপরে বাঁ হাতটা

রেখে বললেন, আত্মীয়তাটা যেন মাঝে মাঝে দেখা করে বজায় রেখ। বলেই হেসে ঠাট্টা করলেন, জানইত মানুষের কুটুম আসতে যেতে?……যতীন তারপর প্রায়ই আসত, কিন্তু কি যে কথা হত জানতে পারিনি।" একবার স্বামীজীর একটি মতকে কেন্দ্র করে হরিকুমার চক্রবর্তী ও নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের (M. N. Roy) মধ্যে বিতর্ক শুরু হয়। এ সময় যতীন্দ্রনাথ তাঁদের বলেন—"আরে স্বামীজীর কথা নিয়ে কি ঝগড়া করতে আছে? তিনি কত বড় ছিলেন তার ধারণা করবে কে? তাঁর কথা যদি ভারত শোনে ভারতের মহিমার কি সীমা থাকবে?" (বিশ্ববিবেক, পৃঃ ২৫৫)। বাঘা যতীনের ঘনিষ্ঠ অনুচর নলিনী কর বলেন যে, বাঘা যতীন অতি নিষ্ঠার সংগে স্বামীজীর বাণী অনুসরণ করতেন এবং তাতে তন্ময় হয়ে যেতেন—এমনকি তিনি স্বামীজীর অনুকরণে মাথায় পাগড়ী বেঁধে তাঁর সংগে একত্ব বোধ করতে ভালবাসতেন। নলিনী করের মতে, স্বামীজীর প্রভাব বাঘা যতীনের চরিত্র ও চিন্তাকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। (ব্রহ্মচারী শঙ্কর (বর্তমানে স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ)-এর কাছে বিপ্লবী জীবনতারা হালদারের বিবৃতি, দ্রষ্টব্য-সমাজ শিক্ষা, ডিসেম্বর ১৯০১-ফেব্রুয়ারী

ইন্দ্রনাথ নন্দী: আদিযুগের বিপ্লবী ইন্দ্রনাথ নন্দী বলেন—"বিবেকানন্দ সম্বন্ধে যেখানেই বক্তৃতা বা আলোচনা হত সেখানেই শুনতে যেতাম। তাঁর বই খুব পড়তাম। তাঁর অগ্নিবাণীতেই আমাদের ভয় ভাঙতো। 'অভীঃ' অর্থাৎ নির্ভীক হতে শিখতাম। সেটাই বড় কথা।" (ঐ)।

বিপ্লবী **হরিকুমার চক্রবর্তী** বলছেন—"বাংলাদেশের বিপ্লব আন্দোলন ব্যাপারটা কি? কতকগুলো ছেলে ঠিক করল, মরতে হবে। নিজেরা মরে যদি অপরকে বাঁচতে শেখানো যায়! তারা ঝাঁপ দিয়ে পড়ল তাই মরণের আগুনে। বিবেকানন্দ তাদের টেনে ঘরের বাইরে করে দিয়েছিলেন। বিবেকানন্দের কথাগুলো জ্বলছিল আগুনের মত। আমরা তাঁর কথা জপ করতুম আর কাজ করতুম। আমরা গাইতুম 'আমার জীবনে লভিয়া জীবন জাগোরে সকল দেশ'! আর বলতুম স্বামীজীর কথা—'বলি চাই'।" (বিশ্ববিবেক, পৃঃ ২৫২)।

চন্দননগর 'প্রবর্তক সঙ্ঘের' প্রতিষ্ঠাতা, একদা বাংলার বিপ্লব আন্দোলনের মধ্যমণি শ্রীমতিলাল রায় বলেন—'স্বামীজির উৎসব করিয়া কর্তব্য শেষ করিও না। স্বামীজির বজ্রবাণী কণ্ঠে ধরিয়া গর্ব করিও না—[illegible]

করিয়া আমরা নবদ্বীপ উড়াইয়াছি, হালিসহর ভুলিয়াছি, দক্ষিণেশ্বর এই-রূপ হাততালি দিয়া উড়াইবার পথ ক্রমেই প্রশস্ত হইতেছে—সাবধান না হইলে, আরও কয় বৎসরের মধ্যেই দক্ষিণেশ্বরও বাঙালি ভুলিবে। উৎসবে লোকাভাব হইবে না, কিন্তু লঘু জীবনের পরিচয়ে দক্ষিণেশ্বরের সত্য মহিমা ঢাকা পড়িয়া যাইবে।...বাঙালি যদি জয় চাও, প্রেমহীন হইও না। প্রেমের বলেই মানুষ আত্মজয় করে।... প্রেমের সাধনায় যে সিদ্ধ, ভগবান তার হৃদয়-সিংহাসনে মূর্ত্ত। স্বামীজী জাতির তপস্যা তাই তো লোকহিতে ঢালিতে বলিয়াছেন।...... বাঙালী জাতিটা সিদ্ধ জাতি—একথায় যদি প্রত্যয় না হয়, তোমরা দক্ষিণেশ্বরের নাম মুখে আনিও না, স্বামীজীর বাণী উচ্চারণ করিও না। কুরুক্ষেত্রের পুরুষোত্তমই তো ধর্মসংস্থাপনে আপনাকে মূর্ত্ত করিয়াছেন দক্ষিণেশ্বরে, কুরুক্ষেত্রের মানবপ্রতিনিধি সব্যসাচীই তো শ্রীনরেন্দ্র বেশে পুনঃ অবতীর্ণ—এ মর্ম বুঝিবে না কি তরুণ বাঙালী? দক্ষিণেশ্বরের নব-গীতার অমর সঙ্গীত কি জীবন তোমাদের অমৃতময় করিবে না?"

স্কুল জীবনে বিপ্লবী দলভুক্ত এবং পরবর্তীকালের প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা সতীশ পাকড়াশী বলেন—"বিবেকানন্দের বইগুলি আমাদের কাছে ছিল খুবই আদৃত। 'ভারতে বিবেকানন্দ' 'বর্তমান ভারত' 'চিকাগো বক্তৃতা', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'—এই বইগুলি পড়ে পাশ্চাত্য দানবের বিরুদ্ধে প্রাচ্যমানবের অভ্যুদয়ের কথা বেশ মনোমত হল।"

বিপ্লবী প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী বলেন যে, যে-সব বই পাঠ করে তিনি বিপ্লবী দলে যোগদানের বহু খোরাক সংগ্রহ করেছিলেন তার মধ্যে ছিল স্বামীজী ও শ্রীরামকৃষ্ণের গ্রন্থাদি। তিনি লিখছেন—"আজও আমার মনে পড়ে স্বামীজীর বইতে পড়েছিলাম—'তোদের দেশে কি তুরী-ভেরী নেই! খোলের আওয়াজে দেশটাকে উৎসন্নে দিলি'! আবার একস্থানে তিনি বলেছেন—'তোদের ধর্ম ঢুকেছে তো ভাতের হাঁড়ির ভিতরে। কেবল ছুঁৎমার্গ—ছুঁস নে! ছুঁসনে!' স্বামীজীর এসব কথা আমার ভাবী বিপ্লবী জীবনে এক দিকে যেমন যথেষ্ট প্রেরণা জুগিয়েছিল, অন্যদিকে আবার সামাজিক ছুঁৎমার্গ পরিহার করতে বিশেষ সাহায্য করেছিল। ভাতের হাঁড়ির মধ্যে ধর্ম ঢুকলে তার পক্ষে বিপ্লবী দলে কাজ করা অসম্ভব হিল্ল। জীবনে বিপ্লবী দলের কর্মক্ষেত্রে তার পরিচয় পাওয়া যাবে।"

অনুশীলন দলের বিপ্লবী নায়ক **জিতেশচন্দ্র লাহিড়ী** বলেন—"সে যুগে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ছিলেন বিপ্লবী দলের মহামন্ত্র উদ্গাতা। স্বামীজির অভীঃমন্ত্র, তাঁর কর্ম, ভক্তি, জ্ঞানের মিলনবাণীর অমৃতধারা—সঞ্জীবিত করেছিল বাংলার বিপ্লবী-জীবনকে। স্বামীজির 'উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত'—ছিল আমাদের প্রত্যেক বিপ্লবীর বুকে লেখা মহামন্ত্র,—আর এই মহামন্ত্রই স্থান পেত আমাদের গোপন বিপ্লবী ইস্তাহার 'স্বাধীন ভারতের' ও 'Liberty'র শিরোভাগে। বিপ্লবীদের নবীন-গীতার প্রথম শ্লোকই ছিল 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত—Arise, Awake, stop not till the goal is reached'. চরিত্র গঠনে এবং মনের দৃঢ়তা সম্পাদনে স্বামীজীর সব গ্রন্থই ছিল সেদিনে বিপ্লবীর কাছে বেদ।"

নেতাজী সুভাষচন্দ্র : স্বামীজীর দ্বারা গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন যৌবনের মূর্ত-প্রতীক, আজাদ হিন্দ বাহিনীর বীর সংগঠক মহানায়ক সুভাষচন্দ্র। তিনি যেন স্বামীজীরই জ্বলন্ত প্রতিচ্ছবি। বিখ্যাত সাহিত্য সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার নেতাজীর মধ্যে বিবেকানন্দ জীবনের জীবন্ত ভাষ্যরূপ দেখেছেন। সত্যিই তাই—নেতাজীর জীবন কর্ম ও সাধনায় ওতপ্রোতভাবে মিশে আছেন সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ। কৈশোরের এক চরম সংকটময় মুহূর্তে যখন নানা মানসিক দ্বন্দ্বে তাঁর অন্তর দীর্ণ হয়ে উঠেছে, এ সময়ে পনেরো বছর বয়সে তিনি পেলেন বিবেকানন্দ রচনাবলীর সন্ধান। "কয়েকটি পৃষ্ঠা উল্টাইয়া বুঝিলাম যে উহাতে এমন কিছু রহিয়াছে যাহা আমি খুঁজিয়া বেড়াইতেছি। বইগুলি…সাগ্রহে পড়িতে লাগিলাম। মজ্জাবধি আমার শিহরিয়া উঠিল।…দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস তাঁহার রচনাগুলি মনোযোগ সহকারে পাঠ করিতে লাগিলাম। কলম্বো হইতে আলমোড়া পর্যন্ত তাঁহার পত্রসকল ও বক্তৃতাগুলি—স্বদেশবাসীকে প্রদত্ত বাস্তব উপদেশে পরিপূর্ণ—আমাকে সর্বাপেক্ষা অনুপ্রাণিত করিয়াছিল।" (ভারত পথিক, সুভাষচন্দ্র বসু, ১৯০১, পৃঃ ৪০)। তিনি লিখেছেন, পনেরো বছর বয়সে তাঁর জীবনে বিবেকানন্দের আবির্ভাবের ফলে তাঁর মধ্যে এক 'বিপ্লব' শুরু হল এবং 'সমস্ত কিছু ওলট পালট' হয়ে গেল। স্বামীজী তাঁর জীবনে এমন ছাপ ফেললেন যা 'মুছিবার নয়।' (ঐ, পৃঃ ৪১) স্বামীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত সুভাষ সেদিন ব্রহ্মচর্য সাধনা, ধ্যান ও যোগ শুরু করেছিলেন,

সন্ন্যাসের জন্য গৃহত্যাগ করেছিলেন, দরিদ্রদের-সেবার জন্য সমমতাবলম্বী বন্ধুদের নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন একটি গোষ্ঠী। অবস্থা এমনই দাঁড়িয়েছিল যে, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের অনুরাগী ভিন্ন অন্য কারো সংগে কথা বলতেও তাঁর ভাল লাগত না। (ঐ, পৃঃ ৪০-৫৫)। পরবর্তীকালে নানা সময় নানা বক্তৃতায় বারংবার তিনি স্বামীজীর কথা বলেছেন। আজাদ হিন্দ বাহিনীর নায়ক হিসেবেও সময় পেলেই তিনি চলে যেতেন রামকৃষ্ণ মিশনের ঠাকুরঘরে। (নেতাজীর ওপর স্বামীজীর প্রভাব সম্পর্কে সুবিস্তৃত আলোচনার জন্য 'চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ' গ্রন্থে ব্রহ্মচারী শঙ্কর [বর্তমানে স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ]-এর রচনা দ্রষ্টব্য)।

বিপ্লবী অশ্বিনীকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বলেন—'স্বামী বিবেকানন্দকে বাদ দিয়ে স্বাধীন ভারতকে চিন্তা করা যায় না। এমন কোন বিপ্লবী তৎকালে ছিলেন না, যিনি স্বামীর দ্বারা প্রভাবিত হননি। কমিউনিজমের ঢেউ আসবার পূর্বে সব বিপ্লবীই Religious minded ছিলেন এবং সবাই ছিলেন স্বামীজীর ভক্ত। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের এবং স্বামী বিবেকানন্দের ছবি আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের কাছে থাকত। স্বামীজীর রচনা আমাদের প্রেরণা যোগাত। আমরা স্বামীজীর 'বীরবাণী' থেকে কবিতা মুখস্থ করে আবৃত্তি করতাম। সব রকম দুর্বলতা, কাপুরুষতার বিরুদ্ধে স্বামীজী জাতিকে রুখে দাঁড়ানোর প্রেরণা দিয়েছিলেন।... বাঘা যতীন, যাদুগোপাল মুখার্জী, হরিকুমার চক্রবর্তী প্রভৃতি সবাই স্বামীজীর দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত ছিলেন। রাজপুতনার দেওলিতে হরিদা (হরিকুমার চক্রবর্তী) আমাদের স্বামীজীর বক্তৃতা বা লেখা থেকে পড়ে শোনাতেন। (নেতাজীর সাথে একই কারাকক্ষে থাকাকালীন দেখেছি ঐ কক্ষের এক অংশে ঠাকুর ঘর তৈরী করে তাঁকে সেখানে মা কালীর ছবির সংগে রামকৃষ্ণদেব এবং স্বামীজীর ছবি রাখতে। অনেক সময় তাঁকে স্বামীজী রচিত কবিতা, যেমন 'সন্ন্যাসীর গীতি', 'সখার প্রতি', 'নাচুক তাহাতে শ্যামা' প্রভৃতি অত্যন্ত আবেগভরে আবৃত্তি করতে দেখেছি। অনেকদিন রাতে হঠাৎ জেগে উঠে দেখেছি সুভাষচন্দ্র কারাকক্ষের জানালার শিক ধরে স্বামীজীর রচিত অথবা গীত বিভিন্ন গান গাচ্ছেন বা স্তোত্র আবৃত্তি করছেন এবং তাঁর চোখ দিয়ে অবিরাম জল গড়িয়ে পড়ছে।") (সমাজ শিক্ষা, ২৩ বর্ষ, এপ্রিল)।

নরেশ দাস বলেন যে, সেকালে যুবকদের ওপর স্বামীজীর প্রভাব ছিল

সর্বাপেক্ষা বেশী। "স্বামীজী ছিলেন বিপ্লবীদের কাছে আদর্শ মানুষ। তারা প্রায় সকলেই স্বামীজীর মত হওয়ার উচ্চাশা পোষণ করতেন। আপন আপন জীবনযাত্রা রূপায়িত হত স্বামীজীর নির্দেশের পথে। সেদিন স্বামী বিবেকানন্দের জন্যে উম্মাদ হয়েছিল বাঙালী, বিপ্লবীরা ত বটেই। সেজন্যে ভারতবর্ষে জাতীয়তাবোধ ধর্মভিত্তিক। কিন্তু এ ভাবধারা কোনক্রমেই সাম্প্রদায়িক ছিল না। এখানে কোন মুসলমান বিদ্বেষ ছিল না—ছিল না কোন খৃষ্টান বিদ্বেষী।"

চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক ফাঁসীর দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত আসামী রামকৃষ্ণ বিশ্বাস আলিপুর সেন্ট্রাল জেল থেকে বীরাঙ্গনা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারকে এক চিঠিতে লিখছেন—"মনে হচ্ছে, একদিন তোমার ব্লাউজে একখানা স্বামীজীর মনোগ্রাম আঁটা দেখেছিলাম। আমার ওটা খুব ভাল লেগেছিল। যুগগুরুর প্রতি এই অকপট শ্রদ্ধা এমনি করে চিরদিন তোমার অন্তর আলো করে রাখবে কি? ওকে তোমার খুব ভালো লাগে, আমারও তাই। কেউ যদি আমায় জিজ্ঞাসা করে ওর কি পরিচয় তোমার জানা আছে? কী জবাব দেবো ভেবে ত পাইনে। ওকে কতখানিই বা আমরা চিনতে পেরেছি। পশ্চিমের লোকেরা বলেছে Cyclonic Hindu—আমার মতে He is the moral and spiritual force of all India. আজকালকার দিনে কথা কাটাকাটির ত অন্ত নেই। কারণ Blind belief জিনিটা পছন্দ করে না কেউ। কিন্তু বিবেকানন্দের বেলায় কোন যুক্তিতর্কের আমল দিতে চাইনে। ওর প্রত্যেকটি কথা শুধু ওর কথা বলেই বিনা বিচারে মেনে নেওয়া চলে। ওর আদর্শের উপর একান্ত চিত্তে নির্ভর করা চলে। শুধু Sentiment-এর দিক থেকে আমার এ ধারণা জন্মেনি, ওকে চিনবার যেটুকু চেষ্টা আমি করেছি তার তরফ থেকেই আমি বলছি, মনুষ্যত্বের এত বড় আদর্শ আর কেউ দিতে পারেনি, পারবে কিনা তাও জানি না। মানুষকে শুধু মানুষ বলেই আর কেউ এমন ভালবেসেছে কি?......"

একদা বিপ্লবী দলভুক্ত, পরবর্তীকালের বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তাবিদ গোপাল হালদার লিখেছেন যে, বারো বছর বয়সে "প্রথম পেলাম বিবেকানন্দের স্পর্শ—আগুনের পরশমণি। 'আগুন' ছাড়া ও মানুষের অন্য কোন তুলনা নেই।......বাঙলা দেশে যাকে অগ্নিযুগ বলে তার অগ্নিমন্ত্র কেউ যদি জাগিয়ে থাকেন তবে সে বিবেকানন্দ। সে যুগের অসম্পূর্ণতা অনেক—আমাদের জীবনের ও আয়োজনের মধ্যেই তার প্রমাণ পরিস্ফুট; তথাপি

সে যুগের যা দান তা অতুলনীয়। আর সে দান বহুলাংশে বিবেকানন্দের দান :—ভারতবর্ষের প্রতি শ্রদ্ধা, আক্ষুদ্র ভারতের জনসাধারণের জন্য মমতা, নির্ভীকতা, সংযম ও ত্যাগের মূল্যবোধ।······আমরা সেদিন ভাবতাম সেই বিবেকানন্দই বেলুড় মঠে ও রামকৃষ্ণ মিশনেও রূপায়িত হচ্ছেন। তাই ও দুই প্রতিষ্ঠানও আমাদের চোখে ছিল দুই আদর্শ প্রতিষ্ঠান। চাইতাম মিশনের লোকদের কাছে সেবাধর্মের শিক্ষানবিশী, কর্মযোগের দীক্ষা ; —তার পর কেউ না হয় নেবে জ্ঞানযোগে ভক্তিযোগে সাধনার পথ ; কিন্তু অধিকাংশই নেবে স্বদেশীয় বীর্যবান ধর্ম—এই ছিল আমাদের তখনকার ধারণা। এ ধারণার জন্য অবশ্য মঠ-মিশনের লোকেরা দায়ী নন। দায়ী বিবেকানন্দ স্বয়ং, দায়ী তাঁর লেখা কথা, দায়ী তাঁর তৈরী-করা মানুষ নিবেদিতা।" তাঁর মতে "বিবেকানন্দের কর্মযোগ ও সেবাধর্মের সংগে নব্যহিন্দুত্বের হাওয়াও 'স্বদেশী' চক্রে প্রবল বইত। স্বাস্থ্য, সাহস, কষ্টসহিষ্ণুতা প্রভৃতি চর্চার জন্য আবার জোর দেওয়া হত ব্রহ্মচর্য, সদাচার, ভগবদ্ভক্তির ওপর। 'সম্পূর্ণ সেক্যুলর' নয়, বরং একটু বেশী রকমেই হিন্দু ঐতিহ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত ; তবে সে হিন্দু-ঐতিহ্য বিবেকানন্দ-মার্কা।" তিনি লক্ষ্য করেছিলেন সে যুগে—"বিবেকানন্দ যেন পাড়ায় পাড়ায় যুবকপ্রাণে জীবন্ত।" তিনি লিখছেন যে, বিবেকানন্দ "শূদ্রের যুগনেতৃত্বের জন্য আমাদের হৃদয়-মন তৈরী করেছিলেন।"

বিপ্লবী দলভুক্ত ও পরবর্তীকালের মার্কসবাদী চিন্তাবিদ সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার লিখছেন যে, সে যুগের বিপ্লবীরা স্বামীজীকে দেবতাজ্ঞানে পূজো করতেন। ছাত্রজীবনে তাঁর শোবার ঘরে টাঙ্গানো থাকতো স্বামীজীর ছবি। তিনি লিখছেন—"স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ত ছিল সে যুগের যুবক ও কিশোর সমাজের প্রধান সম্বল। তার মধ্যে খুঁজে পেয়েছি শক্তির বলিষ্ঠ প্রকাশ, মানুষ মাত্রেরই মর্যাদা সম্বন্ধে দৃপ্ত ঘোষণা। শুনেছি কর্মের আবর্তে ঝাঁপিয়ে পড়ার অমোঘ আহ্বান। সমগ্র অন্তর জুড়ে ধ্বনিত হয়েছে দাস মনোভাব, মোহ এবং ভীরুতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বজ্রনাদ। স্বামীজীকে জেনেছি নবযুগচেতনার প্রতিনিধি হিসেবে। তাঁর বাণীকে পাথেয় করেছি।" তিনি লিখছেন—'ছেলেবেলায় স্বামী বিবেকানন্দ ও অরবিন্দের শিক্ষায় কর্মযোগের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম। স্বামীজীর পত্রাবলী পড়ে সেই শিক্ষাকে দেশের ও সমাজের বর্তমান পটভূমিতে নূতনভাবে উপলব্ধি করি। বিপ্লবের বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে কর্মযোগ কর্মের দর্শনের রূপ পরিগ্রহ করতে শুরু করে।"

একদা গুপ্ত সমিতি-ভুক্ত, পরবর্তীকালের কৃতী সাহিত্যিক মনোজ বসু লেখেন যে, তাঁর কৈশোরের দিনগুলিতে দেশের মুক্তির উদ্দেশ্যে তরুণদের নিয়ে বাংলাদেশে অসংখ্য ক্লাব পাঠচক্র মঠ প্রভৃতি গড়ে ওঠে। তিনিও এরকম এক পাঠচক্রের সদস্য ছিলেন। "পাঠচক্রের ভাণ্ডারে উদ্দীপনাময় বাজেয়াপ্ত বই ছিল তো বটেই, কিন্তু সংখ্যায় সব চেয়ে বেশী স্বামী বিবেকানন্দের বই: 'পত্রাবলী', 'কর্মযোগ', 'ভাববার কথা', 'ভারতে বিবেকানন্দ', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', 'স্বামী-শিষ্য-সংবাদ', 'রাজযোগ', 'জ্ঞানযোগ'—তরুণের মন জাগানোর মন্ত্র তার ছত্রে ছত্রে। পড়তে পড়তে মুখস্থর মতো হয়ে গেল আমাদের। স্বামীজীর বই আইনতঃ নিষিদ্ধ নয়, কিন্তু তরুণদের হাতে ঐ-সব বই দেখলে পুলিশ তখন পিছনে লাগত। সে-যুগের ছেলেদের আদর্শপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামীজীর মহাবাণী অন্তরে নিয়ে মহাচরিত্র মূর্তির সম্মুখে রেখে তারা আত্মগঠনে তৎপর হত।...... গেরুয়া না পরেও ঘরে ঘরে তরুণ সন্ন্যাসী।"

সে-যুগে বিপ্লবী সমিতিতে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ছবি নিত্য পুজো পেত। পুলিশ বিপ্লবী সমিতি বা কোন বিপ্লবীর গৃহ তল্লাসী করতে এলেই স্বামীজীর বই পেত। স্বামীজীর বই-ই পুলিশের কাছে যে-কোনো যুবককে বিপ্লবী বলে প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট ছিল। সরকার জানতেন যে, স্বামীজীর গ্রন্থাবলীই বঙ্গীয় বিপ্লববাদের জনক। 'উদ্বোধন' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সংবাদ থেকে জানা যায় যে, স্বদেশী আন্দোলনকালে স্বামীজীর বইয়ের বিক্রীর পরিমাণ কয়েকগুণে বৃদ্ধি পেয়েছিল। বিপ্লবী নলিনীকিশোর গুহ তাঁর 'বাংলায় বিপ্লববাদ' গ্রন্থে স্বামীজীর রচনাবলীকে 'নব-গীতা' আখ্যা দিয়েছেন। বিপ্লবীরা যে-কেবল স্বামীজীর গ্রন্থাবলীই পাঠ করতেন, তা নয়—অনেকে মঠের দীক্ষিত ছিলেন এবং অনেকেই পরে মঠে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। (বিশদ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: বিপ্লবের প্রতীক শ্রীশ্রীমা সারদা দেবী, জীবন মুখোপাধ্যায়, ১৯০১)।

সমাজতন্ত্রী যুবকদের ওপর প্রভাব

ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের রচনা থেকে জানা যায় যে, শ্রমিক ও কৃষক সংগঠনের যুব-কর্মীদের অনুপ্রাণিত করার উদ্দেশ্যে ১৯২৮-২৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি গণ-আন্দোলন সম্পর্কে স্বামীজীর বাণী ও উক্তিগুলি চয়ন করে 'সোস্যালিস্ট

বিবেকানন্দ' নামে একটি বই প্রকাশ করেন। বইটির চাহিদা যথেষ্ট হওয়ায় তা অচিরেই নিঃশেষ হয়ে যায়। শ্রমিক-কিষাণদের মধ্যে কর্মরত সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শে বিশ্বাসী যুবকরাও যে স্বামীজীর প্রতি শ্রদ্ধাবনত ছিলেন ডঃ দত্তের বক্তব্য তারই প্রমাণ বহন করে।

স্বামীজী নানাভাবে যুবসমাজকে প্রভাবিত করেছেন। সে প্রভাবের কোন সীমা পরিসীমা নেই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯২৮ সালে লিখছেন—"আধুনিক কালের ভারতবর্ষে বিবেকানন্দই একটি মহৎ বাণী প্রচার করেছিলেন, সেটি কোনো আচারগত নয়। তিনি দেশের সকলকে ডেকে বলেছিলেন, তোমাদের সকলের মধ্যে ব্রহ্মের শক্তি,—দরিদ্রের মধ্যে দেবতা তোমাদের সেবা চান। এই কথাটা যুবকদের চিত্তকে সমগ্র ভাবে জাগিয়েছে। তাই এ বাণীর ফল দেশের সেবায় আজ বিচিত্রভাবে বিচিত্র ত্যাগে ফলছে। তাঁর বাণী যখনি সম্মান দিয়েছে তখনি শক্তি দিয়েছে। সেই শক্তির পথ কেবল একঝোঁকা নয়, তা কোনো দৈহিক প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তির মধ্যে পর্যবসিত নয়, তা মানুষের প্রাণমনকে বিচিত্র ভাবে প্রাণবান করেছে। বাংলাদেশের যুবকদের মধ্যে যেসব দুঃসাহসিক অধ্যবসায়ের পরিচয় পাই তার মূলে আছে বিবেকানন্দের বাণী যা মানুষের আত্মাকে ডেকেছে, আঙুলকে নয়।" অন্যত্র তিনি লিখছেন—"বিবেকানন্দের এই বাণী সম্পূর্ণ মানুষের উদ্বোধন বলেই কর্মের মধ্য দিয়ে ত্যাগের মধ্য দিয়ে মুক্তির পবিত্র পথে আমাদের যুবকদের প্রবৃত্ত করেছে।" (বিশ্ববিবেক পৃঃ ১৮৩-৮৪)।

স্বামীজীর প্রতি যুবকদের এত আকর্ষণ কেন?

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে—স্বামীজীর প্রতি যুবসমাজের এত আকর্ষিত হবার কারণ কি? বলা বাহুল্য, স্বামীজীর গেরুয়া-বস্ত্র, তাঁর আধুনিক আচার-আচরণ, সীমাহীন বহুমুখী পাণ্ডিত্য আমেরিকা-যাত্রার পূর্বে অতি সহজেই যুবকদের আকর্ষিত করে। তৎকালে ভারতে এ ধরণের গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী

মানুষের জানা ছিল না। সন্ন্যাসী বলতে মানুষ সাধারণ ভাবে জানত মায়া-মমতা-রস-কষহীন শুষ্ক-মুখ গুহাবাসী মানুষদের—নেহাৎ প্রয়োজন ব্যতীত যাঁরা জনসমাজে আসেন না। স্বামীজীর মধ্যে তাঁরা দেখল এক অভিনব সন্ন্যাসীকে—যিনি বেদ থেকে বাইবেল, উপনিষদ থেকে জুলে ভার্ণের রচনা, ধর্ম থেকে আধুনিক বিজ্ঞান, ঈশ্বর থেকে আধুনিক শিক্ষা ও অর্থনীতি—সর্ববিষয়েই দিক্‌পাল, যাঁর মধ্যে দেশপ্রেম ও মানবপ্রেম প্রবল, যিনি জাত-পাত বা ধর্মের বন্ধনগুলি মানেন না—তাম্রকূট বা মাংসাহারেও যাঁর কোন দ্বিধা নেই। স্বাভাবিকভাবেই যুবসমাজ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল—মুগ্ধ হয়েছিল তাঁর দেশপ্রেম ও মানবপ্রেমের ঐকান্তিকতায়। পাশ্চাত্য জয়ের পর এই সব গুণগুলির সংগে যুক্ত হয়েছিল তাঁর যশ। ভারতবাসীর কাছে তিনি ছিলেন 'জাতীয় বীর'। এ বীরের মধ্যে অহমিকা ছিল না, ব্যক্তিগত স্বার্থও ছিল না—যেটুকু অহমিকা ছিল তা ভারতের জন্য, স্বার্থ বলে কিছু থাকলে তা ছিল ভারতেরই স্বার্থ। হতাশাক্লিষ্ট যুবকরা তাঁর কাছে শুনতে পেত পৌরুষের কথা, আশার কথা, জাগরণের কথা। তারা দলে দলে ভীড় করত তাঁর চারপাশে।

কিন্তু যে-সব যুবক, যারা তাঁকে দেখে নি—তাদের আকর্ষিত হওয়ার কারণ কি? স্বামীজীর কর্ম-কৃতিত্ব ছাড়াও পরবর্তীকালের যুবসমাজকে যা আকর্ষিত করেছিল তা হল তাঁর দেশপ্রেম, মানুষ হওয়া ও মানবসেবার আদর্শ এবং সামাজিক উন্নয়ন ও সাম্যের মঙ্গলময়ী বাণী। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন বলেন যে, "পুরাতন বঙ্গদেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গান্ধীজীর আন্দোলন ও বিপ্লবী আন্দোলনের মূলে ছিল স্বামীজীর প্রভাব। তখনকার দিনের অনেক ছাত্রের কথা জানি যারা স্বামীজীর লেখা থেকে প্রেরণা পেয়ে হয় গান্ধীজীর আন্দোলন বা বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। আমরা অনেকেই স্বামীজীর লেখা কয়েকটি বই বিশেষ করে পড়েছিলাম।...... (তাঁকে) চোখে না দেখলেও স্বামীজীর লেখায় এমন যাদু আছে যা পড়লেই মনে হোত তাঁর মুখ থেকেই কথাগুলি শুনছি—পড়ছি না। লেখা এমন জোরদার ও জীবন্ত যে তিনি নেই একথা ভুলে যেতে হয়।......স্বামীজী বার বার আশার বাণী শুনিয়েছেন। 'এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ', 'নূতন ভারত বের হবেই হবে'—এই কথাগুলি শুধু কেবল মনের হতাশা দূর করত না, আমাদের কাজে

প্রচুর উৎসাহ সঞ্চার করত। দেশকে ভাল করে জানা, দেশের সমস্যা ঠিকমত বোঝা, দেশের উন্নতি হবেই এই দৃঢ় বিশ্বাস মনে জাগিয়ে রাখা—কিভাবে এগুতে হবে, কাজ করতে হবে—সব কিছু আমরা তখন পেতাম স্বামীজীর লেখার মধ্যে। এই আলোক-বর্তিকা আমাদের মনকে জাগিয়ে তুলেছিল—যাওয়ার পথ আলোকিত করেছিল ও ধ্রুবতারার মত আশার ঊর্ধ্বলোকে তুলে দিয়েছিল।"

পরাধীন ভারতে যেমন, আজও তেমনি অগণিত যুবক স্বামীজীর অনুগামী। ভারত ও ভারতের বাইরে তাঁর অনুরাগী অজস্র। স্বামীজীর আদর্শে, স্বামীজীর নামে আজ পৃথিবীময় কাজ চলছে—বিবেকানন্দ সাম্রাজ্যের পরিধি আজ বহুদূর বিস্তৃত। প্রশ্ন ওঠে: তাহলে আজ দেশের এ অবস্থা কেন—দারিদ্র্য বঞ্চনা অনৈক্য ভ্রষ্টাচার নীতিহীনতা কেন? উত্তর একটাই—আমরা সেই মহানায়ক মহামহিম সম্রাটকে ভালবেসেছি, কিন্তু তাঁর ভালবাসা পাবার উপযুক্ত হই নি, আমরা মানুষ বলে গর্ববোধ করি কিন্তু মানুষ আমরা নই, আমরা নিজেদের শিক্ষিত বলি, কিন্তু দেশের সঙ্গে আজও আমরা বেইমানি করে চলেছি, আমরা নিজেদের চরিত্রবান বলি কিন্তু পদে পদে লোভ মোহ ভয় ও লজ্জার কাছে আমরা আত্মবিক্রয় করি। আসলে আমরা মানুষ নই, আমাদের চরিত্র গঠিত হয় নি—বিনা সাধনায় তা হয় না—হবার নয়। স্বামীজীর স্বপ্ন নিশ্চয়ই সফল হবে—এক বিবেকানন্দ আমাদের চেতনা দিয়েছেন, আরেকটি—একটি হলেই হবে—শত শত দরকার নেই—আরেকটি বিবেকানন্দ আমাদের গড়ে দেবেন। যুবসমাজের ভেতর থেকে সে বিবেকানন্দের উত্থান ঘটবে।